উত্তরাখণ্ড-পরিক্রমা।

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম

অর্থাৎ

গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী, কেদার ও বদরীনাথ এবং
পশুপতিনাথ প্রভৃতি হিমালয়স্থ সমস্ত তীর্থের
বহুচিত্র ও মানচিত্রযুক্ত সম্পূর্ণ
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ-বিদ্যাবিনোদ-
বিরচিত।

কলিকাতা,
৩৯ নং স্কট্‌স্ লেন হইতে
শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১৯।

মূল্য দেড় টাকা।

কলিকাতা
২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, 'ভারতমিহির' যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
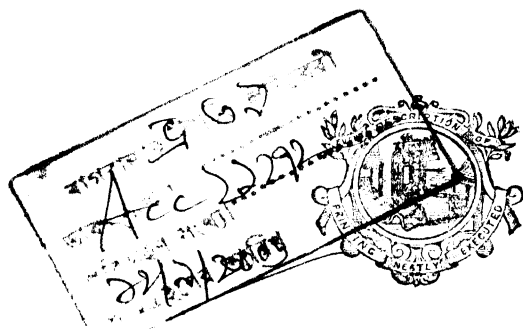
প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীযুত রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট
১০নং মদন গোপাল লেন, বহুবাজার।

(২) S. C. Roy Esqr.
১৬৭।৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপহার-পত্র।

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র রায় এম্, এ, বি, এল্,

তথা

শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ, বি, এল্,

কর-কমলেষু।

প্রিয়তম-যুগল, তোমাদিগকে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উপহার দিতে আমি পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি। তোমরা দুই সহোদর নিজ নির্ম্মল চরিত্রবলে আপনা-আপনিই দুইটী উজ্জ্বল রত্ন। তোমাদিগেরই উৎসাহে আমার ন্যায় ব্যক্তিও ভারতের বহুস্থান ভ্রমণে ও বহু-দৃশ্য দর্শনে সফল-কাম। তোমরা স্বয়ংও সেইরূপ ভ্রমণ-প্রিয়। তাই আজি আমার এই ভ্রমণগ্রন্থখানি তোমা-দিগকে উপহার দানে এত আনন্দ। এক কথা, আমার দেখা বা আমার লেখা আমার মতই হইয়াছে। তা হউক; তোমাদের স্বভাবানুসারে ইহা তোমাদের অপ্রিয় বা অনাদরণীয় হইবে না, ইহাই আমার ধারণা। ইতি

মেড়তলা,
১৩১৯, আশ্বিন।

গ্রন্থকারস্য।

নিবেদন।

"নেপালে বঙ্গনারী"—রচয়িত্রী বিদুষী শ্রীমতী হেমলতা দেবী তাঁহার পুস্তকের ৺পশুপতিনাথের মন্দিরের ছবিখানি আমার এই গ্রন্থে ব্যবহার করিতে অভিপ্রায় করায় ও বেলুড়-মঠের শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় কেদারনাথ ও বদরীনাথের মন্দিরের ফটো দুইখানি আমাকে দান করায়, আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

অধিকন্তু সান্যাল এণ্ড কোম্পানির বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কুমার মৈত্র মহাশয় আমার এই পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া যে উপকার করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিয়া শেষ করা যায় না, তাহা অপরিশোধ্য। ইতি

গ্রন্থকার।

—o—

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

১৩১৬। ফাল্গুন, কাশীধাম।

সময়ে সময়ে সুযোগ ঘটিলেই আমার কাশীধামে যাওয়া অভ্যাস আছে। এমন অনেকেরই আছে। না থাকিবে কেন? হিন্দুজাতির যাইবার বা জুড়াইবার এমন স্থান ভারতে আর দ্বিতীয় আছে কি? তাই কার্য্যে অবসর পাইলে বা না পাইলেও সংসার-ভারে ক্লান্ত, বিরক্ত চিত্তের আরাম ও অবসরের জন্য অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন। ভ্রমণের ইচ্ছা হইলে অনেকে কাশী পর্য্যন্ত ঘুরিয়া যান। আর তীর্থকামীর ত কথাই নাই; তীর্থযাত্রি-সম্প্রদায় এক যাইতেছেন, এক আসিতেছেন, ইহাতেই ত কাশীধাম সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, সর্ব্বদা উৎসবময়। আজি আমিও অবসর পাইয়া, বা অবসর করিয়া লইয়া, সম্প্রতি ফাল্গুনের প্রথমে কাশীধামে আসিয়াছি।

কিন্তু এবার আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় এখানে চিত্ত স্থির হইতেছে না কেন? স্থির না হইয়া বরং অতি অজ্ঞাত দূর-দূরান্তরেই ধাবিত হইতেছে, ইহারই বা কারণ কি? বিশ্বপাবনি বারাণসি, তোমার আনন্দময় ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়াও আজি আমার চিত্তের সুস্থিতি নাই কেন মা? তুমি পবিত্র ভারতের পবিত্রতম তীর্থভূমি, সদানন্দময় দেব-দেবের নিত্যানন্দময়ী রাজধানী, তোমার প্রত্যেক কঙ্কর সর্ব্বজ্ঞানময় শঙ্কর, তোমায় কিসের অভাব আছে মা, যে তোমার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিয়াও চিত্তের এই অনুচিত চঞ্চলতা উপস্থিত হইয়াছে!

চঞ্চলতা হয় বৈ কি! অভাবজন্য না হউক, মানুষের স্বভাবজন্য চিত্তের এইরূপ চঞ্চলতা হইয়া থাকে। আরও কথা, বিশ্ব ব্যাপিয়া

বিশ্বেশ্বরের বিভূতি বিস্তীর্ণ,যথায়-তথায় সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-নিত্য অনন্ত-সুন্দরের সৌন্দর্য্যরাশি বিকীর্ণ, বিশেষ বিশেষ স্থলে আরও আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য সমাকীর্ণ; সুতরাং ঐ সকল স্থানে গিয়া ঐ সকল বিচিত্র সৌন্দর্য্যবিভূতি দর্শন করিব বলিয়া অদম্য লালসা আপনিই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, ইহাতে চিত্তের অপরাধ কি? নিজ-সাধনাভূমি জন্মভূমির নিভৃত-নিকেতনে নিতান্ত নিমগ্ন একনিষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদেরও যখন ঐরূপ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"মন কেন ধায় গো আনন্দকাননে। বট' মনোময়ী সান্ত্বনা কর না ক্যানে"। তখন অন্যে পরে কা কথা? আমারও এই আনন্দকানন হইতে হিমগিরির উন্নতশৃঙ্গে, পুণ্যকাননে, পবিত্র প্রস্রবণে, পূত-গিরিনদী-সঙ্গমে এবং ঐ ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বা নিত্যপ্রতিষ্ঠ দেবমূর্ত্তি ও দৈববিভূতি দর্শনে চিত্ত ধাবিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

মূল কথা, এই সময়ে হিমালয়-মধ্যবর্ত্তী কেদার-বদরীনাথ প্রভৃতি তীর্থে যাত্রার প্রসঙ্গ, এবার কাল শুদ্ধ থাকায় ঐ সকল তীর্থে বহু যাত্রী সম্ভাবনার প্রসঙ্গ এবং ঐ সকল তীর্থের বিচিত্র সন্নিবেশ ও তাহার দুর্গমতা প্রভৃতির প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে বিলক্ষণ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। হিমালয় বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি, উচ্চতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত, রমণীয়তায় কাহা অপেক্ষাও কম নয়, পবিত্রতায় সর্ব্বাংশে অতুলনীয়, কেননা একে দেবভূমি, তাহাতে শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলির, শ্রেষ্ঠ সাধনাক্ষেত্রগুলির তথায় অধিষ্ঠান, সুতরাং সেই হিমগিরির বিশালবক্ষঃস্থিত মহাতীর্থ সমূহে যাত্রার প্রসঙ্গ উঠিলে কাহার না তথায় যাইবার নিমিত্ত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে? বিশেষতঃ ইতিপূর্ব্বে একবার হরিদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, হিমগিরির ঐ সকল গৌরবের আভাস তৎকালেই পাইয়া আসিয়াছি। সুতরাং সম্প্রতি আমার উক্ত প্রসঙ্গে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে কোন বিচিত্রতাই নাই।

দশাশ্বমেধের ঘাটে প্রতিদিন বেড়াইতে যাই। সেই সুবিস্তৃত সুপ্রশস্ত স্থানে ও তাহার উভয় পার্শ্বে ভারতের কত লোক পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছেন, কত লোক বসিয়া আছেন। যাঁহারা বসিয়া আছেন, তন্মধ্যে কেহ গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাপ্রবাহধাবিত নৌকাদি দর্শন করিতেছেন। কেহ সায়ংসন্ধ্যার অপেক্ষা, কেহ সুমধুর রোশনচৌকি শুনিবার অপেক্ষা করিতেছেন। কেহ কোন ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, আর-দশজন মণ্ডলাকারে তাঁহাকে বেড়িয়া তাহা শুনিতেছেন। কেহ সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছেন, তথায় প্রাচীরাকারে শ্রোতৃবর্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন; অপরে বৃথা সে ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কোথাও বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে, শ্রোতাও তথায় সেইরূপ জমিয়াছে। কোথাও ধর্ম্মাদি মীমাংসা লইয়া সংশয়-প্রকাশ, সংশয় নিরাসচ্ছলে প্রশ্নোত্তর, প্রশ্নোত্তর হইতে বিচার-বিতর্ক, বিচার-বিতর্ক হইতে শেষে বিতণ্ডা-বিরোধ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। কোথাও গার্হস্থ্য ব্যাপার হইতে সামাজিক ও রাজনীতিক আলোচনা এবং সাম্প্রদায়িক স্তুতিনিন্দা হইতে ব্যক্তিগত স্তুতিনিন্দা স্থান অধিকার রহিয়াছে। সকলে এই সকলের কোন-না-কোন প্রসঙ্গ লইয়া আছেন। আমি বেড়াইতে বেড়াইতে সবই দেখিতেছি, সবই শুনিতেছি,। কিন্তু যে প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য আমার এই বেড়ান', তাহা সেই কেদার-বদরী প্রভৃতি তীর্থের ও তাহার পথের স্বরূপবৃত্তান্ত লইয়া, তাহা অন্য কোন বৃত্তান্ত বা ব্যাপার লইয়া নহে।

ক্রমে ঐ সম্বন্ধে কিছু-কিছু শোনা যাইতে লাগিল। যাঁহারা ঐ সকল তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, এমন ২।৪টী লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম, তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ঐ সকল তীর্থ সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার বর্ণনা করিলেন, অনেক উপদেশ দিয়াও দিলেন। তাঁহাদের মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে ঐ সকল তীর্থক্ষেত্রের রমণীয়তার বিষয় যেমন জানিতে

পারিলাম. ঐ গুলির দীর্ঘকালগম্য অতিদীর্ঘ দুরারোহ পথ ও সেই পথের ভীষণতার ব্যাপারও তেমনি বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলেও একবারে আমার উৎসাহভঙ্গ হইল না। অধিকন্তু হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গসমূহে অনবরত আরোহণ ও অবরোহণ, তাহার অতিদীর্ঘ, অতিসঙ্কীর্ণ, অতি উন্নতানত, প্রতিপদে পদস্খলনযোগ্য প্রাণসংশয়কর পথ অতিবাহন, সে পথের নিরাশ্রয়তা, আকস্মিক ঝড়-জল-শিলাবৃষ্টি, দুর্জ্জয় শীত, দুঃসহ বরফরাশি, দুর্গম অরণ্য প্রভৃতি বিঘ্ন, এই সমস্ত অধিক সময় ব্যাপিয়া আমার আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। বিবেচনা হইল, এ তীর্থযাত্রা যেন প্রকৃতির উন্মুক্ত ক্ষেত্রে একক অসহায় আমার, ঐ কঠোর-দুরন্ত জড়-প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া। তখন তীর্থযাত্রায় আগ্রহের সহিত উহাতে যত কিছু বিঘ্ন-বিপত্তির সম্ভাবনা, সমস্ত এককালে উদিত হইয়া চিত্তে মহাব্যাকুলতা জন্মাইয়া দিল। যত দুর্ভাবনার একাধিপত্যের কাল রাত্রিকালে উহার নিমিত্ত এক এক দিন যেন নিদ্রাবন্ধ হইবার উপ-ক্রম হইতে লাগিল। কিন্তু এই দুঃখ-দুর্ভাবনা, উদ্বেগ-ব্যাকুলতা যাঁহার দেওয়া, তাহার প্রতিকারও তাঁহারই দেওয়া। প্রবল দুশ্চিন্তাব্যাধির তিনিই সহসা সুসাধ্য শান্তি-ঔষধ মিলাইয়া দিলেন। একদিন রাত্রিকালে ঐরূপ অপার উদ্বেগ-ব্যাকুলতার সময় আপনা-আপনি মনে উদয় হইল, চিন্তা কি ভাই? যিনি জীবন দিয়াছেন, তিনিই ত তাহা রক্ষা করিতে-ছেন। তাঁহারই দর্শনে যাইব, তিনিই কি তাহা সঙ্ঘটন করিয়া দিবেন না? তাঁহার দয়া ত সর্ব্বত্রব্যাপী, কোথাও কি তাহা সঙ্কুচিত হইয়া আছে? কোথায় তিনি নাই যে আমি অসহায়, অশরণ? তখন আমার হৃদয়ে, আমাদের সকলের হৃদয়ে সেই সর্ব্বেশ্বরের যে বাস্তবিক সত্তা আছে, যাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না, বুঝিয়াও বুঝি না, কিছু দেখিতে ও বুঝিতে পাইলেও বুঝি চক্ষু মুদিয়া থাকি, তাহা যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। আমি যেন স্পষ্ট তাঁহা প্রত্যক্ষ করিলাম। বোধ হইল,

সেই অভ্রভেদী হিমগিরির নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, নিরাশ্রয় প্রদেশে, আকাশ-পাতালস্পর্শী অজ্ঞাত সঙ্কটপূর্ণ পথে, আমি যেন নিঃশঙ্কে চলিয়াছি; আর তিনি যেন আগে-আগে অলক্ষিতে পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন। আমার দুই চক্ষু পূর্ণ করিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। আমি শান্তি পাইলাম, দুর্ব্বলচিত্তে সহসা অসম্ভব বল পাইলাম।

ঠিক্ সেই সময়ে, তন্মুহূর্ত্তে-বিরচিত আমার একটি গান আমি এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেটি এই,—

—o—

ভৈরবী—কাওয়ালি।

মেরা প্রাণনাথ সাথে সাথ! (আজু মেরা—)।
কিয়ে সুদিন সুছন সুপ্রভাত!
ইহ-পরলোক, সুখ-সম্পদনিধি,
বিধি মিলায়ল মঝু হাথ!
কি ডর আঁধার, ধূপ-ধূলি-কঙ্কর,
ঝড়-বাদর-শীত-বাত;
হৃদয়-নাথ সোহে, অন্তর-বাহির,
সবহি সুন্দর উপজাত!

এখন হইতে মনে মনে আমার উত্তরাখণ্ড যাত্রা যেমন আরম্ভ হইল, কার্য্যতঃ সে যাত্রা আরম্ভ হইতেও আর বিলম্ব হইল না। পরামর্শ, উদ্যোগ, আয়োজনের জন্য অবিলম্বে আমি কলিকাতা রওনা হইলাম। এ সকল তীর্থে যাওয়ার পরামর্শ পিতা মাতা, পুত্রকন্যাদির নিকট বড় একটা পাওয়া যায় না, বরং ইহাতে তাঁহারা বাধা দিতেই অভ্যস্ত। নিরপেক্ষ, তত্ত্বদর্শী আত্মীয় ও সুহৃদ্‌বর্গের নিকট ইহার পরামর্শ পাওয়া যায়। বাঁশতলা ষ্ট্রীটের সুপণ্ডিত সুচিকিৎসক শ্রীমান্ দীননাথ শাস্ত্রী

আমাকে এ তীর্থযাত্রাবিষয়ে ভূরিপরিমাণে উৎসাহ প্রদান করিলেন। গ্রে ষ্ট্রীটের সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীমান্ শ্যামাদাস কবিরাজ-কবিভূষণ ভায়া যিনি কি চারিত্রাবল, কি চিকিৎসা-কৌশল, কি নির্ম্মল শাস্ত্রজ্ঞান, কি জ্ঞানানুরূপ সুন্দর শিক্ষাদান, সর্ব্বগুণে সমান সমলঙ্কৃত, তিনি ত আমাকে উৎসাহিত করিলেনই, অধিকন্তু ঐ সঙ্কটপূর্ণ পথের প্রয়োজনীয় কতকগুলি মূল্যবান্ ঔষধ উপযাচকভাবে গ্রহণ করাইয়া আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করিলেন *। আর আত্মীয়ের মধ্যে যিনি বাধা দিতেও যেমন অগ্রসর, বাধা-বিতর্কের পর কর্ত্তব্য বুঝিলে সে বিষয়ে সাহায্য করিতেও তেমনি প্রস্তুত, তিনি আমাকে কিয়ৎকাল প্রতিবন্ধকতার পর সেই পথের উপযোগী কয়েকটী মূল্যবান্ গরম পোষাক এবং ঐ পথের পরিচায়ক ১খানি হিন্দীপুস্তক আনাইয়া দিলেন। আমার পাবনা-গোপালনগরের শিষ্যেরাও আমাকে ক্ষুদ্র ১খানি বাঙ্গালা ভ্রমণপুস্তক আনাইয়া দিয়াছিলেন, উহার নাম "ভারত-ভ্রমণ ও তীর্থদর্শন।"

আমি কলিকাতার কার্য্য সমাপন করিয়া সত্বরে কাশীধামে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

---

* ইহার পঠদ্দশার উপাধি "কবি-ভূষণ" আমাদের অভ্যস্ত বলিয়া তাহাই এস্থলে উল্লিখিত হইল। বস্তুতঃ এক্ষণে ইনি নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কোটালিপাড়া, পাবনা প্রভৃতি বঙ্গের প্রধান প্রধান স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিত-সমাজ হইতে শিরোমণি, সরস্বতী, বাচস্পতি, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি গৌরবাত্মক উপাধিরাশি লাভ করিয়াছেন।

উত্তরাখণ্ড-পরিক্রম।

সময় ও সঙ্গী।

চৈত্র। কাশীধাম।

যাত্রার পক্ষে অনিশ্চয় আর নাই। কেবল সময় ও সঙ্গীর স্থিরতা হইতেছে না বলিয়া কিছু কালক্ষয় হইল। সময় সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত শুনিয়া শেষে চৈত্রের শেষ ভাগে রওনা হওয়াই স্থির করা হইল। সঙ্গীর সুযোগ হইল না। অন্য সঙ্গীর সন্ধান না পাইলেও একটী মাত্র পরিচিত অথচ উৎকৃষ্ট সঙ্গী পাইবার কথা ইতিপূর্ব্বেই স্থির হওয়ায় যথেষ্ট আশান্বিত হইয়াছিলাম। ইনি কাশীধামে সুপ্রতিষ্ঠিত, আয়ুর্ব্বেদে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন, সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস কবিরত্ন, কবিরাজ। কিন্তু কোথা হইতে এক রাণী আসিয়া সহসা তাঁহার চিকিৎসাধীন হওয়ায় দুঃখিত-চিত্তে তাঁহাকে এ যাত্রায় উত্তরাখণ্ড-যাত্রায় নিরস্ত হইতে হইল। এমন সময়ে তিনটী সম্ভ্রান্ত আত্মীয়া বিধবা আমার যাত্রার কথা শুনিয়া একবারে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া উপস্থিত। কি আশ্চর্য্য! আমার মত সন্দেহ-শঙ্কাদি তাঁহাদের মনে হয়ত কিছুই উপস্থিত হয় নাই! কিন্তু তাঁহাদিগের এই সাহচর্য্যে ভাল-মন্দ বা উপকার-অনুপকার সহসা আমি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। বরং সেই বিঘ্ন-সঙ্কুল পার্ব্বত্য-পথে তাঁহারা আমার সহায়-স্বরূপ না হইয়া

অনেকটা ভারভূত হইবেন বলিয়াই বোধ হওয়ায় নৈরাশ্যের মাত্রাই অধিকতররূপে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম, এই নৈরাশ্য বা বিষাদ আমার ভ্রম মাত্র। ধর্ম্মকার্য্যে হিন্দু মহিলাগণ পুরুষাপেক্ষাও দৃঢ়ব্রত ও কষ্টসহিষ্ণু। আরও বুঝিয়াছিলাম, উক্তরূপ বিঘ্নবহুল পথে ঐরূপ আত্মীয় বা আত্মীয়া দুই চারিটী সঙ্গী থাকায় উপকারই আছে।

যাহা হউক, আমি ভগবদিচ্ছাই সকল কার্য্যের মূল ও তাঁহার অভিপ্রায় কখনই অকল্যাণকর হইতে পারে না বলিয়া তন্মুহূর্ত্তেই আপনা-আপনি প্রবোধ প্রাপ্ত হইলাম এবং চারিজনে মিলিয়া উক্ত তীর্থযাত্রা করা হইবে স্বীকার করিয়া যাত্রিক দিন নির্দ্ধারণ করিলাম। যথাসময়ে যাত্রার পূর্ব্বকৃত্যও কিছুকিছু সম্পন্ন করা হইল।
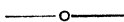
তীর্থযাত্রা-বিধি।

এস্থলে তীর্থ ও তীর্থযাত্রার কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা বোধহয় এ তীর্থযাত্রার পুস্তকে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অসহিষ্ণু বা অনিচ্ছু পাঠক এ পরিচ্ছেদটী পরিত্যাগ করিতে পারেন।

প্রথমে তীর্থের কথা কহা যাউক। শাস্ত্রে ত্রিবিধ তীর্থের উল্লেখ আছে,—স্থাবর, জঙ্গম ও মানস।

স্থাবরতীর্থ—যেমন কাশী-কাঞ্চী, গয়া-গঙ্গা, প্রভাস-পুষ্করাদি। মানব-শরীরের মধ্যে যেমন কোন কোন স্থান অতি পবিত্র, পৃথিবীর মধ্যেও তেমনি কোন কোন স্থান অতি পবিত্র আছে। ভূমি-জলাদির অদ্ভুত প্রভাববশতঃ ও মুনিগণের অধিষ্ঠানবশতঃ ঐ সকল স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য ও পুণ্যতম হইয়াছে।

জঙ্গমতীর্থ—ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণগণ নির্ম্মল শাস্ত্রজ্ঞানে, শাস্ত্রজ্ঞানানুরূপ

উপদেশদানে, উপদেশানুরূপ অনুষ্ঠানে ও আদর্শে জগতের মালিন্য দূর করেন বলিয়া তাঁহারা জঙ্গমতীর্থ নামে খ্যাত।

মানসতীর্থ—সত্য, শৌচ, সর্ব্বভূতদয়া, সর্ব্বত্র সারল্য, সংযম, সন্তোষ, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিত্তশুদ্ধিপ্রভৃতি।

এই মানসতীর্থ এবং পূর্ব্বোক্ত স্থাবর বা ভৌমতীর্থ, উভয়তীর্থে যিনি স্নান করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন।

শাস্ত্রান্তরে যোগীশ্বর মহাদেব মনুষ্যশরীরকে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাতে সমস্ত লোকের সন্নিবেশ ও স্থানে স্থানে ঐরূপ তীর্থের সমাবেশ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু ভৌমতীর্থ ভ্রমণই এ গ্রন্থের বর্ণনীয় বলিয়া অন্যবিধ তীর্থের বৃত্তান্ত ইহাতে উল্লেখ করিতে নিবৃত্ত হইলাম।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতাভিমানী নানাজাতির দেশভ্রমণের প্রথা আছে। তাঁহারা জানেন, আমাদের তাহা নাই। না থাকাই বটে। নিতান্ত বাহ্য ব্যাপার আমাদের কিছুই নাই। বিশেষতঃ উদ্দেশ্য ভিন্নরূপ হইলে সে কার্য্যের নামও তদনুসারে ভিন্ন হওয়া উচিত। এ নিমিত্ত আমাদের তীর্থপর্য্যটনের নাম দেশভ্রমণ নহে। তীর্থ ও তীর্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্শন-স্পর্শন, পূজাপাঠ, প্রণাম-প্রদক্ষিণ, দান-ধ্যান, তীর্থোদকে স্নানতর্পণাদি নানা উদ্দেশে আমাদিগের দেশভ্রমণ। এইজন্য দেখিতে পাই, এ তীর্থ-পর্য্যটনের মধ্যে নর্ম্মদার পরিক্রম হইতে আসেতুবন্ধ হিমাচল পরিভ্রমণ, এমন কি সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণ করার কথা ও তাহার অতিপুণ্য-জনকতার কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত থাকিলেও সে সকলই ধর্ম্মোদ্দেশে বিহিত। ধর্ম্মকে মূল না করিয়া আমাদের কোন কর্ম্ম নাই। ইহাতে আমাদের কোন অভাব বা অসুখেরও উপলব্ধি হয় না। কেন হইবে? ধর্ম্ম-কর্ম্ম মাত্রই সদ্যঃ-সুখকর না হইলেও পরিণাম-সুখকর ও স্থায়ি সুখকর, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই তীর্থপর্য্যটন ব্যাপারেই তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। আর দেশভ্রমণের যে সুখ, তাহারও কি

ইহাতে অভাব আছে? ভারতের প্রত্যেক রমণীয় স্থানই এক একটী তীর্থ। ভ্রমণের সুখ সেই সেই তীর্থ ছাড়া অন্যত্র কি অতিরিক্ত আছে? তথাপি তাহা আমাদের দেশভ্রমণ উদ্দেশে বলিয়া মনে করিতে নাই। ঈশ্বরোদ্দেশ্য-বর্জ্জিত বিষয় আমাদের রমণীয় বা সুখকর হইতে নাই ও তাহা হয়ও না।

এই তীর্থ-পর্য্যটনের বিধি স্ত্রী ও পুরুষভেদে নির্ব্বিশেষ। হিন্দু-মহিলাগণের এত যে অবরোধপ্রথা ও লজ্জাশীলতার দৃঢ়তা, (যদিও তাহা ধর্ম্মরক্ষারই অঙ্গ) কিন্তু দূর-দূরান্তর দেশে-বিদেশে, নদী-পর্ব্বত অরণ্য-সমুদ্রে, তীর্থদর্শনে ধর্ম্মসঞ্চয়ের নিমিত্ত, অগত্যা তাহারও অনেক ব্যতিক্রম করিতে সর্ব্বদা দেখা যায়।

এই তীর্থ-পর্য্যটনের ফল কি?

অগ্নিষ্টোমাদি বিপুলদক্ষিণ বিশাল যাগ-যজ্ঞে যে ফল না হয়, তীর্থ-পর্য্যটনে তাহা হইয়া থাকে। তীর্থ-পর্য্যটনে কখনও দারিদ্র্যদুঃখ বা অধোগতি হয় না, প্রত্যুত ঐহিক সুখ-সম্মান, দেহান্তে স্বর্গভোগ ও মোক্ষের উপায় লাভ হয়।

তীর্থফললাভের অধিকারী কে?

যাঁহার হস্তসংযম, পাদসংযম ও চিত্তসংযম আছে, অর্থাৎ যিনি যাজ্ঞা ও অবৈধ দানগ্রহণাদি হইতে নিবৃত্ত, যথা তথা কুৎসিত স্থানে গমনে নিবৃত্ত, এবং অভোজ্য ভোজন,অপরিমিত ভোজন ও ইন্দ্রিয় সেবন হইতে নিবৃত্ত, ক্রোধাদি নির্ম্মুক্ত, তীর্থমাহাত্ম্যাদি অভিজ্ঞ, তিনিই তীর্থের সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন। তীর্থগমনে পাপকারী জনের পাপক্ষয় হয়, কিন্তু উক্তরূপ শুদ্ধাত্মা ব্যক্তিই যথোক্ত সমস্ত ফললাভে অধিকারী হইয়া থাকেন। (১)

(১) নৃণাং পাপকৃতাং তীর্থে ভবেৎ পাপস্য সংক্ষয়ঃ।
যথোক্তফলদং তীর্থং ভবেৎ শুদ্ধাত্মনাং নৃণাম্।

কিন্তু যদি চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল না হয়, তাহা হইলে পিণ্ডদান, তপঃ শৌচ, তীর্থসেবনাদি সমস্তই নিষ্ফল। (১) বিশেষতঃ লুব্ধ, পিশুন (২) ক্রূর, নাস্তিক ও একান্ত বিষয়সর্ব্বস্ব ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলেও নিষ্পাপ হইতে পারে না। (৩)

কোন্ সময়ে তীর্থে যাইতে হয় ?

যদি কাল অশুদ্ধ থাকে, তীর্থে যাইতে নাই; অশুদ্ধকালে শ্রীবিশ্বেশ্বর, শ্রীপুরুষোত্তম প্রভৃতি অনাদি দেবতা দর্শন ও তীর্থস্নানাদি নিষিদ্ধ। তবে সেই সেই দেবতা দর্শন ও তত্তৎ তীর্থে স্নানাদি যদি পূর্ব্বে একবার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অকালেও উক্ত দেবদর্শন, তীর্থ-স্নানাদি করিতে পারা যায়।

কেবল গয়াতে কালদোষের বিচার নাই। যে কোন কালে গয়াতীর্থে গমন করিতে পারে। তবে মহাগুরুনিপাতে সংবৎসর অতীত করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য।

এইবার প্রকৃত যাত্রার বিধান বলিতেছি।

তীর্থযাত্রা করিতে হইলে যাত্রার পূর্ব্ব-তৃতীয়দিনে একভক্তাদি সংযম, তৎপরদিনে উপবাস ও মুণ্ডন, যাত্রাদিনে গণপতি, আদিত্যাদিগ্রহ ও ইষ্টদেবতার পূজাপূর্ব্বক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও সদ্ব্রাহ্মণ ভোজন সমাপন করিয়া শুভলগ্নে যাত্রা করিবে।

---

(১) পিণ্ডদানং তপঃ শৌচং তীর্থসেবা শ্রুতং তথা।
সর্ব্বাণ্যেতান্যতীর্থানি যদি ভাবো ন নির্ম্মলঃ।

(২) পিশুন, পরের অনিষ্টের জন্য যে পরের কাণে কুমন্ত্রণা দিয়া বেড়ায়।

(৩) যো লুব্ধঃ পিশুনঃ ক্রূরো নাস্তিকো বিষয়াত্মকঃ।
সর্ব্বতীর্থেষ্বপি স্নাতঃ পাপো মলিন এব সঃ।
বিষয়েষ্বতিসংরাগো মানসো মল উচ্যতে।

একবার তীর্থগমনের পর দশমাসের মধ্যে পুনর্ব্বার তীর্থগমন করিলে মুণ্ডন ও উপবাস করিতে হয় না।

প্রয়াগে মুণ্ডন অবশ্য কর্ত্তব্য। গয়া, গঙ্গা, বিশালা, বিরজা ভিন্ন যাবতীয় তীর্থে উপবাস ও মুণ্ডনে ফলাধিক্য মাত্র, নতুবা তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য নহে।

তীর্থযাত্রার যত অনুষ্ঠান লিখিত হইল, গঙ্গাতীর্থে স্নানকামী ব্যক্তি, ঐ সমস্ত না করিলেও গঙ্গাজলের অদ্ভুত মাহাত্ম্যবশতঃ সম্পূর্ণ ফলের ভাগী হইবেন।

গঙ্গাস্নানার্থ যথাবিধি যাত্রা পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হওয়ার পর যদি পথিমধ্যে দুরদৃষ্টবশে কুদেশে দেহত্যাগ হয়, তথাপি ঐ সংযতাত্মা ব্যক্তি গঙ্গাস্নানের ফললাভ করিবেন।

কোন কোন নিবন্ধকারের অভিপ্রায়, যাত্রার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিধি অনুষ্ঠান করিয়া বহির্গত না হইলে ঐ ফল প্রাপ্ত হইবে না। এ অভিপ্রায় সকলে মনঃপূত বোধ করেন না। মহর্ষি অঙ্গিরা কহিয়াছেন—যো যদর্থং চরেদ্ধর্ম্মং ন সমাপ্য মৃতো ভবেৎ। স তৎপুণ্যফলং প্রেত্য প্রাপ্নুয়ান্মনুরব্রবীৎ। অর্থাৎ যিনি যে পুণ্যের উদ্দেশে ধর্ম্ম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার দেহান্ত হইলেও তিনি পরলোকে সেই পুণ্যফল প্রাপ্ত হইবেন।

ইহলোকে বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভবশতঃ যিনি নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশার্থ যানারোহণে তীর্থগমন করেন, তাঁহার সেই তীর্থগমন নিষ্ফল হয়। ছত্র-পাদুকা, যানবাহনাদি যাত্রার উপকরণ, মৎস্য-মাংসাদি অমেধ্য ভোজন ও দানগ্রহণ তীর্থে পরিত্যাগ করিবে।

কিন্তু অসমর্থ বা রোগীর পক্ষে এ সকল বিধি নহে। কেননা শরীরই যাবতীয় ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রধান সাধন বলিয়া শরীর-রক্ষাও একটী প্রধান ধর্ম্ম, ইহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সেইরূপ, সাধু সন্ন্যাসিগণ, যাঁহারা

পরদিনের ভোজ্য সঞ্চয় করেন না, জীবনধারণার্থ তাঁহারা প্রতিগ্রহ করিতে পারিবেন।

তীর্থে উপস্থিত হইয়া দেবদর্শন, ব্রাহ্মণ-ভোজন, স্নানদান, শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয়। জলস্থ হইয়া তর্পণ করা ও শ্রাদ্ধের পিণ্ড তীর্থজলেই নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। এবং শ্রাদ্ধাসম্ভবে পিণ্ডদানও কর্ত্তব্য।

তীর্থে ত্রিরাত্র বাস করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার দেবলোক, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণাদির প্রীতি সম্পাদন করিতে হয়।

প্রাসঙ্গিক কথার শেষ হইল, এক্ষণে মূল বৃত্তান্ত বর্ণনে অগ্রসর হই।

——o——

অযোধ্যা।

১৩১৬।২৭শে চৈত্র, রবিবার।

অদ্য আমরা বেলা ১০টার সময় সঙ্কল্পিত তীর্থদর্শন-মানসে কাশীধাম হইতে যাত্রা করিলাম। বাসা হইতে ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন পর্য্যন্ত গাড়ী ভাড়া ॥৵০ আনা হইল। ষ্টেশনে বেলা ১১॥০ টার সময় অযোধ্যাগামী ট্রেণ পাইয়া আমরা তাহাতে উঠিলাম। অযোধ্যাঘাট পর্য্যন্ত ১॥৫ করিয়া ৬/০ টাকায় ৪ খানি টিকিট লওয়া হইয়াছিল। অপরাহ্নে ফয়জাবাদ ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। ফয়জাবাদ হইতে ১টা নূতন ব্র্যাঞ্চ লাইন অযোধ্যা-ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। আমাদের টিকিট ঐ পর্য্যন্ত থাকিলেও ঐ লাইনের গাড়ী পাইতে রাত্রি ১১টা হইবে শুনিয়া অগত্যা আমরা ফয়জাবাদে নামিলাম এবং ৮০ আনায় ১ খানি ঘোড়াগাড়ি ঠিক্ করিয়া সন্ধ্যাকালে অযোধ্যা পঁহুছিলাম। ১টী দ্বিতল গৃহে বাসা লইয়া রাত্রিবাসের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। রাত্রি হওয়ায় সামান্য ঘোরা ফেরা ভিন্ন অন্য কিছু দেখিবার সুবিধা সেদিন হইল না। অধিকন্তু রাত্রিতেও বানরের

উপদ্রবের নিবৃত্তি নাই দেখিয়া আমাদিগকে বিব্রত ও উদ্‌বিগ্ন হইয়া বাসায় থাকিতে হইল।

২৮শে চৈত্র প্রভাতে আমরা চর্ম্মচক্ষে অযোধ্যা দর্শন করিয়া পবিত্র হইলাম। কিন্তু অল্প অবসর, তাহার মধ্যেই তথাকার প্রধান কর্ত্তব্যগুলি সত্বর হইয়া যথাসাধ্য সম্পন্ন করিয়া লইতে হইবে বলিয়া অগ্রে সরযূস্নানে বহির্গত হইলাম। গমন পথের দুইধারে ধর্ম্মশালা ও দেবমন্দির-সমূহে ভক্ত সাধুগণের সুকণ্ঠোচ্চারিত ভগবান্ রামচন্দ্রের স্তুতিগাথা ও কীর্ত্তিকথা চিত্তে পবিত্রভাব উদ্দীপ্ত করিতে লাগিল। অবিলম্বে দূর হইতে সরযূর দর্শন পাইলাম। সেই রামের অযোধ্যা, সেই সরযূ, সকলই যেন রামময় বলিয়া, সকলই যেন স্বপ্নদৃষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সম্মুখে চর বিস্তৃত হওয়ায় সরযূ এক্ষণে অনেকটা দূরবর্ত্তিনী হইয়াছেন, সুতরাং তীর-বর্ত্তী মন্দিরশ্রেণীও প্রবাহ হইতে কিছু দূরবর্ত্তী হইয়া তটের শোভাকেও বহু পরিমাণে দূরবর্ত্তী করিয়াছে। প্রবাহ-সমীপে পহঁছিতে বহুক্ষণ আমাদিগকে নিম্নবর্ত্তী বালুকাময় পথ অতিক্রম করিতে হইল। গ্রীষ্মকালে সকল নদীর প্রবাহ যেরূপ ক্ষীণ হইয়া থাকে, সরযূরও প্রবাহপরিসর তেমনি ক্ষীণ হইয়াছে দেখিলাম। কিন্তু পবিত্রতায় সরযূ সেইরূপই পরিপূর্ণা আছেন! আমরা রামঘাটে সরযূর পবিত্রসলিলে অবগাহনপূর্ব্বক তীর্থকৃত্য যথাশক্তি সম্পন্ন করিলাম।

বাসায় আসিয়া আর্দ্রবস্ত্রাদি রাখিয়া দেবদর্শনে বাহির হওয়া গেল। কাশীধামের নিবিড় জনতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সহসা আজি অযোধ্যা-পুরীর কি নিভৃত অথচ পবিত্র দৃশ্যের সম্মুখেই উপনীত হইলাম! তখন-কার চিত্তের অবস্থা বর্ণনা করিয়া সম্যক্ অনুভব করাইতে আমি একেবারেই অক্ষম। বস্তুতঃ এখানে পদার্পণমাত্র প্রতি পদক্ষেপে যেন যাত্রিগণের চিত্তক্ষেত্রে পবিত্র রামকথা, রামচরিত জাগরিত হয়; অযোধ্যার প্রতি ধূলিকণাস্পর্শে শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়। যে দিকে দেখ, ঘরে

দ্বারে প্রাচীরে লিখিত রামগাথা ! যথা-তথা রামনাম, রামস্তুতি, রামগীতি ! আমি মধ্যরাত্রি হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত একজনের একই কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইতে শুনিলাম,—হো রামা ! রামরাম ! সীতারাম ! প্রাণরাম ! জানকীরাম ! আত্মারাম ! হায় দিবারজনী অবিরামে কি সেই পুণ্যাত্মা ভক্ত সাধু রামনামগাথা প্রেমপ্লুত পবিত্রকণ্ঠে উদ্গীত করিতেছে ! কাশী-ধামে যেমন অহরহঃ জয় বিশ্বনাথজীকি জয়-ধ্বনি, এখানেও তেমনি প্রতি-ক্ষণ রামনামের জয়ধ্বনি ! সেখানে যেমন যথায়-তথায় শিবমূর্ত্তি আর শিব-মন্দির, এখানেও তেমনি যথায়-তথায় রামমূর্ত্তি আর রামমন্দির। কতক্ষণ দেখিব, কতক্ষণ শুনিব ? আমরা তেমন ভাগ্য ত করি নাই। মুখ্য মুখ্য স্থান দর্শন করিয়াই মধ্যাহ্নে বাসায় ফিরিতে হইল। *

* রামকোট, নাগেশ্বরনাথ, মণিপর্ব্বত, কুবেরপর্ব্বত, স্বর্গদ্বার বা রামঘাট, লক্ষ্মণঘাট, হনুমান্‌গড়, মানসিংহের মন্দির, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান মন্দির, কনকভবনে রাম-সীতার মূর্ত্তি, রত্নসিংহাসন প্রভৃতি প্রধান দর্শনীয়। একাণ্ড উচ্চভূমিতে প্রাচীন ও বিশাল ভগ্নস্তূপ দেখিয়া প্রাচীন রাজবাটীর কতকটা অনুমান হয়। ত্রেতাযুগের চিহ্ন একালে স্পষ্টপরিচয়-যোগ্য থাকিবার সম্ভাবনা কি ? বিশেষতঃ অযোধ্যা-নগরী বহুবার জনশূন্য ও অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ভগবান্ রামচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পরই প্রথম ঐরূপ দশা ঘটে। কুশ অযোধ্যা-ত্যাগপূর্ব্বক স্বনামখ্যাত কুশাবতীনগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। বহুকাল পরে হঠাৎ দৈব আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কুশাবতীত্যাগ ও পুনর্ব্বার সংস্কারপূর্ব্বক অযোধ্যাতে রাজত্ব করেন। সূর্য্যবংশের শেষরাজা স্থমিত্রের পর পুনর্ব্বার অযোধ্যা জনহীন অরণ্যে পরিণত হয় ও সেই ভাবেই যুগ-যুগান্তর অতীত হয়। পরে সম্প্রতি প্রায় দুই হাজার বৎসর অতীত হইল, মহারাজ বিক্রমাদিত্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর ও সাধুমণ্ডলীর সাহায্যে অযোধ্যার বর্ত্তমান স্থান নির্ণয় করেন। তাহার পর হইতেই ভক্তগণ ভগ্নস্তূপের উপর ভগবানের ভূরি ভূরি মন্দির নির্ম্মাণ ও বিগ্রহ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তথাপি অযোধ্যাপুরীর সে ভগ্নাবস্থার সংশোধন হয় নাই। তাই বুঝি, প্রচলিত কথা—"সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই !" এবং সেই-জন্যই বুঝি মহাজন-বাক্য—"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী ? রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তর-কোশলা ?"

—o—

নৈমিষারণ্যের পথে।

বাসায় আসিয়া ব্যস্ততার সহিত উপস্থিত-মত জলযোগ ও পাণ্ডা বিদায় শেষ করতঃ একখানি গাড়ি করিয়া আমরা রাণুপালীনামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু যেজন্য ব্যস্ততা, তাহা সিদ্ধ হইল না। আমাদের গাড়ী পঁহুছিতে না পঁহুছিতে ট্রেণ ছাড়িয়া গিয়াছে। ট্রেণের সময় ঠিক্ জানা না থাকায় আমাদিগের চেষ্টা বিফল হইল। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমরা বেনারস্—ক্যান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে আউধ এণ্ড রোহিলখণ্ড রেলওয়ের একখানি টাইম্‌-টেবেল্ কিনিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এপ্রেলের ৮।১০ দিন হইয়া গিয়াছে, তথাপি ঐ টাইম্‌-টেবল পাওয়া যায় নাই। উপায় কি আছে? যাত্রীদের মুখের সংবাদের উপর আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। তাহার ফল যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতে লাগিল। অধিক কি, এই অসুবিধার জন্য এ যাত্রায় আমাদিগের নৈমিষারণ্য দর্শন ঘটিল না। পরের বৃত্তান্তে পাঠক আরও তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাইবেন।

ট্রেণ চলিয়া গিয়াছে, আবার ট্রেণ বৈকালে ৪টায় পাওয়া যাইবে, শুনিয়া ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালায় পাকশাকের জন্য আশ্রয় লইলাম। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে তরুশ্রেণীর ঘনচ্ছায়ায় সুস্নিগ্ধ ও সুপেয় শীতলজল-সমন্বিত কোন্ পুণ্যাত্মার সেই নিভৃত ধর্ম্মশালাটী পাইয়া পান-ভোজন না করিতেই যেন আমাদের অর্দ্ধেক ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইল। ধীরে-সুস্থে আমরা তথায় পাক-ভোজন সম্পন্ন করিয়া টিকিট ঘণ্টায় আহূত হইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তখনও আমাদের মনে নৈমিষারণ্য গমনের আশা নিরস্ত হয় নাই। তাই আমরা ঐ তীর্থের সমীপবর্ত্তী ষ্টেশন "মিছরিক্" পর্য্যন্ত টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলাম। রাণুপালি হইতে প্রত্যেকের টিকিট ১৷৵৫ করিয়া হইল।

সন্ধ্যা ৭টায় আমাদের ট্রেণ সুসজ্জিত, সুবৃহৎ লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। এখানে গাড়ী বদল করিয়া অন্য গাড়ীতে উঠিতে হয়। তাহাতে অনেকটুকু বিলম্বও হইল। এই অবসরে আমি লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে একবার টাইম্‌টেবেলের চেষ্টা করিলাম। চেষ্টা একবারে নিষ্ফল হইল না। অর্থাৎ যে টাইম্‌-টেবল পাইলাম, তাহা যদিও গত মার্চ্চ পর্য্যন্তের, তথাপি তাহাতে মোটামুটি অনেকটা জানিতে পারা গেল, অধিকন্তু মানচিত্রখানি দেখিয়া গন্তব্য পথের সাধারণ জ্ঞানও জন্মিল।

অনুমান ২ঘণ্টা বিলম্বে আমরা পুনর্ব্বার ট্রেন পাইলাম। রাত্রি বোধ হয় ১টায় আমাদিগের ট্রেণ বালামাউ-নামক জংশন ষ্টেশনে পৌছিল। এখান হইতে একটা নূতন ব্র্যাঞ্চ লাইন নৈমিষারণ্য (নিমখার) পর্য্যন্ত গিয়াছে। এজন্য এখানেই আমাদিগকে নামিতে হইল। এটী নামে-মাত্র জংশন, অতি সামান্য ষ্টেশন, স্থানমাত্র নাই। ষ্টেশন হইতে বাহির হইবার সামান্য পথের একপার্শ্বে টিকিট বিক্রয়ের স্থান। বলিয়া-কহিয়া সেই পথটুকুর মধ্যেই রাত্রি যাপনের স্থান করিয়া লইলাম। রাত্রিতে বিলক্ষণ শীত বোধ হওয়ায় আপাদমস্তক গাত্রবস্ত্রে ঢাকিতে হইয়াছিল। ২।১ বার টিকিটও রাত্রির মধ্যে হইয়াছিল। যাত্রীরা অম্লানমুখে আমাদের উপর দাঁড়াইয়াই টিকিট লইয়াছে, আমরাও অলক্ষিতে অক্ষুব্ধচিত্তে তাহা সহ্য করিয়াছি। ঘুমের ঘোরে বিশেষ কষ্ট বোধ হয় নাই। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, আমাদের মত আরও একটী অনাথ যাত্রী একটী কন্যা লইয়া আমাদেরই পার্শ্বে শুইয়া আছে।

বালামাউ জংশন অল্পদিন মাত্র হওয়ায় ষ্টেশনে ঘরদ্বার আজিও বাড়ে নাই, বাড়াইবার উদ্‌যোগ হইতেছে মাত্র। ট্রেণেরও সেইরূপ দুর্গতি। প্রভাতে বালামাউ হইতে যাত্রী লইয়া ২ ঘণ্টায় মিছরিক্‌ পঁহুছে। তখনি মিছরিকের যাত্রীগুলি লইয়া ট্রেণখানি বালামাউ ষ্টেশনে ফিরে। দিন রাত্রির মধ্যে আর যাতায়াতের নামগন্ধ নাই। সুতরাং অদ্য ২৯শে চৈত্র

যদি আমরা নৈমিষারণ্য দর্শনে যাই, আগামী কল্য ৩০শে ভিন্ন বালামাউ ফিরিতে পারিব না এবং ৩০শে তারিখে বালামাউ ষ্টেশনে ট্রেণ ধরিয়া ঐ দিনে দিনের মধ্যে আর হরিদ্বার পঁহুছিতে পারিব না। মহা বিষুব সংক্রান্তিতে হরিদ্বারে স্নানাদি কার্য্য করা নিতান্ত প্রার্থনীয় ও নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির আছে। কিরূপে তাহার বাধ করা যায়? এই বিবেচনা করিয়া এবারকার মত নৈমিষারণ্য-দর্শনের আশা ছাড়িয়া দিয়া যথাসাধ্য স্নানাদি প্রভাতকৃত্যের চেষ্টা করিলাম। তৎসম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা হইল না। ষ্টেশনের বাহিরেই এক ইন্দারা ছিল, তাহার জলে প্রয়োজনীয় অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইল। নিকটের এক বৃক্ষতল পরিষ্কার করিয়া লইলাম। অদূরের কয়েকটী গাছ হইতে অনেকগুলি লাল করবীফুল সংগ্রহ করিয়া ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া সঙ্গের সঙ্গী বাণেশ্বরের পূজা ও ইষ্টপূজাদি সমাপন করিলাম। স্ত্রীলোকেরাও আহ্নিক, মালাজপ সারিয়া লইলেন। পরে নিকটবর্ত্তী ১ খানি দোকানে যাহা পাওয়া গেল, তাহাতে সকলের কিছু কিছু জলযোগও হইল। গাড়ী পাইতেও দেরি হইল না। বেলা ৯টায় ট্রেণ, সময় হইয়াছিল, সত্বরতার সহিত টিকিট লইয়া ট্রেণে উঠিলাম। বালামাউ হইতে হরিদ্বারের ট্রেণ-ভাড়া প্রত্যেকের ২॥৶৫ করিয়া লাগিল।

সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে আমাদের ট্রেন লক্সারে পঁহুছিল। ইহা একটী জংশন ষ্টেশন। এখানে আমরা নামিলাম। আমাদের পরিত্যক্ত ট্রেন বরাবর সিধা সাহারানপুর চলিয়া গেল। এখান হইতে দেরাছুন ব্রাঞ্চের ট্রেণে উঠিয়া আমাদিগকে হরিদ্বার যাইতে হইবে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা উক্ত ট্রেণ পাইলাম। গঙ্গাস্নানার্থী অগণ্য যাত্রীর জন্য এই ট্রেণে বড়ই ভিড় হইয়াছিল! কষ্টে আমরা এই ট্রেণে স্থান পাইলাম। ১ ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ ৭টা ৪৮ মিনিটে আমাদের ট্রেণ হরিদ্বার ষ্টেশনে পঁহুছিল।

হরিদ্বার—গঙ্গাতীর।
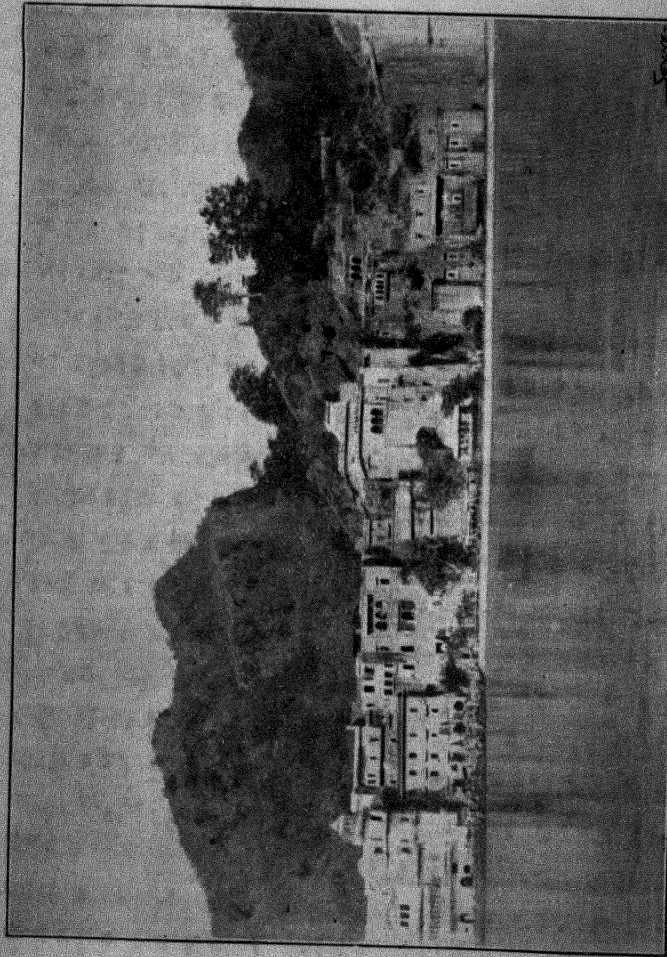
হরিদ্বার।

ষ্টেশন হইতে সহর কিছু দূর, অনুমান ১॥০ মাইল পথ হইবে। ষ্টেশনে পাল্‌কি-গাড়ী না পাওয়ায় দুইখানি এক্কা ভাড়া করিতে হইল। এক্কা বরাবর সিধা একই পথে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথের ধারেই হাস্‌পাতাল, পোষ্ট আপিস্‌, টেলিগ্রাম আপিস্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কিছু পরে ঐ রাস্তার উপরেই আমরা রায় সুরযমল ঝুন্‌ ঝুন্‌ ওয়ালা বাহাদুরের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশালা পাইয়া তথায় আশ্রয় লইলাম। ধর্ম্মশালাটী বৃহৎ ও খুব উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। সদর রাস্তার উপর দরোজা হইতেই সিঁড়ি আরম্ভ। অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া একতালা প্রমাণ ঊর্দ্ধে উঠিয়া বাটীর চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। বিস্তৃত চত্বরের চারিধারে দ্বিতল গৃহশ্রেণী। মধ্যস্থলেও একটী দ্বিতল গৃহ আছে, ঐটী দেবালয়। এই অন্দরভাগের বাহিরে দক্ষিণ ও উত্তর দুইধারে আরও দুই মহল আছে। দক্ষিণের মহলের কিয়দংশে কয়েকটী পাকশালা, ইন্দারা ও স্ত্রীপুরুষের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পায়খানা। মধ্যে দূর্ব্বাদল-মণ্ডিত ভূখণ্ডে কতকগুলি ফুলের গাছ। মধ্য দিয়া বরাবর একটী রাস্তা চলিয়া গিয়া বাহিরে যাইবার অপর একটী ক্ষুদ্র দরোজায় মিলিয়াছে। উত্তরের মহলও ঐরূপ, কেবল উহাতে পায়খানা ও ইন্দারা নাই। তাহাতে তিন ধারেই সারি সারি অসংখ্য পাকশালা। বাহিরের ঐ উভয় মহলেরই সম্মুখ ভাগ খোলা। অর্থাৎ নিম্নবর্ত্তী একতালা ঘর ও বারাণ্ডার খোলা ছাদ। তাহার উপরে দাঁড়াইয়া নিম্নে সদর রাস্তার অবিরাম জন-প্রবাহ ও সম্মুখে অদূরে ভাগীরথীর পবিত্র জল-প্রবাহও দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্ভিন্ন, বাজারের সংলগ্ন ও গঙ্গাতটবর্ত্তী কতক কতক অট্টালিকা এবং দূর সম্মুখে ও পশ্চাতে পর্ব্বত ও অরণ্য প্রভৃতিও নয়ন আকর্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপ নানা কারণে এই ধর্ম্মশালাটী সকলেই বিশেষ মনোরম বলিয়া

বিবেচনা করেন। আমরা ধর্ম্মশালার ভিতরের মহলে একটী কুঠারি বাসের জন্য নিজস্ব করিয়া ও বাহির মহলে পাকের জন্য একটি কুঠারি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম।

১৩১৬।৩০শে চৈত্র।

অদ্য মহাবিষুব সংক্রান্তি, বুধবার, রোহিণী নক্ষত্র, সৌভাগ্য-যোগ। আমরা ভাবিলাম, যথার্থই আজি আমাদের সৌভাগ্য-যোগ। নতুবা এমন মহাপুণ্যদিনে হরিদ্বারের ন্যায় মহাতীর্থে আমাদের গঙ্গাস্নানের সুসংযোগ হইবে কেন? ভারতের কত দেশের কত গঙ্গাস্নানার্থী নর-নারী আজি এই মহাতীর্থে সমবেত হইয়াছে, কে বলিতে পারে? আমরাও সেই দুর্ভেদ্য লোকারণ্যে মিশিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে ভাগীরথীর নিত্যশীতল পবিত্র সলিলে একে একে অবগাহন করিলাম। আমাদের বাহ্য আভ্যন্তর পাপ-পঙ্ক বিধৌত হইয়া গেল বলিয়া স্পষ্ট যেন অনুভব করিলাম। তীর্থের এমনি মাহাত্ম্য! কত দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, যোগী, পরমহংস, কত গৃহস্থ নর-নারী এ তীর্থে স্নাত হইয়া সৌভাগ্য-বলে তাহার উক্ত অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য অনুভব করিতেছেন।

ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বোত্তর ভাগে প্রবাহ-নিমগ্ন হর্‌কি-পেড়ি বা হরের যোগপীঠ আছে। অর্থাৎ মহাদেব এইস্থানে যোগাসনে অধিষ্টিত ছিলেন। রাজর্ষি ভগীরথের কঠোর তপস্যায় প্রসন্না হইয়া জাহ্নবী যখন হিমালয় ভেদ করিয়া ভগীরথের সহ এইস্থানে উপস্থিত হন, মহাদেব পূর্ব্বক্ষণে তাহা উপলব্ধি করিয়া জটাজূট বিস্তার পূর্ব্বক জাহ্নবীকে ঐ বিশাল জটাজালে আবদ্ধ করেন। জাহ্নবী তাহাতে কাতরা হইয়া কহিলেন, হে দেব, আপনিই প্রসন্ন হইয়া আমার অবতরণ-সময়ে মস্তকে প্রবাহ-বেগ ধারণ করিয়াছিলেন। আপনার অভিপ্রায় পাইয়াই তদবধি আমি নিম্নে অবতরণ করিতেছি। এখন আবার আমায় আবদ্ধ করিয়া আমাকে ও এই শরণাগত ভক্তকে নিরস্ত করিতেছেন কেন? আশুতোষ হাস্য-সহকারে

জটাজূট-গ্রন্থি হইতে অবিলম্বে গঙ্গার গতিপথ প্রদান করিলেন। তখন গঙ্গা উভয় দিকের পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত প্রবাহ-বিস্তার করিয়া সানন্দে ধাবিত হইলেন। এখন এই বিস্তৃত প্রবাহের সঙ্কোচ হইয়াছে। মধ্যে যে চর পড়িয়াছিল, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ঐ চরে আরও মাটি ভরাট করিয়া হরিদ্বারের দিকে যে ধারা,তাহাকে ক্যানেল-রূপে পরিণত করিয়া দূরবিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন, উহা সাহারাণপুর, মজঃফরনগর, মিরট প্রভৃতি প্রদেশ হইয়া কাণপুর পর্য্যন্ত গিয়া গঙ্গার সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হইয়াছে।

স্নানান্তে তটে বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার স্থান অদ্য দুষ্প্রাপ্য, এইরূপ নিবিড় জনতার সমাগম হইয়াছে। অগত্যা কুশাবর্ত্ত ঘাটে যাইবার নিমিত্ত আমরা জনতার মধ্য দিয়া তটভূমি অতিক্রম করিতে লাগিলাম। এই প্রশস্ত তটভূমি পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে সম্বদ্ধ ছিল, এক্ষণে পাথরের টালি দিয়া সুসন্নিবদ্ধ হইয়াছে। হরিদ্বারের এই প্রশস্ত তটভাগের রমণীয়তার তুলনা বোধ হয় আর কোন তীর্থে নাই। মহাবিষুব সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে এই মহতী জনতার নিবিড় সন্নিবেশ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম না যে দ্বাদশ বৎসর অন্তর কুম্ভমেলার সময় সমাগত লক্ষ লক্ষ লোকের এখানে কিরূপে সমাবেশ হয়। তটের সম্মুখ-ভাগে জগৎপাবনী মাতা জাহ্নবী শীতল-নির্ম্মল প্রখরপ্রবাহে সুদীর্ঘ সোপান-পঙ্‌ক্তি প্রক্ষালিত করিয়া কলকল রবে দিবারজনী প্রধাবিত হইয়াছেন। আর পশ্চাদ্‌ভাগে শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, দেব-মন্দির প্রভৃতি এ স্বভাবসুন্দর স্থানের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। কত রাজা মহারাজ, সাধু মোহান্ত প্রভৃতি অদ্যাপি এই স্থানে ও ইহার সংলগ্ন বহুদূর-পর্য্যন্ত প্রসারিত তটভূমিতে ঐরূপ অট্টালিকাশ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছেন। এই প্রশস্ত তটভাগের নানাস্থানে জটাজূটধারী বিভূতি-ভূষিতদেহ কত কত সাধু সন্ন্যাসী কেহ পূজা-অর্চ্চনা, কেহ মালা-জপ, কেহ স্তোত্রপাঠ, কেহ ভোগ ও আরতি কালীন শঙ্খধ্বনি, কেহ

ধর্ম্মোপদেশ দান করিতেছেন। স্নাতোত্থিত কত পুণ্যাত্মা ব্যক্তি কত ভক্ত, ভিক্ষু, অনাথ, সাধু-প্রভৃতিকে অন্ন, বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি দান করিতেছেন, আর সকল মিলিয়া তুমুল কলকল রবে চতুর্দ্দিক্ নিরন্তরভাবে মুখরিত হইতেছে! দেখিতে দেখিতে আমরা কুশাবর্ত্ত ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এখানেও ঐরূপ জনতা, ঐরূপ দানধ্যান, অধিকন্তু এখানে যাত্রিগণ পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতেছেন। আমরাও এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

হরিদ্বারের গঙ্গাতট যেরূপ বাঁধান আছে উল্লেখ করিলাম, ব্রহ্মকুণ্ডের সম্মুখভাগে গঙ্গার প্রবাহের মধ্যেও তেমনি অনেকটা স্থান সুন্দররূপে বাঁধান আছে এবং তট হইতে ঐ বাঁধান স্থানে যাইবার জন্য একটী সুন্দর সেতুও আছে। তথায় দাঁড়াইয়া অনেকে নির্ম্মল জলে মৎস্য-শ্রেণীর সন্তরণ ক্রীড়া দেখিয়া থাকেন। বস্তুতঃ দলবদ্ধভাবে, নির্ভয়ে, ধীরে ধীরে সন্তরণশীল ছোট-বড় মৎস্য-সমূহের ক্রীড়াভঙ্গি দেখিতে অতি সুন্দর। এ পবিত্র তীর্থে প্রাণিহিংসা না থাকায় মৎস্যেরাও ঐরূপ হিংসা ও ভয়ের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ নহে। বরং কৌতুকদর্শী যাত্রীদিগের নিক্ষিপ্ত খই, মুড়ি, ময়দার গুলি প্রভৃতি অনেক সময় উহারা ভোজন করিতে পায়। মৎস্যের ঝাঁকে ঐ সকল বস্তু নিক্ষেপকালে, মৎস্যগুলির সাগ্রহে সবিক্রমে ঐ নিক্ষিপ্ত খাদ্য-বস্তুর ভোজনব্যাপার দেখিয়া ও নির্ম্মলজলে তাহাদের গতিবিধি, বিহার-বিক্রমাদি সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর করিয়া দর্শকেরা বড়ই আনন্দ অনুভব করেন।

এখানকার প্রাচীন দেব-মূর্ত্তি কয়েকটীর নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে ভৈরবনাথের মূর্ত্তি সিন্দুরে মণ্ডিত, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র। ইঁহার আখড়ার জমি শতাধিক বিঘা হইবে! গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই দেবোত্তর জমির উপর কর ধার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন শুনিলাম। অবশ্য ইহার বিশেষ কোন কারণ থাকিবে। এই জমি ভিন্ন আরও এক খানি

গ্রাম ভৈরবনাথের সম্পত্তি আছে। ভৈরবনাথের অদূরে মায়াদেবীর প্রস্তর-নির্ম্মিত বহু প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। মায়াদেবী চতুর্ভুজা ও ত্রিমস্তক-ধারিণী। ভুজচতুষ্টয়ে চক্র, ত্রিশূল,অভয় ও নর-কপাল। সর্ব্বনাথ মহাদেবের মন্দিরটী অতিসুন্দর ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। দেবদেবের লিঙ্গ-মূর্ত্তিও অতি রমণীয়। ইন্দোরের রাণী গঙ্গাতীরেই কয়েকটী সুদৃশ্য মন্দিরে কয়েকটী সুরম্য দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। সাধু, মোহান্ত প্রভৃতির স্থাপিত আরও কয়েকটী দেব-মন্দির আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিল্বকেশ্বর স্থানটী আমার অধিক মনোরম বলিয়া বোধ হইল। রাজপথ ছাড়িয়া রেলের রাস্তার নীচে দিয়া কিছুদূর যাইলেই নগরের কোলাহলশূন্য স্থানে পর্ব্বতের নিম্ন-ভূমিতে কাননমধ্যে বিল্বকেশ্বর মহাদেবের দর্শন পাওয়া যায়। বিল্বকেশ্বর বোধ হয় বিল্বকাননেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কালে সে কাননভাগের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন একটীমাত্র বিল্বতরু উক্ত নামপরিচয় সূচনা করিতেছে। বিল্বকেশ্বরের অঙ্গনে নিম্ববৃক্ষতলে কোন ভক্ত কুণ্ডলিনী-বেষ্টিত আর ১টী শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। আর এক ভক্ত ১টী ইন্দারা ও আগন্তুক-পূজারি-প্রভৃতির বাসার্থ এক প্রকাণ্ড পাকা দালান প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। স্থানটী কি পবিত্র ও সুন্দর! দেবভূমি ও তপো-ভূমি এইরূপ নিভৃত-নিস্তব্ধ ও পবিত্র হওয়াই প্রার্থনীয়। ইহার পার্শ্বেই ললিতা-নামক শুষ্কগর্ভ ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যনদীর উপর ললিতাদেবীর মন্দির। এইরূপ হরিদ্বারে দর্শনীয়পদার্থ অনেক আছে। কিন্তু দূর ও সঙ্কট তীর্থ দর্শনে আমাদের চিত্ত অধিক উৎসুক ও উদ্বিগ্ন থাকায় আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে এখানকার সকল দৃশ্য দর্শন করিতে পারি নাই। বর্ণিত স্থানগুলি ভিন্ন, হরিদ্বার হইতে ১ মাইল উত্তরে ভীমগোড়া নামক স্থানে ভীমেশ্বর মহাদেব ও ভীমকুণ্ড, পর্ব্বতকন্দরে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি, নারায়ণের দশাবতারের মূর্ত্তি ও কালিকামাতার মূর্ত্তি, হরিদ্বারের অপর পারে নীলধারা ও তাহা পার হইয়া চণ্ডীর পাহাড়,উক্ত পাহাড়ের উচ্চ শিখরদেশে

মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত চণ্ডীদেবী সকলে দর্শন করিয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে কনখল, যথায় দক্ষরাজ শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তদীয়া কন্যা জগন্মাতা সতী ঐ যজ্ঞে অনিমন্ত্রিতরূপে উপস্থিত হইয়া বিশাল যজ্ঞসভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে পিতৃকৃত পতিনিন্দা শ্রবণে মর্ম্মান্তিক অভিমানে ও অপমানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, ঐ পবিত্রস্থান, তথায় প্রতিষ্ঠিত সতীকুণ্ড ও দক্ষেশ্বর শিব প্রভৃতিও অবশ্য দর্শনীয়।

হরিদ্বার কাশী-কাঞ্চী প্রভৃতি মোক্ষপ্রদ সপ্তপুরীর অন্যতম পুরী। *। ইহা গঙ্গাদ্বার, মায়াপুরী প্রভৃতি নানানামে অতিপ্রাচীন কালাবধি বিখ্যাত। (১) এক্ষণে ইহার হরিদ্বারনামই সমধিক প্রচলিত। কিন্তু তাহাতেও কিছু গোল আছে, অনেকে ইহাকে হর-দ্বার বলিয়া থাকেন। হিন্দীতে "হর-দোয়ার" তাহারই অপভ্রংশ, ইহাও তাঁহারা বলিয়া থাকেন। সর্ব্বনাথ, ভৈরবনাথ, বিল্বকেশ্বর প্রভৃতি শিবমূর্ত্তির অধিষ্ঠান স্থান বলিয়া বোধ হয় হর-দোয়ার নামপক্ষে তাঁহাদিগের অধিক আস্থা ও দৃঢ় সংস্কার। দক্ষিণাপথ ভ্রমণকালে বিষ্ণুকাঞ্চীর একটী প্রাচীন পাণ্ডাও আমাকে বলিয়াছিলেন যে সপ্তপুরীর মধ্যে শিবের ৩॥০ ধাম ও বিষ্ণুর ৩॥০ ধাম। অর্থাৎ কাশীপুরী, মায়াপুরী, অবন্তী ও কাঞ্চীপুরীর অর্দ্ধাংশ শিবের এবং অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারাবতী ও কাঞ্চীপুরীর অপরার্দ্ধ বিষ্ণুর। যাহা হউক, মূল কথা, নাম লইয়া হরি-হরে এরূপ ভেদবুদ্ধির উন্মেষ না করাই কর্ত্তব্য। উভয়ই একবস্তু জানিয়া ভূরিপ্রচলিত নামের ব্যবহারই বোধ হয় উত্তম। একজন রসজ্ঞ কবি এ বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা এই—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরীদ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥ পদ্মপুরাণ।

(১) কেচিদূচুর্হরিদ্বারং মোক্ষদ্বারং পরে জগুঃ।
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেহপ্যাহুঃ কেচিন্মায়াপুরীং পুনঃ॥ কাশীখণ্ড।

উভয়োরেকা প্রকৃতিঃ
প্রত্যয়ভেদাদ্ বিভিন্নবদ্ ভাতি।
কলয়তি হরিহরভেদং
লোকো যৎ তদ্ বিনাশাস্ত্রম্॥

অর্থাৎ হরি ও হর উভয়েরই প্রকৃতি এক, কেন না একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনবশে ভিন্নগুণসমাবেশে হরিহরাদি ত্রিমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা শাস্ত্রবাক্য। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে সম্যক্ প্রত্যয়ের ভেদ-বশতঃ অথবা মনুষ্যভেদে তাহাদের হৃৎপ্রত্যয়ও ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় হরি ও হরও তাঁহাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া অনুভব হয়। এইরূপে লোকে যে হরি-হরে ভেদবুদ্ধি করে, তাহা গুরুতর প্রত্যবায়জনক, সুতরাং তাহা বিনাশাস্ত্র অর্থাৎ তাহাদের বিনাশের অস্ত্রস্বরূপ।

পক্ষান্তরে, হরি-হরের প্রকৃতি বা ধাতু অভিন্ন, কেননা এক হৃধাতু হইতেই উভয়ের উৎপত্তি। কেবল প্রত্যয়ের ভেদ অর্থাৎ ইপ্রত্যয় করিলে হরি ও অন্ প্রত্যয় করিলে হর এই পদ হয়, এইরূপে প্রত্যয়ের ভেদমাত্র আছে। অতএব লোকে যে হরি-হরের ভেদ কল্পনা করে, তাহা বিনা-শাস্ত্রই করিয়া থাকে, অর্থাৎ ব্যাকরণাদি শাস্ত্র জ্ঞান না থাকায়ই করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় কথা, হরিশব্দ ব্রহ্মবাচক, শিব-বিষ্ণু সকলই তাঁহার প্রকট-মূর্ত্তি; সুতরাং উহাতে গোলের কোন কথাই নাই।

হরিদ্বার হইতেই উত্তরাখণ্ডের যাত্রা আরম্ভ। যিনি সমগ্র উত্তরা-খণ্ডের যাত্রা ও পরিক্রম ইচ্ছা করেন, তিনি অগ্রে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী, পরে কেদারনাথ ও তৎপরে বদরীনাথ গমন করেন। তন্মধ্যে গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী অনেকেই যান না, বিশেষতঃ বাঙ্গালী যাত্রী ঐ পথে নাই বলিলেই হয়। আবার যমুনোত্তরীতে সর্ব্বাপেক্ষা যাত্রী কম হয়। কেদার ও বদরীনাথ যাত্রাই সাধারণতঃ প্রচলিত। এই

উভয় যাত্রার মধ্যেও অগ্রে কেদারনাথ দর্শন ও পশ্চাৎ বদরীনারায়ণ দর্শনের বিধি আছে। ইহার ব্যতিক্রম করিলে যাত্রা নিষ্ফল হয় * বলিয়া বিজ্ঞলোকে ঐরূপই করিয়া থাকেন। আমাদের আকাঙ্ক্ষা অনেক, আমরা সমগ্র যাত্রা সম্পন্ন করিব বলিয়াই স্থির করিলাম। সুতরাং প্রথমে গঙ্গোত্তরীর পথই আমাদের অবলম্বনীয়। হরিদ্বার হইতে দেরাদুন ও টিহরী হইয়া উক্ত গঙ্গোত্তরী ১৬২ মাইল রাস্তা হইবে। তন্মধ্যে হরিদ্বার হইতে দেরাদুন পর্য্যন্ত রেল আছে। এই পথটুক ট্রেণে যাওয়াই স্থির করা গেল।

অনেকেই হরিদ্বার হইতে ট্রেণে বরাবর দেরাদুন না যাইয়া গো-গাড়ী বা একা যোগে প্রথমে হরিদ্বার হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী হৃষীকেশ গমন করেন। হৃষীকেশ দর্শনান্তে তথা হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী দেরাদুন সহরে পঁহুছেন। পদব্রজে যাইবার সিধা রাস্তা আছে। হরিদ্বার হইতে রেলওয়ে যোগে হৃষীকেশ যাইতে হইলে হরিদ্বার ষ্টেশনে উঠিয়া রায়বালা বা হৃষীকেশরোড-নামক পরবর্ত্তী ষ্টেশনেই নামিতে হয়। এই ষ্টেশন হইতে হৃষীকেশ ৮ মাইল পথ। হৃষীকেশ দর্শনান্তে তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার উক্ত হৃষীকেশরোড ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণে উঠিতে হয়। তথা হইতে দেরাদুন ৩ ষ্টেশন মাত্র। হৃষীকেশ সুপ্রসিদ্ধ তপস্যার ক্ষেত্র। উক্ত তপোভূমির দর্শনে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে বলিয়া সকলে হৃষীকেশ হইয়াই গঙ্গোত্তরী বা কেদারনাথ গমন করেন। আর বদরীনাথ ত হৃষী[illegible] হইয়াই যাইতে হয়। কেদার ও বদরীনাথ দর্শনান্তে বরাবর

অকৃত্বা দর্শনং বৈশ্য কেদারস্যাঘনাশিনঃ।
যো গচ্ছেদ্ বদরীং তস্য যাত্রা নিষ্ফলতাং ব্রজেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পুর্ব্বং কেদারদর্শনং।
কার্য্যং পুণ্যেপ্সনা শ্রেষ্ঠিন্ ন ভেদঃ শিবকৃষ্ণয়োঃ।

স্কন্দপুরাণ।

দক্ষিণমুখে রামনগরের পথ দিয়া প্রতিগমন করাই অন্যান্য সকল দেশীয় যাত্রীদিগের পক্ষে সুবিধা বলিয়া তাঁহারা সেইরূপই করেন। কেবল পঞ্জাব ও জম্মু প্রভৃতি অঞ্চলের পক্ষে তাহা সুবিধাজনক নহে বলিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার হরিদ্বার হইয়াই ফিরেন। আমরাও সেইরূপ বদরীনাথ হইতে ফিরিবার সময় ছুট-ছাট সমস্ত দেখিয়া হৃষীকেশ হইয়া পুনর্ব্বার হরিদ্বার আসিব মনঃস্থ থাকায় আপাততঃ হৃষীকেশে যাওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না।

দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যাইবার জন্য একটা লোক চাই, তজ্জন্য বালা-নামক ব্রাহ্মণজাতীয় একটা বলিষ্ঠ পাহাড়ী লোক স্থির করা গেল। * পাহাড়ের পথ অতিক্রমের সুবিধার্থ এক এক গাছ বাঁশের লাঠী ও দুই দুই জোড়া করিয়া দড়ির জুতা প্রত্যেকের প্রয়োজন হইবে শুনিয়া বাজার হইতে তাহাও সংগ্রহ করিলাম। লাঠি /০ আনা করিয়া ও জুতা ॥৵০ আনা করিয়া পাওয়া গেল।

দেরাদুন।

৩রা বৈশাখ—১৩১৭।

প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া হরিদ্বার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। বেলা ৮টায় দেরাদুনের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ॥৵০ আনা করিয়া টিকিট হইল। হিমালয়ের প্রান্তদেশ দিয়া আমাদের ট্রেণ না-দ্রুত, না-বিলম্বিত মধ্যগতিতে চলিতে লাগিল। গতিপথে অবিলম্বে দুইটী টনেল পাইলাম। অর্থাৎ ঐ ঐ স্থানে পর্ব্বত ভেদ করিয়া রেল কোম্পানি ২টী সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া যাইতে হইল।

* হরিদ্বারে এই সময় ঐরূপ কুলী, কাণ্ডী ও ঝাম্পান যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইহার অগ্রে দেরাদুন, রাজপুর ও মসূরিতেও উহা মিলে। অধিকন্তু রাজপুর, মসূরি, দেবপ্রয়াগ ও শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানে অশ্বও পাওয়া যায়।

ঐ সুড়ঙ্গদ্বয়ের মধ্য দিয়া গাড়ি চলার সময় দিবাভাগেও ঘোর অন্ধকারে কিছুই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইল না। দুইধারে নিবিড় অরণ্য, মাঝে মাঝে ক্রমনিম্ন, শুষ্ক ও শীর্ণ গিরিনদীগর্ভ; স্থানে স্থানে কদাচিৎ পাহাড়ী-লোকের ক্ষেতি ও বস্তি। ক্রমে হৃষীকেশরোড বা রায়বালা, দহিবালা ও হরাবালা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নে আমরা দেরাদুন ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। দেরাদুনে শিখ্‌জাতির সম্প্রদায়বিশেষের গুরু-দোয়ারা বা গুরু-দ্বারনামক যে প্রকাণ্ড ভবন ও মন্দির আছে, আমরা ঐ ভবনে আশ্রয় লইলাম। ভবনের অন্যধারে ১টী এবং ভবনে প্রবেশের দ্বারে ১টী প্রশস্ত সরোবর আছে। সরোবরের চারিধার সুবিস্তীর্ণ ঢালা সোপানবদ্ধ। তাহাতে সকল দিক্ দিয়া সকলে সরোবরে অবতরণ করিতে পারেন। ঐ দ্বিতীয় সরোবরটীর ধারে, ভবনদ্বারের সম্মুখে শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ১ ঝাণ্টা বা ধ্বজা প্রোথিত আছে। এই দ্বারই সদর দরোজা। আমাদের ন্যায় আরও বহু আগন্তুক এই গুরু-দোয়ারা ভবনে প্রবেশ করিলেন ও আশ্রয় পাইলেন। ভবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যে মহান্ত মহারাজের দপ্তরখানা, কাছারি, বৈঠকখানা প্রভৃতি কত গৃহই দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। এক প্রান্তভাগে পাকশালা। এই মহল পার হইয়া অন্য এক মহলে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের মধ্যে উচ্চ মন্দির। এই প্রাঙ্গণের চারিধারেও ঘর আছে। যথাস্থানে অনেকগুলি ফুলগাছ ও ১টী সুন্দর পুষ্করিণীও আছে। মন্দিরের অভ্যন্তর পুষ্পগন্ধে সর্ব্বদা আমোদিত। ঐ পবিত্রস্থানে গ্রন্থসাহেব রক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকেন। মন্দিরের চারি কোণ হইতে চারিটী স্তম্ভ উঠিয়াছে ও মধ্যস্থল হইতে ১টী বৃহৎ গম্বুজ উঠিয়াছে। ফলতঃ এই গুরু-দোয়ারা অতি পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সর্ব্বপ্রকারে রমণীয়। মক্কা হইতে প্রত্যাগত যে সকল মুসলমান পর্য্যাটক এই স্থান দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পবিত্র মক্কা-ধামের আদর্শেই এই গুরু-দোয়ারা নির্ম্মিত।

আমরা পৃথক্ পাকের স্থান ও বাসের স্থান পাইয়াছিলাম। তাহারই কিয়দংশ পরিষ্কার করিয়া লইয়া পূজার স্থান করিলাম। হরিদ্বার হইতে কমণ্ডলু ভরিয়া যে গঙ্গাজল আনা হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের সকলেরই পূজা আহ্নিকের কার্য্য শেষ হইল। অন্য জলেরও এখানে অভাব নাই। গুরু-দোয়ারার বাহিরে কিঞ্চিৎ দূরে শিখদিগের ১টী সুরক্ষিত, সুস্বাদুজল পূর্ণ, সুগভীর ইন্দারা আছে। জলের প্রয়োজন হইলে ঐ ইন্দারার ধারে কুটীরবাসী তিলকধারী ১ জন রক্ষক তামার ডোলে করিয়া ইন্দারা হইতে জল উঠাইয়া দিয়া থাকেন। অন্যকে তাঁহারা ঐ জলপাত্র বা ইন্দারা স্পর্শ করিতে দেন না। এই ইন্দারা ভিন্ন দূর পর্ব্বত হইতে ঝরণার নির্ম্মল জল নলযোগে আনাইয়া সহরের সর্ব্বত্র সরবরাহ করিবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু আমাদের সহযাত্রী প্রথমা সঙ্গিনীর (আমি সুবিধার জন্য উহাঁদিগকে প্রথমা, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া বলিয়া উল্লেখ করিব) ঐ সকল জল ব্যবহার করা আপত্তিজনক হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণী হইতে জল আনাইয়া তাহাতে পাকের কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। যদিও ঐ পুষ্করিণীতে হস্তী প্রভৃতি অবতরণ করিয়া জল আলোড়ন করে এবং তজ্জন্যই বোধ হয় জলও কিছু অপরিষ্কার বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু প্রথমার মত আমাদের সকলের মান্য, বিশেষতঃ অগ্নিস্পর্শে সকল দোষই দূর হইয়া যায়, এই বিবেচনা করিয়া আমি মনে মনে আশ্বস্ত হইলাম।

আমরা বৈকালে বাজারে বহির্গত হইলাম। বাজারটী বৃহৎ। বাজারে দুইধারে হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারি, পার্‌সী, কাবুলী প্রভৃতির অসংখ্য দোকান দেখা গেল। আমরা হিন্দুস্থানী দোকান হইতে কয়েকখানি কম্বল ও কয়েকটা গেঞ্জি ক্রয় করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

রাত্রিকালে বাটীর মধ্যে সহসা সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইয়া ঐ দিকে গিয়া দেখিলাম, একটী প্রকাণ্ড সুসজ্জিত গৃহে গুরু নানকজীর পবিত্র ভজন তাললয়সহকারে সঙ্গীত হইতেছে। গায়ক বাঁয়া-তবলায় স্বয়ং

সঙ্গত করিয়া গান করিতেছেন। অপর গায়ক এপ্রান্তে সঙ্গীতের অনুসরণ পূর্ব্বক জুড়িতে ঐ সঙ্গীতে কণ্ঠ মিলাইতেছেন। প্রথম গায়ক সঙ্গীতের মধ্যে মধ্যে শ্রোতার অলক্ষিতে বিরামপূর্ব্বক আরব্ধ সুরের সহিত সঙ্গীতের মর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন, কিন্তু সে অবকাশেও মৃদু-মধুর সঙ্গতের বিচ্ছেদ হইতেছে না, কৌশলক্রমে সুরলয় রক্ষা করা হইতেছে। একপার্শ্বে প্রবীণা স্ত্রীলোকগণ, অপরদিকে পুরুষগণ, মধ্যে মহান্ত-মহারাজ ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে ঐ সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। আমি সুরলয়ে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ১টী ভৃত্য তাহা দেখিতে পাইয়া আমায় গৃহমধ্যে যাইতে অনুরোধ জানাইল। আমি তাহাতে ইতস্ততঃ করিয়াও তথায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে মহান্ত মহারাজ তাহা অবগত হইয়া আমাকে ডাকাইলেন। অগত্যা আমাকে গৃহমধ্যে গিয়া শ্রোতার আসন গ্রহণ করিতে হইল। সঙ্গীতের সমাপ্তিকালে যখন নানকজীর ভণিতা গায়কের কণ্ঠে উচ্চারিত বা উদ্গীত হইল, সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ কত ভক্তিসহকারেই তখন প্রণত হইলেন! পবিত্রভজন শুনিয়া আমিও পরমানন্দ বোধ করিলাম।

দেরাদুনের পথে দেখিবার কয়েকটী মনোরম ও অদ্ভুত দৃশ্য আছে। একটী সহস্রধারা নামক জলপ্রপাত। ইহা মসূরিশৈলের এক নিভৃত দেশ হইতে পতিত হইতেছে। মসূরিপর্ব্বতের নিম্নভূমিতে রাজপুরগ্রাম অবস্থিত। রাজপুর পর্য্যন্ত গাড়িযোগে আসিয়া তথা হইতে কতক ডাণ্ডী আরোহণে, কতক পদব্রজে, জঙ্গলপূর্ণ, উচ্চনীচ ও সঙ্কীর্ণ প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিলে ১টী গিরিনদী পাওয়া যায়। নিবিড় তরুলতাচ্ছন্ন উচ্চপর্ব্বত চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, পাদতলে শুভ্রফেনপুঞ্জে হাস্যমুখী গিরিনদী, আর তাহার অবিরাম কল্লোলকোলাহলময় প্রবাহ। আরও কিছুদুর নদীর ধারে ধারে অগ্রসর হইলে ঐ অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে তাহার নিবিড়তরুলতাচ্ছাদনের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র নির্ঝর স্তরে স্তরে লম্ফে লম্ফে অবতরণপূর্ব্বক নিম্নবর্ত্তী কন্দরের ছাদস্বরূপ, অন্যূন বিংশতি

হস্ত ঊর্দ্ধস্থিত, শতচ্ছিদ্রবিশিষ্ট এক শিলাখণ্ড হইতে বৃষ্টিধারার ন্যায় অবিরল সহস্রধারে ঝরঝর শব্দে পড়িতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, কন্দরের ছাদ হইতে তলপর্য্যন্ত নানাপ্রকার পুষ্পিত বনলতা ও নানাবর্ণের শৈবালরাজি ঐ স্থানকে অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করিয়া রহিয়াছে। দূর হইতে বোধ হয়, কে যেন বিচিত্র বর্ণের আসনের উপর সহস্র সহস্র হীরকখণ্ড নিরন্তর ছড়াইতেছে। আবার উহার উপর সূর্য্যকিরণসমূহ প্রতিফলিত হইয়া যখন রামধনুর সৃষ্টি করে, তখন উহার শোভা একেবারেই অনির্ব্বচনীয় ও অবর্ণনীয় হইয়া উঠে।

আর এক আশ্চর্য্য, সহস্রধারার নিকট অনেক গাছ পাতা পাথরে পরিণত হইতে দেখা যায়। একটী ক্ষুদ্রলতার হয়ত অর্দ্ধেক সজীব আছে, অপর অর্দ্ধ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে! পাতাগুলি পাথরের পাতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! কিন্তু প্রস্তরে পরিণত হইলেও পাতাগুলির প্রত্যেক শিরা প্রত্যেক রেখা সুস্পষ্ট অনুভব হইতেছে! অনেক ভ্রমণকারী এইরূপ প্রস্তরীভূত শাখাপত্রাদি এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান।

ইহার অদূরে নদীপারে ১টী গন্ধকের প্রস্রবণ আছে। একটী সামান্য ছিদ্র দিয়া উহার যে ধারা নির্গত হইতেছে, তাহাতে গন্ধকের গন্ধ অনুভূত হয় এবং ঐ জল যে স্থান দিয়া বহিয়া যাইতেছে, তথাকার সকল পদার্থই একটু নীলাভ প্রতীয়মান হয়।

দেরাদুনের উত্তরপশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল দূরে টপকেশ্বর নামে এক গিরি-গহ্বর আছে। গহ্বরমধ্যে এক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন। গহ্বরের ছাদ হইতে শিবের মস্তকোপরি টপ্ টপ্ করিয়া নিরন্তর বারিবিন্দু পতিত হয় বলিয়া শিবের নাম টপকেশ্বর হইয়াছে। এবং তাঁহার অধিষ্ঠান বলিয়া স্থানের নামও বোধ হয় ঐরূপ হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র গিরি-নদী মন্দগমনে ঐ শিবালয়ের পাদ-দেশ বিধৌত করিয়া প্রবহমাণা রহিয়াছে। স্থানটী অতি রমণীয়, যেন তাপসদিগের তপঃক্ষেত্র বলিয়া

বোধ হয়। পূর্ব্বে ঐ স্থানে যাইতে হইলে লোকালয় ত্যাগপূর্ব্বক প্রায় এক মাইল উন্নতানত পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া এক গভীর গিরিনদী-গর্ভ পার হইয়া উচ্চ গিরিগাত্রে অবস্থিত ঐ গহ্বরের সমীপে যাইতে হইত। ঐ গিরিনদীর গর্ভ যেরূপ গভীর হউক, তাহাতে জল অতিসামান্য, বোধ হয় এক বিঘত পরিমাণ সচরাচর থাকে, কিন্তু কদাচিৎ এমন ঘটনাও হয়, যে হঠাৎ উপর হইতে প্রবলবেগে জলপ্রবাহ নামিয়া পড়ে। সে সময় শিবদর্শনার্থী যাত্রী তথায় থাকিলে, কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এইরূপ বিপদ্ সম্ভাবনা হয় জানিয়া তাহার নিবারণার্থ কলিকাতার বিখ্যাত দানশীল মহাত্মা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বহুব্যয়ে পর্ব্বত-গাত্রে গুহাপর্য্যন্ত ১টী প্রস্তরময় পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আর নদীগর্ভ দিয়া যাইবার প্রয়োজন না হওয়ায় টপকেশ্বরের দর্শনের পথ নিরাপদ্ হইয়াছে। *

রাজপুর।

১৩১৭।৪ঠা বৈশাখ।

রাজপুর।

অদ্য প্রত্যূষে আমরা গাড়ি করিয়া দেরাছুন হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্বকথিত রাজপুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই ৭ মাইল উত্তম বাঁধা রাস্তা। এই প্রশস্ত রাস্তার উভয়পার্শ্বে বহু সাহেব লোকের বাড়ী ও বাগান, দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের অন্তরাল দিয়া দূরবর্ত্তী পর্ব্বতের দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত না হইলে, ইহা বাঙ্গালাদেশের

* এই অঞ্চলে ভ্রমণকালে উক্ত কয়েকটী দৃশ্যের কথা আমাদের জানা না থাকায় আমরা ঐগুলির দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি। আর কেহ ঐরূপ বঞ্চিত না হন, এই অভিপ্রায়ে নৃপেন্দ্র বাবুর "দেরাছুন"—প্রবন্ধ হইতে ঐ দৃশ্যাবলীর বৃত্তান্ত এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কোন শ্রেষ্ঠ সহরের সুন্দর সাহেব-টোলা বলিয়াই আমাদের অনুভব হইত। যাহাহউক, ক্রমে আমাদের গাড়ীর পথ শেষ হইল, উচুঁপথে গাড়ি উঠে না। এক মুসলমান সরাইএর নিকট আসিয়া গাড়ির গতি বন্ধ হইলে আমরা গাড়িভাড়া ৩৷৷০ টাকা মিটাইয়া দিয়া ও পাহাড়ী কুলী বালার পিঠে বাসন ও পরিচ্ছদাদির বোঝা চাপাইয়া দিয়া আশ্রয়ের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সহরের সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া বামধারে থানার পাশ দিয়া এক ক্ষুদ্র রাস্তায় অবতরণপূর্ব্বক এক শিবালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের নিম্নভূমিতে অবস্থিত সুন্দর মন্দির, মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বর নামক লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেবও অতি সুন্দর এবং তাঁহার পূজারি বা অধ্যক্ষ লোকটীও অতি উদারচরিত শিষ্ট-ব্যক্তি। মন্দিরের পার্শ্বে ২।৩টী কুণ্ড আছে। অদৃশ্য ঝরনার সুস্বাদু জল ধীরে ধীরে সর্ব্বদা তাহা পূর্ণ করিতেছে। গুহার ন্যায় মন্দিরের সংলগ্ন ৩।৪টী কুঠারিও আছে। নিকটে নিকটে আম, কাঁটাল লেবু, পেয়ারা, বেল প্রভৃতি বৃক্ষগুলি স্থানটীকে ছাইয়া রাখিয়াছে। সেই ঘনচ্ছায়া-স্নিগ্ধ নির্জ্জন দেবস্থানটী শাস্ত্রোক্ত ঋষিদিগের আশ্রম বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরের সংলগ্ন যে ৪।৫টী অতিরিক্ত ঘর আছে আগন্তুক অতিথিদিগের তাহা ব্যবহারে লাগে। আমরা তাহায় ১টী গৃহ আশ্রয় করিয়া অপরটীতে পূজা অর্চ্চা ও পাকভোজনের স্থান করিলাম। কুণ্ডের শীতল জলে স্বচ্ছন্দে সকলের স্নান সম্পন্ন হইল। পাহাড়ী ফুল ও পূজারি ঠাকুরের রোপিত ফুলগাছগুলি হইতেও কতকগুলি ফুল পাওয়া গেল। আশ্রমের বিল্ববৃক্ষ হইতে বিল্বপত্র সংগ্রহ করা হইল। পরমানন্দে নিজ বাণেশ্বরের ও মন্দিরস্থ মহেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া ভোজন ব্যাপার সমাধা করিলাম।

ভোজনান্তে বিশ্রামের সময় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। মন্দিরের পর হইতেই ঢালুভাবে ক্রমে-উচ্চ বিপুলকায় পাহাড় বিস্তৃত হইয়া সেদিক্ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। সে বিশালকায়ে উর্দ্ধে উর্দ্ধে পুষ্পিত ও পল্লবিত

নিবিড় শালবৃক্ষশ্রেণী যেন স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। ইহাদের নিম্ন-ক্রোড়ে লুক্কায়িত এই দেবমন্দির এখানে না আসিলে বোধ হয় কেহই কখন দেখিতে পায় না। সহরের জনতা ও জন-কোলাহলের এত নিকটে এমন নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ পর্ব্বতও অরণ্যময়স্থান এবং তন্মধ্যে এমন আশ্রয় স্থান কখন আমার অনুভবেই আসে নাই। এই শান্ত, সুস্নিগ্ধ, নিভৃত ও পবিত্র স্থানে সমস্ত জীবন কাটাইতে আমার অভিলাষ হইল! অন্তর্য্যামী মহেশ্বরই জানেন, তাঁহার পবিত্র নিকেতনে আমার কিরূপ চিত্তগতি হইয়াছিল এবং আমরা সেই কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কিরূপ যাবজ্জীবন-স্মরণীয় সুখ-শান্তি ও আরাম উপভোগ করিয়াছিলাম!

এরূপ স্থান যদিও সহসা ছাড়িয়া যাইতে পারা যায় না, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এ পথে বাহির হওয়া গিয়াছে, তাহাতে দিনে দিনে কিছু কিছু করিয়া সে পথ অতিক্রম করাই কর্ত্তব্য বোধ হওয়ায় অগত্যা বিশ্রাম বন্ধ করিয়া আমাদিগকে যাত্রারই উদ্‌যোগ করিতে হইল। আরও কথা, সম্মুখে মসূরি (মনসূরি) পর্ব্বতের বিষম চড়াই, যতটুকু অগ্রসর হইয়া থাকা যায়, তাহাই মঙ্গল। এই বিবেচনা করিয়া আমরা বাহির হইলাম। কিন্তু সকল স্থানে আশ্রয় পাওয়া যায় না। আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞাসিয়া নিকটে তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। অগত্যা অল্প কিছুদূর উঠিয়া সহরের সদর রাস্তার উপর দক্ষিণ হাতী ৺লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দিরের সংলগ্ন ধর্ম্মশালায় রাত্রিযাপনার্থ আশ্রয় লইলাম। মন্দিরের অধ্যক্ষ অতি শিষ্ট প্রকৃতির লোক, আগন্তুককে আশ্রয়দানে কোনরূপে তিনি কুণ্ঠিত নহেন। এ প্রদেশে কোন দেবালয় বা ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ বা পূজক প্রভৃতিকে আমি অশিষ্ট কি উদ্ধত অথবা বিদেশীর প্রতি সদয় ব্যবহারে বিমুখ দেখিলাম না। ধর্ম্মসংসৃষ্ট পবিত্র স্থানেরই এ সকল মাহাত্ম্য বলিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি হইল। আশ্রয় স্থির হওয়ার পরও অনেকটুকু বেলা অবশিষ্ট আছে দেখিয়া সড়কে একবার বাহির হইলাম।

পথে উৎসব-মত্ত অবিরাম জনস্রোত দেখিয়া জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, সেদিন তথায় অম্বিকাদেবীর মেলা আছে। পথবাহী লোকের সঙ্গে সেইপথে কিয়দ্দূর উঠিতে উঠিতেই মেলাস্থান দৃষ্টিগোচর হইল। খুব উচ্চ ভূমির উপর দেবীর স্থান। তথায় ও তাহার পার্শ্বে বিস্তর লোক সমাগম হইয়াছে, নানা দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হইতেছে, অসংখ্য লোকের কল কল রবে আর দেবীস্থানের সম্মুখে অবিরামে বাদিত তদ্দেশীয় একপ্রকার বাদ্যের উৎকট শব্দে কাণ বধির হইয়া যাইতেছে, পদ ধূলায় চারিদিক্ অন্ধকার হইয়াছে। সুতরাং শীঘ্রই আমার মেলাদেখার সাধ মিটিল, অবিলম্বে বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল।

মস্থূরির পথে।
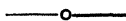
৫ই বৈশাখ।

প্রত্যূষে আমরা বহির্গত হইলাম। প্রত্যূষ হইতে আমাদের প্রকৃত চড়াই আরম্ভ হইল। চড়াইএর বা পর্ব্বতারোহণের বার্ত্তা কখন জানিতাম না, আজি তাহা পরিষ্কাররূপে ও ক্রমে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রথম প্রথম বিশেষ কষ্টবোধ হয় নাই, বরং আনন্দ ও কৌতুক বোধই হইয়াছিল এবং প্রভাতের স্নিগ্ধতায় নূতনতর পথে আরোহণে উৎসাহ বোধই হইয়াছিল। পথও বেশ প্রশস্ত, পথে কত খচ্চর, অশ্ব ও তাহার আরোহী, কত দাণ্ডী বা পদব্রজে যাত্রী আমাদের সহযাত্রী হইয়াছে, দুই ধারে কত দোকান, কত অট্টালিকা রহিয়াছে, এ সকল দেখিতে ভালই বোধ হইল। কিছুদুর যাইয়াই দুইধারের দোকান ও অট্টালিকা কমিতে লাগিল। ১ মাইলের পর ১টী টোল বা মাশুল আদায়ের ঘর আছে। এখানে ঘোড়ার মাশুল ।৷০ আনা ও ডাণ্ডীর মাশুল ১৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। ক্রমে পথ কিছু অপ্রশস্ত ও পার্শ্বের খাদ গভীর হইতে

লাগিল। কিছু অপ্রশস্ত হইলেও পথটী ইংরেজেরা যথাসাধ্য উত্তম করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছেন। এমন কি পাশা-পাশি ২টী অশ্ব এ পথে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে এবং পথের পার্শ্বে দৃঢ় রেলিং দেওয়াও আছে, কিন্তু প্রতিপদে উর্দ্ধে আরোহণের কষ্ট কোথা যাইবে? হরিদ্বার হইতে যে এক এক গাছী লাঠী লওয়া হইয়াছিল, এখন তাহার প্রয়োজন অনুভব করিতে লাগিলাম। লাঠীগাছটীকে তৃতীয় ১খানি পা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর শরীরে প্রথম-প্রথমেই কি অতদূর সহ্য হয়? পথও কম নহে, রাজপুর হইতে মসূরী পর্ব্বতের ল্যাণ্ডর বাজার পর্য্যন্ত ক্রমোচ্চ ৭ মাইল পথ। যত চড়াই হউক বা যত দীর্ঘ হউক যাইতেই হইবে, সকলেই ঐরূপে যাইতেছে। পথবাহী লোকও এখানে কম নহে, কিন্তু তজ্জন্যই আরও কিছু যেন অসুবিধা। অশ্বরোহী সাহেব ও সিপাহী সৈন্যের সবেগে আরোহণ ও পালে পালে খচ্চর শ্রেণীর গতায়াতে ধূলা উড়াইয়া অনবরত সম্মুখ ও পশ্চাৎ অন্ধকারময় হওয়ায় বিশেষ কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। খচ্চরগুলিও ৫।৭ পা চলিয়া একবার করিয়া দাঁড়াইতেছে, আবার হাঁপাইতে হাঁপাইতে চলিতেছে। ইহারই মধ্যে অনেক সাহেব-মেম ঝাম্পানে চড়িয়া পুস্তক পাঠ করিতে করিতে যাইতেছেন, অনেক আয়া সাহেব-শিশু সহ ঝাম্পানে উঠিয়া বোধ হয় নিজ জন্ম-সাফল্য অনুভব করিতে করিতে ও আমাদের প্রতি অবহেলার দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিয়াছে। ২।১টী দীর্ঘশ্মশ্রু, মিশনরী-জাতীয় প্রবীণবয়স্ক সাহেব কিন্তু পথবাহী লোকদিগকে জিজ্ঞাসায় আমাদিগকে হিমালয়ের তীর্থযাত্রী জানিয়া সবিস্ময়ে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। হয়তো ভাবিল, "এ বর্ব্বর জাতি ধর্ম্মের জন্য এ কি অনুচিত কষ্ট স্বীকার করিতেছে! ধর্ম্ম ত স্নিগ্ধ আলোকপুঞ্জে উজ্জ্বলিত, সুসজ্জ নরনারীসমূহে সমাবৃত, মধুর গীতবাদ্যে মুখরিত বিচিত্র অট্টালিকার মধ্যেই সপ্তাহে সপ্তাহে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে!" সমান-ধর্ম্মা কতকগুলি লোক আমাদিগকে

দেখিয়া গঙ্গামায়ী কি জয়! জয় বদরী-বিশালাকি জয়! উচ্চারণ করিতে লাগিল। আমরা শুষ্ক-নীরস কণ্ঠে কষ্টেসৃষ্টে তাহার উত্তরে দেবতাদিগের জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিলাম। ক্লান্তদেহে অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে অবিরামেই চলিয়াছি, কদাচিৎ পার্শ্বস্থ খাদের দিকে দৃষ্টি পড়িলে কি ভয়ঙ্করই বোধ হইতেছে। কিন্তু সময়ে সময়ে পশ্চাতে ফিরিয়া দূর ও নিম্নবর্ত্তী রাজপুর সহরের অট্টালিকাশ্রেণী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শ্বেতরেখার ন্যায় কি সুন্দরই দেখাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাও ক্ষণেকের জন্য। পরক্ষণেই শ্রমে রৌদ্রে কষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা পিপাসার কষ্টই অধিকরূপে অনুভব হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়া খাড়ীপানি কি জড়িপানি এইরূপ একটা স্থানে ১টী পানীয়শালা বা জলসত্রের গৃহ পাইলাম। নেপালরাজমহিষী স্বর্গীয়া কৃষ্ণকুমারীদেবীর স্মরণার্থ নেপালরাজসরকার হইতে সাধারণ পথবাহীর জন্য ঐ জলদান করা হইয়াছে। উপযুক্ত স্থানে কি উপযুক্ত দান! কাণ্ডীওয়ালা, ঝাম্পানওয়ালা, অশ্ব, অশ্বারোহী পর্য্যন্ত তথায় ঝরনার নির্ম্মল শীতল জল যথেচ্ছ পান করিয়া পিপাসা দূর করিতেছে ও ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতেছে। আমরা তথায় মুহুর্মুহুঃ চোখে মুখে জল দিয়া লইলাম, কিন্তু বিশ্রামের বিশেষ উপায় দেখিলাম না, তথায় খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই। অগত্যা আবার উপরে উঠিতে হইল। কিছু দূরে গিয়া কয়েকখানি মিষ্টান্নের দোকান দেখা গেল, কিন্তু তথায় জল নাই। পূর্ব্বোক্ত জলসত্রে জলসংগ্রহ করিয়া আনিয়া এখানে আসিয়া ভোজনাদি করিতে হয়, সেও এক অসুবিধা। অগত্যা সেখানেও আমাদের বিশ্রাম হইল না। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া আমাদের মোটের পরীক্ষা এইখানে দিতে হইল। অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে আমরা মোটের মাশুল /১০ পয়সা দিয়া যে রসিদ লইয়া আসিয়াছি, সেই রসিদের এখানে পরীক্ষা হইল। পরীক্ষান্তে আমরা ক্লান্তপদে শুষ্ককণ্ঠে আরও আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বালুগঞ্জনামক

স্থানে উপস্থিত হইলাম। এখানে জলও আছে, খাবারও আছে, কিন্তু কাঠ নাই। কাঠ দোকানে পুঞ্জীকৃত করা আছে, কেহ তাহা বেচিতে বা দিতে স্বীকার করিল না। বোধ হয় পথিকেরা পাকশাক করিয়া খাইলে তাহাদের পুরি-কচুরি বিক্রয়ের কিছু অসুবিধা হয় বলিয়া তাহাদের এইরূপ ব্যবহার বা ব্যবস্থা। যাহা হউক, এ অসুবিধা ছাড়া আর এক অসুবিধা এই যে এখানে সাধারণের জন্য আশ্রয় স্থান নাই। সাহেবদিগের জন্য হোটেল আছে মাত্র। অগত্যা প্রকৃত পক্ষে গাছতলা আজ আমাদের সার হইল। কিন্তু বৃক্ষতলে নিবিড় ছায়ায় অবাধ বায়ু প্রবাহে কি তৃপ্তি, কি শান্তি! ঝরনার জল আনিয়া সেখানে বসিয়াই স্নানাহ্নিক ও কিঞ্চিৎ জলযোগ সমাপনপূর্ব্বক যতক্ষণ রৌদ্রের তেজ কম না হয়, কম্বল পাতিয়া পড়িয়া থাকা গেল।

আপাততঃ এই বিশ্রাম খুবই তৃপ্তিকর হইল বটে, কিন্তু শূন্য উদরে সে তৃপ্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। অগত্যা পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিয়া চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর উঠিয়া সম্মুখে যে শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, মনে করা যায় এইবার বুঝি চড়াই শেষ হইল, কিন্তু আবার একপাক ফিরিয়া সম্মুখে সেইরূপ উন্নত আর এক শৃঙ্গ ও সেইরূপ চড়াই! এ চড়াইয়ের কি শেষ হইবে না? সঙ্গী লোকে বলে, "আব্‌তো আয় গিয়া মহারাজ," কিন্তু আবার চড়াই দেখিতে পাই, আর আসাও শেষ হয় না।
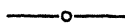
মসূরি ও ল্যাণ্ডরের শিবালয়।

ক্রমে বড় সুন্দর দৃশ্য এখন চক্ষে পড়িতে লাগিল। পথের পার্শ্বে নিম্ন পাহাড়ে সুন্দর সুন্দর বস্তির সংখ্যা, বস্তিতে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে জলপ্রণালীগুলি কি

সুন্দর দেখা যাইতে লাগিল! বুঝা গেল মস্হুরি ও ল্যাণ্ডর সহর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, বা ঐ সহরের সীমায় আমরা পদার্পণ করিয়াছি। আমাদের পথের নিম্নে উর্দ্ধে কত সুন্দর সুন্দর বাড়ী দিক্ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে! বাড়ীগুলি চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষাবলীপূর্ণ, যেন এক একটী কুঞ্জগৃহ। কি শান্তিপূর্ণ, সুস্নিগ্ধ, নিস্তব্ধ! কি সুসজ্জিত ও সুসন্নিবিষ্ট! কোন কোন বাড়ী ঠিক্ টিলার মাথা সমতল করিয়া তাহার উপর প্রস্তুত করা হইয়াছে। সবগুলিই যেন রাজযোগ্য, রাজভোগ্য! পথের পার্শ্বস্থ গভীর খাতগুলিও যেন আমূল নিবিড় হরিত বৃক্ষাবলীতে সুসজ্জিত! পাহাড়ের উপর পাহাড়, তাহার উপর পাহাড়! পাহাড়ের অন্ত নাই, অবধি নাই! আবার সেই সকল পাহাড়ের গাত্রে উর্দ্ধে নিম্নে যেখানে-সেখানে সেইরূপ অগণ্য অট্টালিকা! অট্টালিকারও অন্ত নাই, অবধি নাই। সেই সেই সৌধতলে যাইবার জন্য বহু বহু সুন্দর শাখাপথ, মূলপথ হইতে কোনটা অধোদিকে ধাবিত হইয়াছে, কোনটা উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়াছে! ইহাই সাহেবদিগের মস্হুরি-শৈলনিবাস, আর ঐ বাজারের নাম ল্যাণ্ডর-বাজার! আমাদের ভারতভূমে এরূপ সৌখীন শৈলনিবাস বোধ হয় সাহেবেরা আসিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।

অপরাহ্ন।

আমরা ল্যাণ্ডর-বাজারের মধ্য দিয়া একটী শিবালয়ে উপনীত হইলাম। শিবালয়ের পূজারি আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক স্থান দিলেন, পাকের উদ্‌যোগ আয়োজন করিয়া দিলেন। সহরের বণিক্‌পঞ্চায়ত হইতে এ শিবমন্দিরের পূজাভোগ এবং যাত্রীদিগের আশ্রয় ও ভোজ্যাদি দান রূপ সদাব্রত কার্য্য চলিতেছে। ব্যবসায়ীদিগের এরূপ মহৎ মহৎ পুণ্যকার্য্য অনেকস্থানে আছে, শুনিলাম। আপাততঃ এই মন্দিরের পূজক প্রভৃতির সদ্ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম। মধ্যাহ্নে

আমাদের আহার হয় নাই শুনিয়া ইঁহারা কতই ব্যস্ত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আমাদের পাকের সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া দিলেন।

৬ই বৈশাখ।

আমাদিগের সঙ্গী বোঝাওয়ালা বালা, তাহার যে যে আত্মীয় এই সহরের সাহেববাড়ীতে চাকরি করে, তাহাদের সঙ্গে দেখা করিবে বলিয়া ও নিজের জন্য শীতের পোষাক কিছু সংগ্রহ করিবে বলিয়া সময় লওয়ায় অদ্য আমাদের যাওয়া হইল না, শিবালয়ে বিশ্রাম করিতে হইল। অবকাশ পাইয়া বৈকালে এদিক্ ওদিক্ একটু দেখিবার জন্য আমি শিবালয় হইতে বাহির হইলাম। দক্ষিণধারে পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে সেনা-নিবাস আছে শুনিয়া বাম-হাতি রাস্তায় বাজারের দিকে অগ্রসর হইলাম।

সম্মুখেই রাস্তার মধ্যস্থলে একটী জলের কল। অগণ্য লোক জলপাত্র হস্তে একটীর-পর-একটী অনবরত তথা হইতে জল লইয়া যাইতেছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য দোকান। ভারতের নানাদেশীয় উৎকৃষ্ট ফল-মূল, তরি-তরকারি, চাল-ডাল, আটা-মিষ্টান্ন, তৈল-ঘৃত-ঔষধ, অস্ত্র-শস্ত্র, ছাতা-ছড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ, সূক্ষ্ম ও সৌখীন শিল্পদ্রব্য সকলই এখানে পাওয়া যায়। অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপরিস্থ সহর বলিয়া কোন জিনিষের অভাব নাই, বরং সাহেবী সহর বলিয়া সাধারণ সহরে যাহা না পাওয়া যায়, এখানে সে সমুদয়ই পাওয়া যায়। হোটেল, হস্‌পিট্যাল, ডিস্‌পেন্‌সারি, লাইব্রেরী, স্কুল, ক্লব, ক্রীড়াভূমি প্রভৃতির ত কথাই নাই। শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সমভূমিস্থ সহরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। কিন্তু কিছু অগ্রসর হইলেই পার্শ্বে সেই ভয়ঙ্কর গভীর খাদ হঠাৎ চমকিত করিয়া দেয়! মনে হয়, কোন্ আকাশস্পর্শী পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া আসিয়াছি। সম্মুখে মোড় ফিরিবার সময় কি বিষম ক্রম-নিম্ন পথে অবতরণ করিতে হইল! ঐ সকল স্থানে দ্রুতগামী

অশ্বারোহী ও শকটারোহীদিগকে সাবধান করিবার জন্য সাইন্‌বোর্ড দেওয়া আছে। সঙ্কটস্থানকে সুখ-স্বচ্ছন্দতাময় ও সুবিধাময় করিবার জন্যই বা কত প্রয়াস! আরও একটু অগ্রসর হইলে চতুর্দ্দিকের উন্মুক্ত ও প্রসারিত দৃশ্য বড় সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। তখন মনুষ্য-শিল্প ভুলিয়া বিশ্ব-শিল্পীর মহান্ শিল্প-সৌন্দর্য্য মনে জাগ্রত হইল। কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে প্রশংসা করিব? আর সে প্রশংসা স্রষ্টার অধিক করিব, না তাঁর সৃষ্ট ক্ষুদ্র জীবের অধিক করিব? যাহা হউক, এই সকল সুন্দর ও উদার দৃশ্য দর্শন, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু-সম্ভোগ, সুরলোকোচিত সৌধশিখর-বাস ও তৎসহ জীবনের সর্ব্ববিধ আরাম উপভোগের জন্য সাহেবেরা কোটি কোটি মুদ্রাব্যয়ে যে এই শৈল-নিবাস সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আপাততঃ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলাম না। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আফিসের প্রত্যাগত, উদয়াস্ত লেখনী-চালনে ক্লান্ত, ২।১টী বাঙ্গালীর সহিতও সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আর অধিক বিলম্ব না করিয়া, তদ্দণ্ডেই-আলোক-মালায়-উজ্জ্বলিত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সেই পূর্ব্বের পথ দিয়া ধীরে ধীরে আশ্রয়-মন্দিরে উপনীত হইলাম।
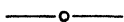
পাকদাণ্ডির পথে দুর্গতি।

৭ই বুধবার, একাদশী।

অদ্য একাদশী। একাদশীর উপবাসের দিন পথ চলা বড় কষ্টকর। কেননা, পথশ্রমে পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলে তাহার উপশমের উপায় নাই। কিন্তু অদ্যকার দিন মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া বেশ ঠাণ্ডা ছিল, শীতও বোধ হইতেছিল। অদ্য অল্পদূর চলিলে কষ্ট নাও হইতে পারে, বিবেচনা হইল। বিশেষতঃ পারণের দিন পারণ না করিয়া চলা যাইবে না,

বেশীও চলা যাইবে না। দুই দুইটা দিন একেবারে নষ্ট না করিয়া যতটুকু যাওয়া যায়, তাহাই লাভ বোধ হওয়ায় চলিতে আরম্ভ করা গেল। মসূরি ছাড়াইয়া ৫ মাইল আসিলে একটা দোকান পাওয়া গেল। এইখান হইতে বরাবর সড়ক রাস্তায় টিহরী রাজধানী হইয়া উত্তরকাশী দিয়া গঙ্গোত্তরী যাইতে হয়।* আর এখান হইতে বাঁ-হাতি কিছুদূর যাইলে, নীচে দিয়া এক রাস্তা আছে, ঐ রাস্তা ধরাসু চটীর কিছু আগেই প্রথমোক্ত সড়ক রাস্তায় মিলিয়া এক হইয়া উত্তরকাশী গিয়াছে। এই দ্বিতীয় রাস্তা সড়ক রাস্তার ন্যায় প্রশস্ত না হইলেও খুব সংক্ষিপ্ত। ইহার নাম পাকদাণ্ডীর রাস্তা। পাকদাণ্ডী রাস্তার মর্ম্ম আগে আমরা বুঝিতে পারি নাই। সঙ্গী বোঝাওয়ালা আমাদিগকে বুঝাইতে পারে নাই, অথবা আমরা তাহার কথা বুঝিতে পারি নাই। তাহার কথার মর্ম্ম আমরা এইমাত্র বুঝিয়া ছিলাম যে সড়ক রাস্তা ত্যাগ করিয়া নীচের রাস্তায় গেলে ২২ মাইল রাস্তা কম হইবে। এক সাধুও ঐ কথায় সম্মতি দিলেন। তাহাতে আমার মন ঐ দিকেই টলিল। এই আমার প্রথম ও বিষম মতিভ্রম হইল। আমি ভাবিলাম, ২২ মাইল রাস্তা কম হইবে, ইহা কি সাধারণ সুবিধা? সড়ক রাস্তা নহে, নাই হইল, উহাও ত একটা রাস্তা? নিম্ন দিয়া রাস্তা, হইলই বা নিম্ন দিয়া রাস্তা? পর্ব্বত-শিখরে ওঠার চাইতে নিম্ন দিয়া চলাই ত বরং ভাল। এই সকল ভাবিয়া আমি আর কাহারও মতামতের বিশেষ অপেক্ষা না করিয়া নীচের রাস্তায় যাইতেই সম্মতি দিলাম। বালার ত তাহাই মত। বালা আনন্দে দ্বিতীয় কথাটী না কহিয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। আমরা পিছু পিছু চলিলাম। ক্রমে নিম্নভাগে অবতীর্ণ হইতেছি, কিন্তু নিম্নদিকে রাস্তা কই? এ সঙ্কীর্ণ নামাল দিয়া জল-প্রবাহই বেগে নামিতে পারে, মানুষ চলিবে কিরূপে? এইরূপ ভাবিতেছি, কিন্তু নামাও চলিতেছে। মনে মনে অস্পষ্ট ইচ্ছা হইতেছে যে, দেখা যাউক্ আরও পরে কিরূপ

আছে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বড় বিষম বোধ হইতে লাগিল। ক্রমাগত ঐরূপ পথে নামিতে সকলেরই বিশেষ কষ্ট হইতে লাগিল। শেষে আমাদের দ্বিতীয়া সহযাত্রী সেই হড়া-গড়া সঙ্কীর্ণ পথে ক্রমাগত নামিতে নামিতে নামার বেগ সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া গিয়া তাঁহার পা মচ্‌কাইয়া গেল। তথাপি তিনি চলিতে বিরত হইলেন না! স্ত্রীলোকের যেমন স্বভাব, কষ্টে সহসা ভ্রূক্ষেপ নাই, বা উচ্চবাচ্য নাই। কিন্তু ঐ অত্যাচারে শীঘ্রই তাঁহার পা বিলক্ষণ ফুলিয়া গেল।

ক্রমে আমারও অনেক ভ্রম দূর হইতে লাগিল। আমি ভাবিয়াছিলাম উপরে ওঠাই কষ্ট, নীচে নামা আর তেমন কষ্ট কি? এখন দেখিলাম, তেমন কষ্ট কেন, ততোঽধিক কষ্ট। আর নীচেও ত যেমন-তেমন নীচে নয়, একবারে পাতালে অবতীর্ণ হওয়া। এরূপ হইবে তাহাই বা কে জানে? বালাকে জিজ্ঞাসিলে বলে, এরূপ বরাবর হইবে না, এবং আর একটু দূর যাইলেই ধর্ম্মশালা মিলিবে। অগত্যা সেই পাতাল-গর্ভ পার্ব্বত্য নদীর ধার দিয়া অবিরামে চলিতে লাগিলাম। কিছু বিলম্বেই ধর্ম্মশালা পাওয়া গেল।

কিন্তু আজি কি সকল আশায়ই একইরূপ ছাই পড়িবে? হরি-হরি, ধর্ম্মশালার কি মূর্ত্তি! ধর্ম্মশালা টিনের ১ খানি ছাদমাত্র। তাহার কোন দিকে কোন আবরণ নাই। এই পাকদাণ্ডির পথে যাহারা যাতায়াত করে, তাহাদেরই পাক-ভোজনের চিহ্নমাত্র মেঝেয় বিদ্যমান। ২।৪ খানা পাথর কুড়াইয়া উনন প্রস্তুতপূর্ব্বক মেঝের নানাস্থানে নানা পথিক যে পাক ভোজন করিয়া গিয়াছে, ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া যাওয়া যে আবশ্যক, তাহা তাহারা মনেও করে নাই, কেহ পরিষ্কার করিয়াও যায় নাই। চুলা সকল যেমন তেমনই পড়িয়া আছে, ঠিক্ যেন নিমতলার শ্মশান-স্থান! শ্মশানেরই মত জনশূন্য,

নিকটে লোকজন কেহ নাই, একখানি দোকান পর্য্যন্ত নাই। আমরা ধর্ম্মশালার অবস্থা দেখিয়া হতাশ হইলাম।

কতক আশ্বাসের বিষয় এই যে, বিধবাদিগের সেদিন কোন উদ্‌যোগ আয়োজনের প্রয়োজন ছিল না। আমি যদিও একাদশীতে একাহার করিয়া থাকি এবং আহার্য্য দ্রব্যাদি যদিও ল্যাণ্ডর-বাজার হইতে সংগ্রহ-পূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া আনা হইয়াছিল, কিন্তু নূতনতর পাকদাণ্ডির পথের ব্যাপারে, অধিকন্তু দ্বিতীয়া শ্রীমতীর পা মচ্‌কাইয়া দারুণ যন্ত্রণাগ্রস্ত হওয়ার দুর্ঘটনায় আমিও নিতান্ত ভগ্নচিত্ত ও নিরুৎসাহ হইয়াছিলাম, পথিমধ্যে অনুরুদ্ধ হইয়াও ভোজনের চেষ্টা করি নাই, এক্ষণেও আর পাকে প্রবৃত্তি হইল না, কতকটা স্থান যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া সায়ং সন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক জলযোগ করিলাম মাত্র। অতঃপর সেই আবরণ-শূন্য, অবাধ বায়ু-প্রবাহপূর্ণ শীতল স্থানে আপন আপন কম্বল বিছাইয়া শয়নপূর্ব্বক আমরা নিজেদের অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, প্রভাতে এ পথ দিয়া অবশ্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম্য লোকেরা গতায়াত করিবে, তাহাতে কাণ্ডীওয়ালা অবশ্যই মিলিবার সম্ভাবনা; অসময় হইয়াছিল বলিয়াই অদ্য সে সকল পাওয়া যায় নাই। পাহাড়ী লোকদিগের কাণ্ডী, ঝাম্পান প্রভৃতি বহনের ব্যবসায়ই ত এ সময়ে প্রধান। পরস্পর এই সকল বিতর্ক-বিবেচনা ও আশা-ভরসা করিতে করিতেই ক্লান্তদেহ আমরা শীঘ্র নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

৮ই বৃহস্পতিবার।

অদ্য দ্বাদশীর পারণ, সঙ্গে যাহা সংগ্রহ ছিল, তদ্দ্বারা পাকের চেষ্টা করা গেল। সঙ্গে দ্রব্যাদি না থাকিলে সে দিনও একাদশী হইত। কেননা দোকান নাই, গ্রামেও কিছুই মিলে না। সুখের মধ্যে নিকটে ১টী ঝরণা আছে, তা ঝরণা দেখিয়াই ধর্ম্মশালা করিবার নিয়ম। তথায় জল লইতে অনেক পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ আসিতে লাগিল, কিন্তু

দুগ্ধ বা কোনরূপ খাদ্যবস্তু সেখানে পাওয়া যায়, ইহা তাহারা কেহ স্বীকার করিল না। না করুক, সঙ্গে যে চাল, ডাল, ঘৃত, আলু ছিল, তাহাতেই আমাদের মধ্যাহ্নের কার্য্য নির্ব্বাহ হইল। কিন্তু দাণ্ডিপ্রভৃতির কোন উপায় হইল না। পথবাহী লোকেরা আমাদের প্রার্থনা শুনিয়া কেহ তাহাতে মনোযোগ করিল না। বুঝা গেল, এখানে কাণ্ডী প্রভৃতি বহিবার লোক উপস্থিত কেহ নাই। যাহারা ছিল, তাহারা মসুরি-হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যে সকল পাহাড়ী লোক আছে, তাহারা অন্য কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সে কাজ ছাড়িয়া গেলে তাহাদের চলে না। কেবল ১ জন, যেন একটু অগ্রাহ্য করিয়া কি ভাবিয়া কহিল আচ্ছা, যদি ৬৲ টাকা দেও, ভওয়ন (ভবন) পর্য্যন্ত কাণ্ডীতে লইয়া যাইতে পারি। বালা বিরক্ত হইয়া কহিল, না তোর যাইতে হইবে না, ৩।৪ মাইলের জন্য ৬৲ টাকা তোমার রূপ দেখিয়া দিব? পীড়িতা শ্রীমতীও ঐ সামান্য পথের জন্য ঐরূপ অন্যায্য ব্যয় করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। ভবনে চেষ্টা করিলে কাণ্ডী পাওয়া যাইতে পারে, ইহাও ২।১ জনের মুখে ভরসা পাওয়া গেল। অগত্যা আমরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ভবন উদ্দেশেই রওনা হইলাম।

পথে দেখিবার অনেক বস্তু আমাদের পক্ষে নূতন নূতন মূর্ত্তিতে, আমাদের চক্ষে এই প্রথম পতিত হইল।

—o—

গিরিনদী-গর্ভ।

আমরা যেস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা অতি-উচ্চ পাহাড়ের অতি নিম্নদেশ। নদীগর্ভ বিনা, পাহাড়ের নিম্নদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। গিরিনদীর প্রখর স্রোতে ও বর্ষার আকস্মিক জলরাশির উপর হইতে দুর্দ্দম প্রবাহপাতে নদীর সুগভীর তলদেশে যেন পাহাড়ের অস্থিপঞ্জর বা

হাড়-গোড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উচ্চ নীচ শিলাখণ্ড যথাসম্ভব সমতলভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া নদীগর্ভের বা গর্ভস্থ প্রবাহ-পথের স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। ক্ষীণধারা এখনও কল-কলশব্দে অবিরামে চলিয়াছে। ক্ষীণধারার সে ক্ষীণশব্দে যেন করুণারই সূচনা হইতেছে, অর্থাৎ আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি, ইহাই যেন সে কলরবের একমাত্র অর্থ। কোথাও কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ-উর্দ্ধভাগে কতদিক্ হইতে কতশত প্রস্রবণের ধারা অবিরল বাহির হইতেছে, গৌরবিণী গিরি-তটিনীর বর্ত্তমান এই দীন দশায়, ইহা তাহার চক্ষু ফাটিয়া সমাকুল শতধারা নির্গম নয় ত? পাহাড়ীরা ঐ সকল প্রস্রবণের ধারার সুবিধা পাইয়া সেই সেই স্থল যথাসাধ্য সমতল করিয়া, যব-গমের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে এবং যথেচ্ছ-পতিত অপর্য্যাপ্ত শিলাখণ্ড সরাইয়া-নড়াইয়া ও উঁচু করিয়া দিয়া আপন-আপন ক্ষেত্র বিভক্ত ও চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে এখন যব-গোধুমাদি শস্যও বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রস্রবণের আসন্ন ক্ষেত্রগুলির শস্য হরিতকান্তিময়, আজিও সে সকল পাকিবার উপক্রম হয় নাই, দূরবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহের শস্য পরিপক্ক হইয়া পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। কোথাও গর্ভস্থ ক্ষীণধারার নিত্যসিক্ত উভয়পার্শ্বে শস্যশূন্য বহুক্ষেত্র বিদ্যমান; বোধ হয়, সেখানে বীজবপনেরই বুঝি সুযোগ হয় না। আবার কোথাও পূর্ব্বকথিত-মত উপরি-উপরি শিলাখণ্ড স্থাপনে প্রাচীরের মত উচ্চ করিয়া উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলি ক্ষেত্রস্বামী বেড়িয়া রাখিয়াছে, অথচ সে সকল ক্ষেত্রে কোন শস্য নাই। বোধ হয় কোন গতিকে এবার তাহারা যো হারাইয়াছে। সকলেরই এমন কোন-না-কোন সময়ে যোগ্য-ক্ষেত্রেও যো হারায়! যাহাহউক, ঐ সকল পাষাণময় বৃতি বা বেড়ার বাহুল্যে গমনাগমনের পথ অনেকস্থলেই বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া রহিয়াছে। দুই দিকে দুই পাহাড়ের মধ্যের স্থান যেখানে কিছু বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে, সেখানেই ঐরূপ ক্ষেত্র ভূরি-পরিমাণে বিদ্যমান

আবার ঐ মধ্যবর্ত্তীস্থান যেখানে সঙ্কীর্ণ, সেখান দিয়া যাতায়াত আরও কষ্টকর। বড় বড় শিলাখণ্ড তথায় কেহ যেন শয়ন, কেহ উপবেশন, কেহ বিবিধভঙ্গিতে আরাম করিয়া আছে। এক এক খানা পাথর দেখিলে বোধ হয়, যেন হস্তী আরোহী লইবার জন্য মাহুতের সঙ্কেত-ক্রমে চারি পা গুটাইয়া বসিয়াছে। তথায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন পাথরগুলির উপর দিয়া গমনের পথ হইয়াছে। কোথাও নিম্নের মধ্যেও অনেকের মাথাগুলি উদ্ধত, তাহারা যেন পড়িয়াও নুইতে চাহে না। তথায় ঐ পাথরগুলি ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া পাহাড়ী লোক দলে দলে বোঝা লইয়া অক্লান্তশরীরে লম্ফে-ঝম্পে চলিয়াছে। ২১ জন সাধু-সন্ন্যাসীও কদাচিৎ আনন্দে আপন মনে চলিয়াছেন। আর আমরা প্রাণপণ কষ্টে, অতি সতর্কে পা বাঁচাইয়া সেই পথ দিয়া চলিয়াছি। কোথাও দুইধারে সমান-উচ্চ পর্ব্বতগুলি যেন সারি বাঁধিয়া, গায়ে-গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও সঙ্কীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে অতি বিপুল স্থূল-স্থূল-প্রস্তরময় ভীনকায় পর্ব্বত খাড়া-সরলভাবে দাঁড়াইয়া ভ্রুকুটি-ভীষণ শুম্ভনিশুম্ভাদি দুর্জয় দানবের ন্যায় ভীমদর্শন হইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া মনে হয়, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এমন ভীষণ আকার কোথায় লুকান ছিল? আমরা কেমন করিয়া এরূপ দৈত্যদানবের গুপ্তনিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! কোথাও পার্শ্বস্থ পর্ব্বতের বিষম বর্দ্ধিত কায় ঐরূপ সঙ্কীর্ণ রাস্তার উপর নিদারুণ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; বোধ হইতেছে, এই মুহূর্ত্তে যেন সেই ভীষণ ঘটোৎকচমূর্ত্তি শৃঙ্গসহ সাজ্ঘাতিকশব্দে আমাদের মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। আমরা ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া এই সকল অদ্ভুতদৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। সুস্থ সময় হইলে ও এই স্থানটুকু-মাত্র আমাদের ভ্রমণের বিষয় হইলে আমরা এখানকার ঐ সকল দৃশ্য দর্শন করিয়া, নাজানি কতই আনন্দ উপভোগ করিতাম ও এই দৃশ্য দর্শনেই কত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতাম! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন

আমাদের না আছে মতির স্থিরতা, না আছে গতির স্থিরতা! দুর্দ্দৈবই এখন আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আর আমরা অন্ধের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিনা-বাক্যব্যয়ে চলিয়াছি! এখন আমাদের প্রাকৃতিক শোভার আস্বাদশক্তি কোথায়?

সহসা পথিমধ্যে সত্বরগামী একটী ভদ্রাকৃতি পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আলাপ-পরিচয়ে জানা গেল, তিনি উত্তরকাশীর একজন পাণ্ডা, তাঁহার নাম দামোদর রাজ-উপাধ্যায়। তিনি আমাদের এই পাকদাণ্ডির পথে আসার কথা ও আসিয়া এইরূপ দুর্গতি ভোগ করার কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং কহিলেন, ভওঅন নামক স্থানে কাণ্ডী মিলিবার সম্ভাবনা; চেষ্টা করিয়া যদি মিলাইতে পারি, স্থির করিয়া রাখিয়া যাইব। ঐখানে না পাই, তৎপরবর্ত্তী মরাড় গ্রামে পাইবার সম্ভাবনা, তাহারও চেষ্টা দেখিব। আমার বোঝাওয়ালা অগ্রে চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেছিনা বলিয়া আমাকে দ্রুত অগ্রসর হইতে হইয়াছে। নতুবা আমি আপনাদিগকে সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাইতাম। একটা কথা বলিয়া রাখি, আপনারা যখন উত্তরকাশী যাইতেছেন, সেখানে আপনাদিগকে একজন পাণ্ডা করিতেই হইবে, তখন আমার অনুরোধটা রক্ষা করিবেন,—আমি আপনাদের সেখানকার পাণ্ডা হইলাম জানিবেন। এই বলিয়া নিজের নাম বলিয়াদিলেন। তার পর দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া শীঘ্রই আমাদের দৃষ্টির দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন।

——০——

ভবনের ধর্ম্মশালা।

আমরা পাণ্ডাজীর কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। এইরূপ আশ্বাসই বা সে অনিশ্চিত, সঙ্কটপূর্ণ পথে দেয় কে? আর কষ্টের একটা

সীমা জানিতে পারিলেও কষ্ট অনেকটা লঘুবোধ হয়। তাই আশা বা আশ্বাসের আকর্ষণে একটু যেন বল পাইয়া আমরা অপরাহ্নে ভওঅন নামক স্থানের ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। প্রথমে নদীর তীরে ১খানি দোকান পাওয়া গেল, তাহার কিছু উপরে ঐ ধর্ম্মশালাটী। ধর্ম্মশালায় মোট ৩টী কুঠারি আছে; কুঠারিগুলি যেন কতকালের জীর্ণ, কতকাল অব্যবহৃত। সর্ব্ব নিম্নে নদীপ্রবাহের সমীপে এক দেবীর আস্থানও আছে। কিন্তু সবই নির্জ্জন-নিস্তব্ধ! কোথায় বা কাণ্ডীওয়ালা, কোথায় বা অন্যলোকজন! ভয় হইল, এ নিঃসহায়-সঙ্কট স্থানে রাত্রিকালে চোর-ডাকাইতে ত সর্ব্বনাশ করিবে না? সঙ্গী বালা আশ্বাস দিয়া কহিল, না বাবুজী, এ সকল দেশে সে ভয় নাই, সে সকল ভয় আপনাদের সেই সভ্য সহর দেশে। যাহাহউক, আমরা আলোয়-আলোয় ১টী কুঠারি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া যথাসাধ্য তাহা পরিষ্কার-পূর্ব্বক তাহাতে শয্যা বিছাইয়া লইলাম। তার পর নিবিড় অন্ধকারময়ী রাত্রি দেখা দিলেন, আর রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রামে বৃষ্টি! বৃষ্টির সঙ্গে শূন্য নদী-তীরের পুঞ্জীভূত শীতও বটে। শীতে ক্ষণে ক্ষণে হৃৎকম্প হইতে লাগিল। আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া অন্ধকারে মুদ্রিতচক্ষে হৃৎকম্পের সহিত ভাবিতে লাগিলাম, এ কি ভয়ঙ্কর দেশ! সমগ্রদেশে কি জনমানব-সম্পর্কও নাই!

৯ই বৈশাখ, প্রভাত।

প্রভাতে সূর্য্যোদয় দেখিয়া ত প্রাণ পাইলাম। এখন আর কাহাকেও কিছু দেখাইয়া দিতে হইবে না, কাহারও ভরসা করিতে হইবে না। নিজেরাই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া লইতে পারিব। দেখিলাম, নিকটেই নিম্নে একটী সুন্দর ঝরণা রহিয়াছে। ভালই হইল। অবিলম্বে ঝরণার জলে স্নান করিয়া সন্ধ্যাপূজা সমাপনপূর্ব্বক একটু জলযোগ করিয়া লইলাম। স্ত্রীলোকেরা ত প্রত্যূষে স্নান করিতে সকলের অগ্রগণ্য, তা শীত-গ্রীষ্মেই কি, আর অসুখ-বিসুখেই কি। ভোজনের সময়েই

তাঁহারা কিছু শিখিল। সকলকে না খাওয়াইয়া তাঁহারা খাইতে পারেন না; সকলকে পূর্ণ ভোজন করাইয়া যাহা থাকিবে, আপনারা তাহাতেই তৃপ্ত। কথা কয়টা লিখিয়া আমারও তৃপ্তি। কেননা, ভারতমহিলার এইরূপ ধর্ম্মানুগত আচার-ব্যবহার বোধ হয় পৃথিবীর অন্যত্র নাই। যাহা-হউক, আমাদের বোঝাওয়ালা বালার তাড়ায় স্ত্রীলোকেরাও অনেকটা শাসিত ও সংযত হইয়াছিলেন। পূজা অর্চ্চনাদি সকলকেই কিছু কিছু খাটাইয়া লইতে হইয়াছিল। কেননা, ভারবাহকেরা প্রভাতেই ভারাদি বহিতে অভ্যস্ত, সে সময়ের যৎকিঞ্চিৎ অপচয় হইলেও তাহারা যথেষ্ট ক্ষতি মনে করে। এজন্য প্রভাতে স্নানাহ্নিকের প্রতি বালার বিশেষ বিরক্তি ছিল। কিন্তু কি উপায়? এ অজ্ঞাত বিদেশে জল-স্থল-আশ্রয়াদি লাভ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, সুতরাং তাহার বিরক্তিতে আমরা প্রাপ্ত সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া নিত্যকর্ত্তব্যে নিত্যই অসুবিধায় পড়িতে যাইব কেন? তবে যথাসম্ভব, কার্য্যগুলি আমরা সংক্ষেপে ও সত্বরে করিয়া লইতাম। এইরূপ মধ্যাহ্নের ভোজন, আমরা পূর্ব্বাহ্নের পর্য্যটন শেষ পূর্ব্বক সুবিধামত আড্ডা না পাইয়া কখনও করিতাম না।

আমরা সকাল-সকাল যাত্রার উদ্‌যোগ করিলাম। আগে কোথাও কিছু পাওয়া যায় না যায় বিবেচনা করিয়া দোকান হইতে /২ সের আটা সংগ্রহ পূর্ব্বক পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। চলার পক্ষে কিছু অসুবিধা হইল, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তথাপি আমরা গতি বন্ধ করিলাম না। এ অনুপায়ে বসিয়া থাকিলে আরও অনুপায়। কিন্তু কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তা কষ্টের পথেই পড়িয়াছি, কষ্টকে ভয় করিলে চলিবে কেন? আর পীড়িতা সঙ্গিনীর ভগ্নপদেও যখন চলিবার কষ্ট সহ্য হইতেছে, তখন আমাদের সুস্থশরীরে আমরা কষ্ট সহ্য না করিব কেন? কাজের লোক কেহই ত বসিয়া নাই। আমাদের বোঝাওয়ালা পিঠে পুরা ১/০ মণ বোঝা লইয়া আমাদের অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে।

অন্যান্য পাহাড়ী লোকও আপন আপন বোঝা লইয়া ছুটিতে ছুটিতে যাতায়াত করিতেছে। বৃষ্টি বলিয়া আমরাই শুধু বসিয়া থাকি কি বলিয়া? সকলের দেখাদেখি আমরাও চলিতে আরম্ভ করিলাম।

যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরাও জমিতে সার দিবার জন্য কেহ গোবরের সার সংগ্রহ করিতেছে, কেহ সারের বোঝা পিঠে লইয়া চলিয়াছে, কেহ বা ঝরণায় জল লইতে আসিয়াছে। পরিধানে মলিন ঘাঘরা, ঘাড়ে হয় ত সারের বোঝা বা জলের পাত্র, কিন্তু সকলেরই সুস্থস্বচ্ছন্দ সবল দেহ, প্রায়ই গৌরবর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন, আকৃতি প্রায় সকলেরই সুন্দর। তাহাদের দেখিয়া আমার কালিদাসের বল্কল-পরিধানা অনিন্দ্যসুন্দরী শকুন্তলার বর্ণনা মনে পড়িল।
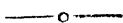
পাকদাণ্ডি পথের চড়াই।

নদীগর্ভের নিম্নদেশ দিয়া, তথাকার অল্প-উচ্চনীচ, অনেকটা সমতল এইরূপ রাস্তা বাহিয়া ভিজিতে ভিজিতে বহুক্ষণ আসিতেছিলাম। কিন্তু ক্রমে সে সুখও অন্তর্হিত হইল। এ পথে আবার চড়াই আরম্ভ হইল। সড়ক রাস্তায় চড়াই হয়, তাহার পার আছে; কিন্তু পাকদাণ্ডি পথের চড়াই যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা ভুক্তভোগী না হইলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না। পিপীলিকা-প্রভৃতি যেমন হাঁড়ার গা বহিয়া উঠে, ইহাও সেইভাবে উঠা। পর্ব্বতের পিঠ দিয়া নাম-মাত্র রাস্তায় ক্রমাগত ৪৫ মাইল উঠিতে হইতেছে, কোনস্থানে রাস্তা বৃষ্টির জলে ধুইয়া ও পথিকের ক্রমাগত চরণ-ঘর্ষণে ক্ষয় পাইয়া পিছল, হড়া-গড়া ও দাগমাত্র-শেষ হইয়াছে! তাহা দিয়া উঠিতে প্রতিপদে পদস্খলনের সম্ভাবনা হইতেছে; পদস্খলন হইলে গড়াইতে গড়াইতে ২।৪ মাইল নিম্নে পড়িয়া চূর্ণ অস্থিমাত্র বা মাংসপিণ্ড আকারে পরিণত হইতে হইবে, প্রতিপদেই

সেই ভয় হইতেছে; হাতের লাঠি, হাতের ছাতিও বিষম বিঘ্ন-স্বরূপ মনে হইতেছে, পায়ের জুতা ছাড়িতে হইয়াছে। পথমাত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে, অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইলে অতল-স্পর্শ খাত চক্ষে পড়িবে ও মাথা ঘুরিয়া যাইবে। সঙ্গীর সঙ্গে কথা কহিবার যো নাই, একটু অসাবধান, অন্যমনস্ক হইলেই সর্ব্বনাশ! প্রত্যেক পদক্ষেপ সাবধানে সতর্কে করিতে হইতেছে, তাহাতেও কি পা স্থির করিয়া ফেলা যাইতেছে? যেখানে নিতান্ত হুড়া-গড়া, সেখানে চক্ষুঃ স্থির হইয়া যাইতেছে, ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া থাকিতে হইতেছে; অজ্ঞাতে মুখে হায় হায় শব্দ ও চক্ষে জল বাহির হইতেছে, আর আমাদের বোঝাওয়ালা ব্রাহ্মণজাতীয় হইলেও তাহার উদ্দেশে কটুবাক্য ও কুবাক্য নির্গত হইতেছে। সে আপন বোঝা বহনের ক্লেশ কমাইবার জন্যই নিশ্চয় আমাদিগকে এ কুপথে আনিয়াছে, কিন্তু গালিতে ত তাহার পরিশোধ হয় না! এখন অন্য উপায়ও আর নাই, কেননা এখন ফিরিতে হইলে, যতটুকু এইরূপে আসা গিয়াছে, সেইরূপেই ত ততখানি পথ ফিরিতে হইবে! সুতরাং মরিয়াছি, না মরিতে বসিয়াছি! এইরূপে প্রতিপদে প্রাণসংশয়শঙ্কা স্বীকার করিয়া চড়াই পথ ভাঙ্গিতে হইল! আপন বুদ্ধির দোষে এই বিপদ ঘটাইয়াছি, ঈশ্বরের অকৃপা কোন্ মুখে বলিব? বরং তাঁহারই ভরসাতে দেহ জীবন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইল। অতঃপর, আমার এই স্থলের এই দিনের দিন-লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—"আমি সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি—যদি আমি সশরীরে ফিরিতে পারি, অবশ্য আমার এ উপদেশ-দানের সার্থকতা হইবে; উপদেশ এই যে, কেহ কাহারও কথায় কখনও যেন এরূপ দীর্ঘ পাকদাণ্ডিপথে অগ্রসর না হন, কেহ যেন আত্মীয় স্বজন লইয়াও এ পথে না আসেন। আসিলে তিনি আপনাকেও যেমন, তাঁহাদিগকেও তেমনি বিপন্ন করিবেন। আবারও বলি, পাকদাণ্ডিপথের সুবিধার

কথায় কেহ যেন প্রলোভিত না হয়েন, জীবনকে এখন-তখনের ভীষণ সংশয়-পথে ফেলিয়া সুবিধা অসুবিধার গণনা কি? অধিক কি, এ পথে এক জন যাত্রী সঙ্গী মিলে না যে, তেমন দুর্ঘটনা ঘটিলে, সে অন্তিন-যাত্রার সময় একজন সমধর্ম্মী তীর্থযাত্রীয় মুখ দেখিয়া বা তাহার জ্ঞাতসারে প্রাণত্যাগ ঘটে।" বাস্তবিক এ পথ এমনই ভয়ঙ্কর বটে। এ পথের আর এক গুণ, ৫।৭ মাইল পথের মধ্যেও হয়ত জলের উপায় নাই। তখন তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায়, পদদ্বয় আরও যেন ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া যায়, ইচ্ছামত ঠিক্ হইয়া পা পড়ে না। আবার যেমন চড়াই অবস্থায়, উতরাই অবস্থাতেও ঐরূপ বিপদ্; কারণ পথ একই-রূপ, এবং সময়ে সময়ে ঐ উতরাই এমন দীর্ঘ যে ৩।৪ মাইল ক্রমাগত নামিতেছি, অথচ উতরাই ফুরায় না, যেমন ক্লান্তি তেমনি পিপাসা, তেমনি প্রতিপদে পদস্খলন হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অতলস্পর্শখাদে গড়াইয়া পড়িয়া ভবলীলা-সমাপ্তির সম্ভাবনা। ফলতঃ এ পথের ভীষণতার কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এই সঙ্কীর্ণ ও সংশয়কর সঙ্কটপথের মধ্যেও সময়ে সময়ে এক-আধটু প্রশস্ত স্থান পাওয়া যায়। তখন বোধ হয়, যেন জীবন পাইলাম! মনে হয়, স্থিরপদে একটু দাঁড়াই, সঙ্গীদিগের মুখ একবার দেখিয়া লই! আবার কোথাও বা হঠাৎ একটা ঝরণাও পাওয়া যায়। তখন ঈশ্বরের সুব্যক্ত গভীর করুণা দেখিয়া ঝরণার ন্যায় চক্ষেও জল ঝরিতে থাকে। আমার ঠিক্ এই অবস্থাই হইয়াছে। কিন্তু বিপদেও সুখের স্মৃতি হয়, আর ঠিক্ তেমনিটী দেখিলে স্মরণই বা না হইবে কেন? তাই এ অবস্থায়ও কবি রঙ্গলালের কবিতা মনে পড়িয়াছে—

কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে,
শিখরীর শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে,
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার,
ঝলমল ভানু-করে করে অনিবার!

ভরসা করি, কবি এমন বিপদে পড়েন নাই। কিন্তু এমন বিপদে পড়িয়াও সুখী হওয়া যায় এমন দুই চারিটী কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন!

---o---
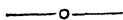
মড়ার গ্রাম।

ভিজিতে ভিজিতে বহুকষ্টে আমরা একটী গ্রাম পাইলাম। গ্রাম পাইলাম, কিন্তু আশ্রয় পাইলাম না। গ্রামের লোকে সেই প্রাতঃকালের অজস্র বৃষ্টির দিনে, সকলেই আপন আপন ঘরের বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, গল্প করিতেছে, তামাক খাইতেছে। আমাদের দুঃখ কেহ দেখিল না ও বুঝিল না; কেহ আমাদের আশ্রয় দিতে সম্মত হইল না। অন্য সময় হইলে আমি মানুষের এরূপ আচরণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম বা যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া উঠিতাম, কিন্তু এ বিব্রত অবস্থায় সেরূপ কোন ভাবের উদয় হইল না; ধীরে ধীরে সকলে মিলিয়া ১টা ঘরের ছাঁচের নীচে দাঁড়াইলাম, কতক বৃষ্টি রক্ষা হইতে লাগিল। কিন্তু ঐরূপে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায়? বিশেষতঃ ক্ষুধায় শরীর অত্যন্ত কাতর, তাহার একটা উপায় চাই। এইরূপ ভাব্যভাবনার সময় একটী সুন্দর টুক্‌টুকে, ঘাঘরা-পরা, হাস্যমুখী বালিকা নামিয়া আসিয়া তাহাদের ঘরের পিঁড়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, তোমরা ঐখানে ব'স। আমরা ভয়ে-ভয়ে সেইখানে গিয়া বসিলাম। কিন্তু অনধিকারে, শুদ্ধ ১টী ছোট বালিকার কথায় আসন গাড়িয়া ঐরূপ পাকা হইয়া বসা ভাল নয় বিবেচনায় সঙ্গী বালার পরামর্শে চৌধুরী বা গ্রামের মণ্ডল যে বারান্দায় বসিয়াছিল, তাহার নিকটস্থ হইয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিলে চৌধুরী বহু বিরক্তির সহিত থাকিতে সম্মতি প্রকাশ করিল। শুনিলাম, চৌধুরীর সম্মতি ভিন্ন, ইচ্ছা হইলেও কাহার আশ্রয় দিবার অধিকার নাই।

যাহাহউক, আমরা অনুমতি পাওয়ার পর পূর্ব্বোক্ত পিঁড়া হইতে অদূরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র কুঠুরিই আশ্রয়ার্থ পাইলাম। সেটী ক্ষুদ্র দোতালার কাঠের কুঠুরি, কুঠুরির মধ্যে আগুন জ্বালিবার ও পাক করিবার উপযুক্ত কয়েকখানা পাথর বসান আছে। সদ্যঃ আগুন জ্বালিবার উপায় না হওয়ায় ক্ষুধাশান্তির দিকেই প্রথমতঃ মনোনিবেশ হইল। শিঙ্গাড়া বা পানিফলের পালো যাহা কিঞ্চিৎ সঙ্গে ছিল তাহার সঙ্গে ঘি ও চিনি মিশাইয়া তদ্দ্বারা কিছু জলযোগ করা হইল। পৃথিবী এতক্ষণ আমাদের চক্ষের উপর নিতান্তই ঘুরিতেছিল, এখন একটু শান্ত হইল। তৎপরে ক্রমে পাকের আয়োজন।

কিন্তু কষ্টের দিনে একবারে সব সুবিধা হইয়া উঠে না। পাকের জন্য কাঠ যাহা পাওয়া গেল, তাহা প্রায় ভিজা। সে ভিজা কাঠের ধূম, দিনান্তের আহার বলিয়াই কষ্টে সহ্য হইল। কিন্তু জল আনা আরও কষ্টকর হইল। কেননা গ্রামখানি খুব উঁচুর উপর বলিয়া তাহার পথও সেইরূপ উঁচু। সেই উঁচু পথ দিয়া ঝরণায় যাইতে হইবে। ঝরণাও আবার একটু দূর এবং ঝরণার পথও সেই উঁচু দিয়া কিছুদূর গিয়া পরে ঢালু। ইহাতেও তত ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বৃষ্টির জলে সেই উঁচু ও ঢালু পথ আজ অত্যন্ত পিছল হইয়াছে। এ পথে জল লইয়া বারবার যাতায়াত কি কষ্টকর ও ভয়ঙ্কর! জল আনিবার জন্য অন্য দিনের মত বালাকে বলা গেল, বালা আজ অস্বীকার। পাহাড়ীলোকের চক্ষুলজ্জা বা সমবেদনা খুব কম, সময় বুঝিয়া ক্রমেই সে নিজমূর্ত্তি ধরিতেছে। পাহাড়ী বলিয়াও বটে, আর তা ছাড়া নূতন চাকর বা নূতন ঘোড়া ঐরূপ-প্রকৃতিরই হইয়া থাকে। মালিকের চালানো দেখিয়া প্রথমে তাহারা মালিককে বুঝিয়া লয়, পরে যথাসম্ভব আপন চালে চলিতে থাকে। তা কি করা যাইবে, আপনাদেরই সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইল। অপরাহ্ণে কোনরূপে আমাদের সিদ্ধপক্ক ভোজন সমাপন হইল।

চিরকালই ভোজন করা যাইতেছে, কিন্তু সেই নিত্য ভোজনের মধ্যে মনে করিয়া রাখার মত কথা অতি কমই থাকে। অদ্যকার ভোজনের কথা মনে করিয়া রাখার মত বা মনে থাকার মত বলিয়া তাহা এমন করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। আর এই মরাড় গ্রামের রাজপুত অধিবাসী-দিগের ব্যবহারের কথাও বহুদিন মনে থাকার কথা বটে। তাহাও যদি না থাকে, কিন্তু এই বালিকা কন্যাটীর সদয় ব্যবহারের কথা কি বহুদিন মনে থাকিবে না? নিশ্চয়ই থাকিবে। নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা দয়ার প্রভাব যে অনেক বেশি। আমরা সেই করুণাময়ী বালিকাটীর প্রার্থনামত আগেই তাহাকে ১টী গুটী সূতা, ২টী ছুঁচ ও দুটী পয়সা "দচ্ছিণা" দিয়াছিলাম। পরে গ্রামবাসীদিগের অসদ্‌ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, আগন্তুক লোক কোনরূপ অসুখ বিসুখ দিয়া যাইবে বলিয়া তাহারা নীচের আগন্তুকদিগকে জায়গা দেয় না। কদাচিৎ জায়গা দেওয়ার জন্য গ্রামে যদি কোন পীড়া দেখা যায়, গ্রামের মণ্ডল তাহার জন্য দায়ী। বাস্তবিক নীচের লোকের শরীর সেইরূপ নানা ব্যাধির মন্দিরই বটে। তথাপি ততটা রুক্ষতা ভাল নহে। যাহা হউক অন্ন বিষয়ে তাহারা কোনরূপ রূঢ়তা প্রকাশ করে নাই, ঘরে আশ্রয় দিয়া ঘরের ভাড়াও লয় নাই। ৵০ আনায় ।১ সের খাঁটী দুগ্ধও মিলিয়াছিল।

———o———
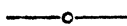
সুদিন।

১০ই বৈশাখ, প্রভাত।

অদ্য আকাশ পরিষ্কার, হাস্যমুখে দিনের প্রারম্ভ দেখা দিল। এই দিনের জন্য, এমনি একটি আশ্রয়ের জন্য, কা'ল কত কষ্ট গিয়াছে। তাই এ দিনকে সহসা ছাড়িয়া দিলাম না, স্নানাহ্নিক সারিয়া লইলাম। চেষ্টা

করায় একটী বালক /০ আনায় /॥ আধ সের দুধ আনিয়া দিল। কিছু জলযোগ করিয়া আমরা এখান হইতে রওনা হইলাম।

অদ্য চড়াই কম, উতরাই খুব বেশী অর্থাৎ ৪ মাইল। কিছুদূর উঠিয়াই সরস-মৃত্তিকাময়, সমতলপ্রায় একটা স্থানে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, চন্দ্রমল্লিকার মত হরিদ্রাবর্ণ, অসংখ্য ছোট ছোট ফুল মাটিকে ফুটিয়া স্থানটীকে আলো করিয়া রাখিয়াছে। ফুলগুলি যথার্থই মাটী ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের গাছ দেখিতে পাইলাম না। সেস্থান ছাড়াইয়া আরও দুই পা উঠিয়াই তৃতীয়া শ্রীমতী আনন্দ ভরে আমাকে বলিয়া উঠিলেন, ঐ দেখুন সম্মুখে পর্ব্বত-শ্রেণীর মাথায় সাদা সাদা মেঘের মত বরফ দেখা যাইতেছে। আমি দেখিয়াই হঠাৎ আনন্দে অধীর হইলাম, ভাবিলাম, তাইত, ঠিক্ বরফই ত বটে! কিন্তু ঠিক্ বিশ্বাসও হইল না। মনে মনে কহিলাম পর্ব্বত-শৃঙ্গে বরফ, সে একটা আশ্চর্য্য বস্তু, এতদিন দেখা যায় নাই, আজ হঠাৎই দেখা যাইবে? নিশ্চয় করিবার জন্য আমাদের বোঝাওয়ালা বালাকে জিজ্ঞাসিলাম, ঐ পর্ব্বতের মাথায় যাহা দেখা যাইতেছে, ঐগুলি সাদা মেঘ, না বরফ? বালা কহিল, ঐ সমস্ত বরফই বটে। তৃতীয়া সহযাত্রী কহিলেন, দেখিতেছেন না, যে গুলি সাদায়-কালোয়, সেগুলির কতক বরফ গলিয়া পর্ব্বতের কালো রং বাহির হইতেছে, কতক বরফে ঢাকাই আছে। নীচে গাঢ় নীলবর্ণ বরফশূন্য পাহাড়, আর বরফের উপর সাদা মেঘগুলি স্পষ্ট মেঘ বলিয়াইত বোধ হইতেছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? আমি দেখিলাম কথাগুলি সবই সত্য। বরফাবৃত পর্ব্বত শৃঙ্গ এই প্রথম আমি দেখিলাম। শুধু আমি কেন, এই প্রথম আমরা ৪ জনেই দেখিলাম। পুস্তকে চিরকাল পড়িয়া আসিতেছি "চির-হিমানী-মণ্ডিত হিমাদ্রি-শৃঙ্গ," আজি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। কাজেই এ দেখার এত আদর ও আনন্দ! আর পাছে তাহা মিথ্যা হয় তাই এত

সংশয়াকুলতা। তারপর আমাদের ভারবাহী বালা আরও একটু আনন্দের সংবাদ দিল; সে উহার মধ্যে ১টী স্থান অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া কহিল, ঐ উচ্চ মন্দিরাকার শুভ্র শৃঙ্গটী গঙ্গোত্তরীর, তাহার বামে ঐ যমুনোত্তরী, আর গঙ্গোত্তরীর দক্ষিণধারে ঐ কেদারনাথ! জানি-না জানি, তাহার কথা ঠিক্ হউক না হউক, কথাটা শুনিয়া আনন্দ ও কৌতুক আরও বাড়িয়া গেল। আমাদের গন্তব্য স্থান, আমাদের লক্ষ্যস্থল, যতদূর হউক, যত উৎকট হউক, আজি ত আভাসে দেখিয়া তাহার নিশ্চয় পাইলাম! আর কি, আমাদের কষ্ট সার্থক! যত কষ্ট করিয়াছি, আরও যত কষ্ট পাইব সবই সার্থক! তখন সম্মুখস্থ ঝাউগাছের সারির মধ্য দিয়া বরফাবৃত তুঙ্গ শৃঙ্গ শ্রেণী ও তন্মধ্যস্থ গঙ্গোত্তরীর প্রতি পুনঃ পুনঃ সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। অত্যুচ্চ ঝাউগাছগুলি বায়ুবেগে অনবরত সোঁ সোঁ শব্দ করিতেছে, তুষারস্পর্শী বায়ুপ্রবাহে শরীর শীতল হইয়া যাইতেছে, অত্যুচ্চ হিমালয়ের প্রাচীর তুষারশুভ্র মস্তকে দূর সম্মুখ ভাগ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর সেই হিমস্পর্শী বায়ুপ্রবাহ আজি সাক্ষাৎ উপভোগ করিতেছি, কি আনন্দ! আজি মহাকবি কালিদাসের হিমালয়-বর্ণনা স্মৃতি-পথে উদিত হইল—

ভাগীরথীনির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ রাসেব্যতে ভিন্ন-শিখণ্ডিবর্হঃ॥

আমরা এখনও ভাগীরথীর ধারের রাস্তায় পড়ি নাই, আর কিছু দূর যাইলেই তাহা পাইব। মহাকবির লিখিত দেবদারুও পাই নাই, গাছ গুলি ঝাউ বলিয়া লিখিয়াছি, ঠিক্ তাহাও নহে। ঝাউগাছের মত আকার বটে, পাতা নাই, বোঁটাই পাতার স্থানীয়, সর্ব্বোচ্চভাগে যেন এক একটী যোল-ডাল ঝাড় সাজাইয়া দিয়াছে! গাছতলায় যে ফলগুলি পড়িয়া আছে, তাহা আনারসের মত, মুকুলগুলি কণ্টকিত, যেন কতকগুলি হরিতবর্ণ স্থঁচ দিয়া সাজানো। ঝাউ হউক, না হউক, গাছগুলির

শঙ্কু ঝাউগাছের মত, আর উচ্চতা ঝাউ বা দেবদারুর মত। অসংখ্য ঐরূপ ঝাউগাছের সারি চলিয়াছে, আর আমরা তাহা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। আর আজিকার উতরাইও অন্য দিনের তুলনায় অনেকাংশে কম কষ্টকর, আজ কিছু-কিছু দেখিবার অবকাশ পাওয়া যাইতেছে ও দেখিবার জিনিষও অনেকটা আছে। সুতরাং আজি অপেক্ষাকৃত আনন্দের দিন বলিয়াই আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম।

কিন্তু খাঁটি আনন্দের দিন সংসারে বড় দুর্লভ। আজিকার দিনেও আমাদের বড় একটা অসুখের কারণ ঘটিয়া পড়িল। এই সময় আমাদের সহযাত্রী তৃতীয়া শ্রীমতীর হঠাৎ প্রবলজ্বর, শিরঃপীড়া ও সঙ্গে সঙ্গে অদম্য পিপাসা উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই অনভ্যস্ত অতিরিক্ত পথশ্রমে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছিল, তাহার উপর গতকল্য বৃষ্টিতে ভিজিয়া সমস্ত পথ অতিক্রম করিতে হওয়ায় যে প্রবল জ্বর আক্রমণ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? জ্বরের কষ্ট অপেক্ষা পিপাসার কষ্ট আরও বেশি বোধ হইতে লাগিল। শীঘ্র জল পাওয়া যাইবে বলিয়া আমরা জ্বরের জন্য বিশ্রাম করিতে না দিয়া আশ্বাস দিতে দিতে শীঘ্র শীঘ্র অবতরণই করিতে লাগিলাম। বহুদূর নামা হইল, কিন্তু জল আর পাওয়া যায় না। নিকটে ঝরণা দেখিলাম না। বায়ু-প্রবাহে আন্দোলিত ঝাউ-গাছের অবিরাম শব্দে ঝরণার কলকল শব্দের ভ্রম হইতে লাগিল। জ্বরের তৃষ্ণা আশ্বাসের অতীত হইয়া পড়িল। তথাপি উপায়ান্তর নাই বলিয়া রোগিণীকে লইয়া কষ্টে অবতরণ করিতেই লাগিলাম! উতরাইও কি কিছুতেই ফুরায় না! উতরাইএর পথে কত কি দেখিতে পাইলাম। পথের সম্মুখবর্ত্তী ও পার্শ্ববর্ত্তী সারি সারি শত শত রেখাঙ্কিত পর্ব্বত গাত্রের কি সুন্দর দৃশ্য! পাহাড়ীদিগের সোপানক্রমে প্রস্তুত অতি স্বল্পপরিসর শস্যক্ষেত্রগুলির কি বিচিত্র কান্তি! কিন্তু কিছুই আমাদের উদাস দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারিল না। পিপাসার ব্যাকুলতায় আমাদের দৃষ্টি

কেবল জলের দিকেই নিবিষ্ট। দূর হইতে সর্ব্বনিম্নে নদীগর্ভ দেখিতে পাইলাম, তাহা কতক আসন্ন বোধ হইল ও আসন্নবোধে কত আশাজনক হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছি না, উতরাই কিছুতেই শেষ হইতেছে না। এমন কি প্রস্রবণের কলকল শব্দ স্পষ্ট কর্ণগোচর হইতেছে তথাপি এ পথ ফুরায় না। বহু আশা-নৈরাশ্যের পর একটা লোক ধর্ম্মশালার পথ দেখাইয়া দিল। পথটা প্রদক্ষিণের মত বহু ঘুরিতে ঘুরিতে ধর্ম্মশালায় গিয়া পঁহুছিল। বোম্বাই প্রদেশের মহাত্মা গোকুলদাস-রামদাস নামক ধনী এখানে এই ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মশালার নিকটেই ১টী নির্ম্মলধার নির্ঝর। নির্ঝর পাইয়া আমাদের রোগিণী ত বটেই, তার সঙ্গে আমরাও যেন প্রাণ পাইলাম।

লালুরি-ধর্ম্মশালা।
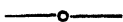
পাহাড়ী পল্লীর মধ্যে যত ধর্ম্মশালা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এটী একটী মনোরম ধর্ম্মশালা। এটী বেশ উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত, অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গোময় লেপনে মেঝেটী ৮ দিন অন্তর শোধিত হইয়া থাকে। ঘরটী ঐরূপে পরিষ্কার রাখা, যাত্রীদিগের তত্ত্বাবধান করা, যাত্রীদের বাসন না থাকিলে মালিক স্বনামাঙ্কিত করিয়া যে বাসনগুলি দিয়াছেন, তাহা যাত্রীদিগকে দেওয়া, এই সকল কাজের জন্ত মালিকের মাসিক বেতন দানে দেবদত্ত নামক একজন ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছে। দেবদত্ত অতি ভদ্রতা ও মনোযোগের সহিত এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে দেখিলাম। ব্রাহ্মণ বলিয়া রাজা সাহেব (টিহরীর মহারাজ) তাহার বাস্তর খাজনা গ্রহণ করেন না, তাহার যে একটু "ক্ষেতি" আছে, তাহারই ৭৲ টাকা করিয়া খাজনা তাহাকে দিতে হয়। "ক্ষেতি"র জন্ত তাহার কয়েকটী গরু মহিষও আছে, তা ছাড়া মুদিখানার দোকানও ১ খানি আছে। গরু

মহিষের গোহাল ও দোকান সবই তাহার বাড়ীতে এবং সবই ধর্ম্ম-শালার সংলগ্ন। ধর্ম্মশালার নিম্নেই তাহার ক্ষেত। সুতরাং একরূপ বাড়ীতে বসিয়াই দেবদত্তের সকল কার্য্য চলে। শস্য ক্ষেত্রে গরু মহিষ লাগিলে বাড়ী হইতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং শস্য রক্ষার বেশ সুবিধা আছে। আর নিকটেই নির্ঝর থাকায় ক্ষেত্রে শস্যই বা কি সুন্দর হইয়াছে! আমরা ধর্ম্মশালা হইতে গভীর নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, ঐ শস্যক্ষেত্র স্নিগ্ধহরিতবর্ণময় ১ খানি বিশাল আসনের ন্যায় আমাদের চক্ষু শীতল করিতে লাগিল। শস্য রক্ষার সুবিধার কথা যেরূপ বলিয়াছি ধর্ম্মশালার যাত্রীদিগের জন্য তাহার দোকানের কার্য্যেও তেমনি সুবিধা দেখিলাম। আরও এক সুবিধা এই যে নিজে এক কার্য্যে যাইলে স্ত্রী-পুত্রেরা অন্য কার্য্যে হাত দেয়, এইরূপে তাহার কোন কার্য্যেরই ক্ষতি হয় না। ফলতঃ নানাপ্রকারে দেবদত্তকে আমরা বেশ সুখীই বিবেচনা করিলাম। দেবদত্ত সপরিবারে যেমন সুখে আছে, যাত্রীরাও তাহাদের নিকট আসিয়া তেমনি সুখী হইতেছে। আমরা ত দেবদত্তের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদির সরল ও সদয় ব্যবহারে নিতান্ত আপ্যায়িত হইলাম। তাহারা কাজের লোক হইলেও অবসর করিয়া কতবার আসিয়া আমাদের খোঁজ-খবর লইল, কতবার কতকথা জিজ্ঞাসাবাদ করিল। আলুর জন্য জানাইলাম, তখনি একজন ক্ষেত হইতে /১ সের আলু তুলিয়া আনিয়া দিল। দুগ্ধের দরকার, অবিলম্বে দুগ্ধ /১ সের দুহিয়া দিল। আলুর সের ৵০ আনা ও দুগ্ধের সের ৵০ আনা লইল। তা সেই জনমানব-শূন্য, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত-শূন্য পর্ব্বতময় রাজ্যে ইহা মন্দ কি? ফলতঃ একদেবীর স্থানে দুইটাই যেমন অসুস্থা হইলেন, আশ্রয়টী তেমনি ভালই পাওয়া গেল।

দেখিলাম, পথবাহী বহুলোক এখানে আশ্রয় লইয়া থাকে। আমাদের পাকের সময় গড়োয়ালবাসী একদল বণিক্ ১ পাল ছাগের পৃষ্ঠে পণ্যের বোঝা চাপাইয়া ২ জন রাখাল সহ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বলদের পিঠে যেমন দুই ধারে ছালা চাপাইয়া রাঢ়দেশের লোকে নিকটবর্ত্তী নানাস্থানে চাউল বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, এ সব অঞ্চলে পার্ব্বত্যপথে তেমনি ছাগলের পিঠে দুইদিকে বালিশের খোলের মত ছোট ছোট থলিয়া চাপাইয়া মাল আমদানি রপ্তানি করে। এক একটা ছাগ।৹ সের।২ সের পর্য্যন্ত বোঝা লয়। রাখাল দুইজন এই ছাগলের পালের পিঠ হইতে বোঝা নামাইয়া লইয়া পাহাড়ের উপর তাহাদিগকে চরাইতে গেল। বণিকেরা ডাল রুটী পাকাইতে মনোনিবেশ করিল। এই সময়ে আরও একদল পথিক উপস্থিত হইল। এই দলে ৮ জন লোক ছিল। ইহারা পঞ্চকোটের রাজা-বাহাদুরের জন্য গঙ্গোত্তরীর জল লইয়া বৈদ্যনাথে চড়াইতে গিয়াছিল।

এ দিকে আমি আপন দলের পীড়ার খোঁজখবর লইতে লইতে জানিতে পারিলাম যে তৃতীয়া শ্রীমতীর জ্বরের সহিত রক্ত আমাশয়ও দেখা দিয়াছে। শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম। এই রোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে মারাত্মকও হইয়া থাকে। পাহাড়ের পথে এই সকল পীড়া হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, ইহা পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া আমাদের দূরদর্শী চিকিৎসক-শিরোমণি শ্যামাদাস ভায়া অজীর্ণজাতীয় রোগ-সমূহের নানা ঔষধ আমাকে দিয়াছিলেন। অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নামক ঔষধ উক্ত পীড়িতা শ্রীমতীর জন্য ব্যবস্থা করিলাম।

সন্ধ্যার সময় রাখাল দুইজন ছাগের পাল চরাইয়া আসিয়া দেবদত্তের দত্ত ১টা ঘরে পুরিয়া রাখিল। আর আমরা সকলে সেই ধর্ম্মশালা পরিপূর্ণ করিয়া বসিলাম। বহুপথিকের সমাগমে ধর্ম্মশালা আজি সবিশেষ গুলজার। সপরিবার দেবদত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সকলের প্রয়োজন পূরণ করিতে লাগিল। সকলের ভোজন সম্পন্ন হইলে তাহার ছুটি হইল।

ভোজনান্তে ভয়ানক শীত বোধ হইতে লাগিল। অবশ্য যত অগ্রসর হইতেছি, শীত ক্রমে বেশি হওয়ারই কথা, কিন্তু এত বেশি হইবার আরও একটু কারণ ছিল। ধর্ম্মশালাটীর একদিকে মাত্র পাহাড় আবরণ স্বরূপ হইয়া আছে, অন্য ৩ দিক একবারে খোলা। তথাপি তেমন প্রান্তরের মধ্যে নহে, ইহাও ভাগ্য। সঙ্গের শীতবস্ত্রেই একরূপ রক্ষা হইল। সুরেশ বাবাজী আমাকে আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ আবরণকারী যে ১টী খুব গরম পোষাক দিয়াছিলেন, যেটীকে অত্যন্ত ভারী, অপ্রয়োজনীয় ও বিজাতীয় বলিয়া এতকাল অবহেলা করিয়া আসিতেছিলাম, অদ্য তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া শীতে পরিত্রাণ পাইলাম। আর আর সকলেও আপন আপন কম্বলগুলি কতক বিছাইয়া কতক গায়ে দিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলেন। আমরাও শয়ন করিলাম, কিন্তু ততটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। আমাদের দেশের লোক, নিজের দ্রব্যাদি এরূপ ভাবে অজ্ঞাত বহু বিদেশী লোকের মধ্যে থাকিলে ঐ সকল দ্রব্য অনেকটা অরক্ষিত অবস্থাতেই রাখা হয় বোধ করিয়া, সেরূপ স্থানে কিছু অস্বচ্ছন্দ, কিছু সতর্ক ও সন্দিগ্ধ থাকাই যেন সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে করে। আমাদের দেশের স্বভাব যেরূপ হউক, সুখের বিষয়, পাহাড়ে আজিও ঐরূপ মনে করার কারণ উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক, শীতের প্রবল প্রতাপে আমাদের বেশিক্ষণ কিছু মনে করিতেও হইল না। সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া অবিলম্বে আমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। প্রত্যূষে জাগিয়া দেখি, আমরা ভিন্ন, সকলেই স্ব স্ব স্থান শূন্য করিয়া শেষ রাত্রিতেই চলিয়া গিয়াছে। আমাদের যেখানে যাহা ছিল, তাহা সেইরূপই আছে। ছাতা, জুতা, লাঠিগাছটি পর্য্যন্ত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

১১ই বৈশাখ।

অদ্য প্রভাতে আমাদের বড় তাড়াতাড়ি নাই। পাঠক বোধহয় বুঝিতে পারিতেছেন যে পীড়িতা সঙ্গিনীদের বিশ্রামের জন্য আজি এখান

হইতে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে বলিয়াই আমরা বিবেচনা করিয়াছি। সেই জন্ত সকল কার্য্যে আমাদিগের আজি কিছু শৈথিল্য বা ঔদাস্ত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ধর্ম্মশালার অদূর নিম্নেই ১টী স্থূলধার নির্ঝর আছে। ঝরণাটীর নীচে একটু সমতল স্থান থাকায় স্নানের বেশ সুবিধা হইল। ঝরনার সম্মুখে রাস্তার পার্শ্বে ডালিমের ফুলের মত কতকগুলি টুক্‌টুকে লাল ফুল ও অন্ত কয়েকটা গাছে গাছ-পরিপূর্ণ এক রকম শাদা ফুল ফুটিয়াছিল, পূজার জন্য তাহা কতকগুলি তুলিয়া আনিলাম। আসিয়া দেখিলাম, ঘরের মেজেটী গোময়-লিপ্ত, শুষ্ক ও সমতল ত আছেই, তবে কল্যকার যাত্রি-বাহুল্যে যাহা কিছু আবর্জ্জনাময় হইয়াছিল, দেবদত্ত-গৃহিণীর প্রাত্যহিক মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইয়া আবার তাহা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। আমরা আরও একটু মার্জ্জনা করিয়া লইয়া পুরু করিয়া তথায় পূজার আসন পাতিলাম। আসনের আমাদের অভাব নাই, সঙ্গে যে কম্বল-রাশি আছে, শয়ন, উপবেশন, আসন, আচ্ছাদন সকলকার্য্যেই সেগুলির বিনিয়োগ হইয়া থাকে। যাহাহউক, পার্ব্বত্য প্রদেশের সেই নিরাবিল-নির্জ্জনতায়, সেই নিত্য শুদ্ধ আসনে বসিয়া, পর্ব্বতের স্বভাবসৃষ্ট উপহার স্বরূপ সেই নির্ম্মল ফুল জলে বড় তৃপ্তি পূর্ব্বক আজি পূজা করা গেল।

ভোজনান্তে দেবদত্তকে কাণ্ডীর জন্ত বলিলাম। দেবদত্ত কহিল, উত্তর-কাশীর এক পাণ্ডাজী আমাকে কাণ্ডীর জন্ত বলিয়া গিয়াছেন, সে বোধ হয় আপনাদের জন্তই হইবে। তা আমি কাণ্ডীওয়ালা ১ জন বলিয়া রাখিয়াছি; আমি কহিলাম সে আমাদের জন্তই বটে। কিন্তু একজন নহে, দুইজনের দরকার। তুমি তাহার উপায় করিয়া দেও। দেবদত্ত কহিল দিতেছি। বলিয়া দুই জন কাণ্ডীওয়ালাকে ডাকিতে বলিয়া দিল।

আমি পাণ্ডাজীর পরোপকারিতার পরিচয়ে চমৎকৃত হইলাম। ভাবিলাম, ভবনেও তিনি নিশ্চয় চেষ্টা করিয়া ছিলেন। সেখানে সুবিধা

করিতে না পারিয়া এখানে বলিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক পাণ্ডারা যাত্রীদিগের নিকট অর্থগ্রহণ করেন, সত্য, কিন্তু তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিছু বিলম্বে দুইজন কাণ্ডীওয়ালা উপস্থিত হইল। দেবদত্ত ধরাসু-পর্য্যন্ত তাহাদের প্রত্যেকের ১॥০ টাকা করিয়া মজুরি চুক্তি করিয়া দিল।

পথের উৎপাত।

১২ই বৈশাখ।

অদ্য প্রভাতে কাণ্ডীওয়ালা আসিতে বিলম্ব হওয়ায় আমি বড়ই চিন্তিত হইলাম। কিন্তু পীড়িতা সঙ্গিনী দুইজনে কহিলেন, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমাদের জন্য কাণ্ডীর দরকার নাই। আমি কহিলাম, না, তাহা হইবে না, পীড়িত শরীরে এরূপ সাহস করিতে নাই। এ সকল স্থান সেরূপ নয়। কতকদূর যাইয়া আর চলিতে না পারিলে তথায় বিশ্রামের উপায় নাই। পাহাড়ী লোক নীচের লোককে জায়গা দিবে না। আর আজিকার চটীও ৭॥০ মাইলের উপরে, বালার মুখে শুনিতেছি। অতএব বিবেচনা করিয়া কাজ কর।

তৃতীয়া শ্রীমতী কহিলেন, আমার জন্যই ত বেশি ভাবনা, আমি সুস্থ হইয়াছি। কবিরাজী ঔষধে আমার রক্ত আমাশয় সারিয়াছে, জ্বরও বন্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়া কহিলেন, আমিও একরূপ হাঁটিতে পারিতেছি। কাণ্ডীতে আর প্রয়োজন নাই, ইচ্ছা করিয়া আমরা কাণ্ডীতে উঠিব না। অগত্যা আর বেলা না করিয়া সকলেই আমরা যথাপূর্ব্ব পদব্রজে রওনা হইলাম।

অদ্য চড়াই কম, উতরাই বেশি, এই এক ভরসা ছিল। কিন্তু যে কয় মাইল চড়াই, তাহাতেই বিষম কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। উঠিতে

উঠিতে এক একবার যেন ঊর্দ্ধশ্বাস উপস্থিত হয়। আবার সে সঙ্কীর্ণ সঙ্কট পথে দাঁড়াইতেও যেন গড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা হয়। তাহার উপর আজি আর এক বিপদ্ হঠাৎ উপস্থিত। সম্মুখে ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি দেবতার গতিক বড় খারাপ, মেঘের আড়ম্বর হইতেছে। আমরা অপেক্ষাকৃত ভাল স্থান পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলাম। তাড়াতাড়ি করিলে কি হয়? শীঘ্র তেমন স্থান পাইবার সম্ভাবনা কি? দেখিতে দেখিতে প্রবল বায়ু উপস্থিত হইল। আমরা যে যেখানে বসিয়া পড়িলাম। দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল। এক একটা ঝাপটায় পাহাড়ের উপর হইতে আমাদিগকে যেন ছুড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। আকস্মিক বিপদে, নিরাশ্রয়ে আমরা অজ্ঞানপ্রায় হইয়া প্রতিপদে যেন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম! মাথার উপর দিয়া মেঘমালা গর্জ্জন সহকারে উত্তীর্ণ হইতেছে, তাহার সহিত প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে কাণ বধির হইয়া যাইতেছে। আচ্ছন্ন মুদিত দৃষ্টি বাহিরে লুপ্ত হইয়া হৃদয়ের মধ্যে যেন উন্মীলিত ও জাগরিত হইল। তখন বাহ্যপ্রকৃতির বিষম লীলার ন্যায় অন্তঃকরণে জগন্মাতা পরমাপ্রকৃতিকেও যেন তেমনি লীলোন্মত্তা দেখিলাম! প্রাণভয়ে প্রাণের মধ্যে আকুল ক্রন্দনে ডাকিয়া কহিলাম,—

কালী কত নাচিছ রঙ্গে, রণরঙ্গিণি! যোগিনী সঙ্গে,
এলাইয়ে বেণী, কেশ কাদম্বিনী, ছড়ায়ে পড়েছে সকলি অঙ্গে!
পদ-ভরে ধরা করে টল-মল, উথলে জলধি, আকুল সকল,
সম্বর হরে চরণ-কমল, সংহর' ঘোর রণ-তরঙ্গে!
এমা, যুগে যুগে কত জাগিবে দানব, নিয়ত কি শিবে নাশিবে সে সব,
করে অসি, মুখে ভৈরব রব, রবে কি মা চির-সঙ্গে;
দেবে কবে দেবে চির-সুরধাম, সুর-সিদ্ধ সবে হবে সিদ্ধকাম,
নিজে নিত্য ধামে করিবে বিরাম, হেরিবে ভবে কৃপা-অপাঙ্গে! *

* এই গান খাম্বাজ—একতালায় গেয়।

মা যেন কাতর ক্রন্দন শুনিলেন! বাত্যার বেগ কিয়ৎ কাল প্রবল থাকিয়া ক্রমেই কমিতে আরম্ভ করিল, মেঘ সকল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যদিও বায়ু প্রবাহ বহুক্ষণ থাকিল, কিন্তু ক্রমেই বেগ খর্ব্ব বোধ হইতে লাগিল। বৃষ্টির আশঙ্কাও দুর হইল। কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্তপূর্ব্বে প্রতিপলে আমাদের জীবনে সংশয় উপস্থিত হইতেছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে আমারা প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম! এ নিরাশ্রয় সঙ্কটস্থানে শিলাবৃষ্টি হইলে তাহাতেই প্রাণ যাইতে পারিত! কিছু না হউক, উপস্থিত প্রবল ঝড়েই আর একটু হইলে, আমাদিগকে উড়াইয়া মৃত্যুর দ্বিতীয় মুখ-গহ্বরের ন্যায় অতলস্পর্শ খাতে নিক্ষেপ করিত! কিন্তু জগন্মাতার কৃপায় আমরা সকলেই অক্ষত-দেহ! কোথায় ঝড়, কোথায় অন্ধকার! মুহূর্ত্তমধ্যে সকল দুর হইল। অন্ধকার দুর হইয়া চারিদিক্ যেমন পরিষ্কার হইল, সঙ্গে সঙ্গে মনের অন্ধকারও যেন অনেকটা দূরগত হইল। কেননা, অন্যসময় মনে হয় না, এখন একবার স্পষ্ট মনে হইল—

"রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?"

—o—
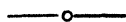
পথে বিবিধ দৃশ্য।

আমরা সম্ভাবিত অত্যাহিত-শঙ্কার নানা কথা কহিতে কহিতে, দেবতার অসীম করুণার কথা আলোচনা করিতে করিতে আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আজ অনেকটুকু পথ অতিক্রম করিতে হইবে, মধ্যপথে বিশ্রামের ত অবসর নাই। বিশেষতঃ যেরূপ বিপদ্ অতিক্রম করা গেল, তাহা স্মরণ করিয়া সামান্য পথশ্রমেও আজি আর আমরা কাতর নহি।

উপরি উপরি বিপৎপাতে ও পথের দুর্গমতায়, আমরা এ পথের অনেক রমণীয়তার কথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছি। ভীষণ ও রমণীয়

ভাব সর্ব্বত্রই আছে। ভাল মন্দ মিশ্রিত ছাড়া খাঁটি ভাল বা খাঁটি মন্দ কোথায়? এ কঠোর কর্কশ দেশেও তেমনি কোমলতা ও কমনীয়তাও আছে। এই পার্ব্বত্য পথেও পথের ধারে কত স্থানে কত সুন্দর সুন্দর ফুল দেখিয়াছি, তাহার সীমা নাই। ঠিক্ অশোক ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ পুষ্পস্তবক ফুটিয়া স্থানে স্থানে গাছ আলো করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু ঐ ফুল বাস্তবিক অশোক নহে। ডালিমের মত উজ্জল লাল ফুলের কথা একবার লিখিয়াছি, উহাও প্রকৃত ডালিম কিনা তাহাতে সন্দেহ! বিল্বপত্রের গাছ ত এ পথে কোথায় দেখিলাম না, কিন্তু বিল্বপত্রেরই মত ত্রিপত্রধারী বৃক্ষ অনেক দেখিলাম। * এই সকল পরস্পর-সদৃশ বস্তু সৃষ্টি করিয়া বিশ্বপ্রকৃতি কি আপন বিরাট ভাণ্ডারের বৈভব বৃদ্ধি করিয়াছেন, না পরম-পুরুষের নয়ন রঞ্জন করা তাঁহার অন্য উদ্দেশ্য? যাহা হউক পরম পুরুষের পরমাণু-প্রায় আভাস স্বরূপ কোটি কোটি জীব-সমূহ যে ইহাতে নিত্য বিমোহিত হইতেছে ও বিমোহিত হইয়া আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আবার পূর্ব্বে যেমন গন্ধহীন নানাপুষ্প নানাস্থানে রূপচ্ছটায় আলোকিত করিয়া আছে বলিলাম, কোন কোন পথ তেমনি সুগন্ধ পুষ্পের অপূর্ব্ব সুঘ্রাণে বহুদূর ব্যাপিয়া আমোদিত রহিয়াছে। কোনস্থানে যেমন তৃণলতাহীন, মনুষ্যের পদচিহ্ন-বর্জ্জিত অতি উচ্চ পার্ব্বত্য পথের কর্কশ দৃশ্য, তেমনি নিম্ন ভাগে কোথাও কোথাও সুন্দর ঝরণার নিকটে বহু লতা-পাতায় ঘেরা হরিত কুঞ্জবনের কমনীয় দৃশ্য! ঐ সকল স্থানে প্রস্রবণের স্বচ্ছ জলধারা দিবারাত্রি

* কাশীধাম হইতে আমাদিগের রওনার সময় ঐধামে নূতন প্রচারিত ত্রিশূল নামক ১ খানি সংবাদপত্রে কোন এক দেবী (নাম স্মরণ নাই) এ পথের বৃত্তান্ত বর্ণন উপলক্ষে এখানে বিল্বপত্রের অপ্রাপ্যতার জন্য যাত্রীদিগকে উহা সংগ্রহ করিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে আমরা সময়ে উহা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম। নতুবা মহা বিপদে পড়িতে হইত। তুলসীও এপথে ঐরূপ দুষ্প্রাপ্য।

অবিরাম কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, গ্রাম্যলোক প্রণালীপথে ঐ ধারা কত স্থানে কত শস্য ক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছে, কোথাও ঐ ধারার নির্গমস্থানে একটী বাঁশের নল লাগাইয়া রাখিয়াছে, ঐ নল বাহিয়া সেই স্ফটিকস্বচ্ছ শীতলধারা নিম্নে না পড়িতে পড়িতে পাহাড়ীরা নিজ নিজ জলপাত্র পূর্ণ করিয়া লইতেছে, হাত মুখ প্রক্ষালন করিতেছে, ইচ্ছামত স্নান-পান করিতেছে। আবার অনেক স্থানে পর্ব্বতের উচ্চদেশে ঐরূপ প্রস্রবণের অভাবে পথিকের কিরূপ পিপাসা-ক্লেশ হয়, পূর্ব্বে তাহার পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যথায় আমরা বিষম বাত্যায় বিপন্ন হইয়াছিলাম, পর্ব্বতের সেই উচ্চস্থানটী একবারে তৃণলতার আবরণ-শূন্য, বৃক্ষের আশ্রয়-শূন্য, যেন উৎকট মরুভূমি বিশেষ; আবার কোথাও ঐরূপ উচ্চদেশেই অত্যুচ্চ বৃক্ষশ্রেণী বহুদুর ব্যাপিয়া ঘনচ্ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে পাহাড়ী লোক ঐরূপ উচ্চ ২।১টা গাছ ভূপাতিত করিয়াছে। সেই ভূ-লুণ্ঠিত বিশাল বৃক্ষের, যুদ্ধ-হত মহান্ বীরের ন্যায় স্থির চক্ষে দর্শনীয় কি বিচিত্র দৃশ্য! কোন কোন সারবান্ বৃক্ষ কাটিতে না পারিয়া তাহার মূলে আগুন লাগাইয়া মূল দেশ অর্দ্ধদগ্ধ করিয়াছে। যে অত্যুচ্চ পর্ব্বত-পৃষ্ঠ লঙ্ঘন করিবার সময় বিহ্বলচিত্তে আমরা প্রমাদ গণিতেছি, হয় ত দলে দলে ছাগ সকল চরিতে চরিতে তথায় উঠিতেছে, ছাগশিশু ক্রীড়াচ্ছলে তাহার মাতার গাত্রে ধাক্কা দিয়া পথের নিম্ন গড়ানে স্ফূর্ত্তির সহিত অবতীর্ণ হইতেছে ও সেই সেই স্থলে যে ২।৪টা নূতন তৃণ গজাইয়াছে, আঁকিয়া বাঁকিয়া তাহা লোপ করিতে করিতে চলিয়াছে। কিরূপে তাহারা ভারকেন্দ্র ঠিক্ রাখিয়া ঐরূপ বিষম ও ক্রমনিম্ন স্থানে লম্ফে লম্ফে আরোহণ অবরোহণ করে, তাহা তাহারাই জানে। এ সকল দৃশ্য দেখিবার, অথচ বিহ্বল-চিত্তে আমরা দেখিয়াও দেখি নাই। এখন মনে করিয়া তাহা লিখিতেছি।

ভিন্ন ভিন্ন পথের কথা।

আর কিছুদূর চড়াইয়ের পর আমাদের কষ্টের অনেকটা অবসান বোধ হইল। ভাগীরথীর কিনারা দিয়া আমাদের রাস্তা আরম্ভ হইল। হঠাৎ আমরা উঁহাকে যে-সে একটা পার্ব্বত্য নদীই বিবেচনা করিয়াছিলাম। দেশের সে বিস্তৃত ভাগীরথী নহে যে দেখিয়াই চিনিতে পারিব। দুইধারে দুই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া স্বল্পকায়া হইয়া খরস্রোতে প্রবল কলরবে চলিয়াছেন, কিরূপে এ মুর্ত্তিতে তাঁহার সে মুর্ত্তির প্রত্যভিজ্ঞা হইবে? পাহাড়ী লোকের কথা-বিশ্বাসেই উহাকে ভাগীরথী বলিয়া মানিতে হইল। ভাগীরথীর স্নিগ্ধবায়ুহিল্লোলে শ্রান্ত ও উত্তপ্ত শরীর শীতল বোধ হইল। ক্রমে দুর্গম রাস্তার জন্য যে উৎকট কষ্ট ভোগ করিতেছিলাম, তাহারও অবসান হইয়া আসিল। ঝরণার উপর ১টী কাঠের সেতু ও প্রশস্ত রাস্তা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এতক্ষণে আমরা সড়ক রাস্তা পাইলাম, আমরা টিহরী রাজধানীর পথ দিয়া আসিলে বরাবর এই সড়ক রাস্তাতেই আসিতে পারিতাম। কিন্তু পথ-সঙ্ক্ষেপের প্রলোভনে, বুদ্ধিভ্রমে, পাকদাণ্ডির পথে গিয়া অনর্থক এতদিন প্রাণান্তকর কষ্টভোগ করিয়া আসিয়াছি। টিহরীর সড়ক পথ দিয়া বরাবর আসিলে অবশ্য আজি এখানে পহুঁছিতে পারিতাম না। কিন্তু ৪।৫ দিনের রাস্তার কমি-বেশিতে কি এমন ক্ষতি বৃদ্ধি হইত?

এস্থলে মসূরি হইতে সমধিক প্রচল সুগম রাস্তাটীর একটা সটীক তালিকা দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনায় আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মসূরি হইতে ২ মাইল জবর ক্ষেত। তথা হইতে ৩ মাইল সুবাকলী। এখানে ধর্ম্মশালা আছে। তথা হইতে ৯ মাইল ঝাল্‌কী ধর্ম্মশালা। ঝাল্‌কী হইতে ৮ মাইল ধনোটী ধর্ম্মশালা। তথা হইতে ৮ মাইল কানাতাল। কাণাতালে ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত উভয়ই আছে।

কাণাতাল হইতে ১ মাইলের পর দুইটী সড়ক বাহির হইয়াছে। এক সড়ক সিধা ভডলানা হইয়া উত্তর-কাশী ও তথা হইতে গঙ্গোত্তরী গিয়াছে। অপর সড়ক এথান হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী টিহরী রাজধানী হইয়া ঐ দুই তীর্থে গিয়াছে।

টিহরী রাজ্য বদরীনারায়ণেরই রাজগদী বলিয়া মানিত হয় এবং ঐ গদীর মালিক বলিয়া টিহরী-নরেশও সেইরূপ সম্মানিত হইয়া থাকেন। যাত্রিগণ সেইজন্য ভক্তিপূর্ব্বক উক্ত মহারাজের দর্শনার্থ টিহরী রাজধানী হইয়াই উত্তর-কাশী গমন করেন। তদ্‌ভিন্ন, টিহরী পার্ব্বত্য-প্রদেশের মধ্যে একটী অতি মনোরম উত্তম নগর। গঙ্গা ও ভিলঙ্গনা নামে নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থানের উপর এই রমণীয় রাজধানী সন্নিবিষ্ট। ইহার দুই দিকে যেমন এই খরস্রোতা নদী-যুগল, অপর দিকে তেমনি অত্যুচ্চ পর্ব্বত ভৈরব-প্রহরীর মূর্ত্তিতে নিত্য দণ্ডায়মান। সুতরাং রমণীয় দৃশ্যের অনুরোধেও এ স্থান দর্শনীয় বটে। টিহরী হইতে গঙ্গার ধারে ধারে সড়ক রাস্তা উত্তরকাশী পর্য্যন্ত ৪০ মাইল হইবে।

টিহরী রাজধানী দিয়া না যাইলে, পূর্ব্বে কাণাতাল হইতে ১ মাইলের পর যে স্থানে দুইটী সড়ক বাহির হওয়ার কথা লিখিয়াছি, ঐ স্থান হইতে ৮ মাইল দূরে ভডলানা নামক পূর্ব্বোক্ত স্থান পাওয়া যায়। ভডলানায় ধর্ম্মশালা আছে ও গঙ্গা এথানে আসিয়া মিলিয়াছেন।

এথান হইতে নগুণ-ধর্ম্মশালা ৯ মাইল। নগুণ হইতে ৫ মাইল যাইলেই ধরাসুর প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশালায় পঁহুছান যায়।

এই সকল সড়ক রাস্তা ও রাস্তার মধ্যে পুল প্রভৃতি টিহরী-মহারাজের অধিকারস্থ বলিয়া তিনিই ঐগুলি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন ও যথন প্রয়োজন হইতেছে, সংস্কার করিয়া দিতেছেন। টিহরী এখন গড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী বলিয়া টিহরীর মহারাজ বলিয়াই তিনি বিখ্যাত। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমান্ কীর্ত্তিশাহ বাহাদুর ধার্ম্মিক, শিক্ষিত ও মহাত্মা

ব্যক্তি। ইনি ইংরেজ-রাজের মিত্ররাজা। নেপাল-মহারাজের কবল হইতে ইঁহার গড়োয়াল রাজ্য ইংরাজরাজ উদ্ধার করিয়া দেওয়ায় তাঁহার সহিত ইঁহার এই মিত্রতা। উক্ত উপকারের প্রতিদান স্বরূপ ইনি নিজ গড়োয়াল রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ইংরেজ-রাজকে দিয়াছেন। তৎসূত্রে ইঁহাদের পূর্ব্বরাজধানী শ্রীনগর প্রভৃতি অলকনন্দার পূর্ব্বপার ও বদরিকাশ্রম প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এবং মসূরী ও ল্যাণ্ডরের ন্যায় শ্রেষ্ঠ শৈলনিবাস ব্রিটিশ গড়োয়াল নামে ইংরেজ অধিকারে আসিয়াছে। উত্তর-কাশী, কেদারনাথ, গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী প্রভৃতি স্বাধীন গড়োয়ালের অন্তর্গত বলিয়া পুণ্যব্রত মহারাজ শ্রীমান্ কীর্ত্তিশাহ বাহাদুর ঐ সকল তীর্থে যাত্রার পথ যথাসাধ্য সুগম করিয়া দিয়াছেন। উত্তরাখণ্ডের অধিকাংশ পবিত্র তীর্থভূমি আজিও তাঁহার ন্যায় একজন ধর্ম্মাত্মা হিন্দুরাজার অধিকারে আছে ইহা আমরা পরমভাগ্য বলিয়া মনে করি। বদরিকাশ্রম ইংরেজ অধিকারভুক্ত হইলেও নারায়ণের সেবাদি সমস্ত বন্দোবস্ত টিহরী-নরেশের কর্ত্তৃত্বাধীন আছে। ইহা [illegible]!

ধরাসু ও গঙ্গার দৃশ্য।

এখন আমরা যেখান হইতে আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ছাড়িয়া আসিয়াছি, সেইখান হইতে পুনর্ব্বার আরম্ভ করি। পাঠকের মনে আছে, আমরা গঙ্গার কিনারার সড়ক রাস্তায় পড়িয়াছি। অদূরেই পথের পার্শ্বে ৫টী বড় বড় আম্রবৃক্ষ দেখিলাম। আরও কিছু পরে সড়কের ধারে ধারে সারি-বৃক্ষের রোপণ ও রোপিত বৃক্ষগুলির রক্ষাবিধানও দেখিতে পাইলাম। তৎপরেই যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তথায় ভাগীরথীকে আর পরিচিত করাইয়া দিতে হইল না।

এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানের নাম ধরাসু। শুনিলাম লালুরি হইতে ইহা ৭৷৷০ মাইল পথ। এখানকার চমৎকার ধর্ম্মশালা স্বর্গগত কালী-কমলী-বালা মহাত্মার পুণ্যকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই স্থানে ভাগীরথীর দর্শন কি মনোরম, কি পবিত্র, কি প্রাণারাম! মনে হয়, এই তীর-নীরবর্ত্তী শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া দেবতার ধ্যানে মগ্ন হই, এইজলে অবগাহন করিয়া সবাহ্যান্তর পবিত্র হই, অঞ্জলি ভরিয়া এই পবিত্র জলে অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনা করি, আর যাবজ্জীবন এই ধর্ম্মশালার ক্রোড়ে থাকিয়া দেহপাত করি! * বাস্তবিক হরিদ্বারের পর আর এমন অপূর্ব্ব স্থান আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই! দুই তটে প্রকাণ্ড পর্ব্বতের পাদতলে গঙ্গা আপন খাতে সম-বিষম উপলখণ্ডে স্খলিতগতি ও ফেনিলমূর্ত্তি হইয়া কি প্রবল কলরবেই ধাবিত হইয়াছেন! এই প্রবল নির্ম্মল ধবলধার সত্য সত্যই ভগবান্ বাল্মীকির বর্ণনার অনুরূপ "ঝঙ্কারকারি" "গিরিরাজ-গুহাবিদারি" "দূরপ্রচারি" "দুরিতাপহারি" ও "সর্ব্বশুভকারি!" তুমুল কল্লোল-কোলাহল ঝঞ্ঝাবাতধ্বনির ন্যায় দিবারাত্রি অবিরামে কি প্রচণ্ড ভাবেই উত্থিত হইতেছে! তরঙ্গাবলী অক্রমে, অব্যবস্থায়, অনপেক্ষায়

* বিবেকী-কবি সুধী শিহ্লন এইরূপ স্থান অধিকার করিয়াই নিজ চিত্ত-বৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

গঙ্গাতীরে হিম-গিরিশিলাবদ্ধ-পদ্মাসনস্থ
ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য।
কিন্তৈর্ভাব্যং মম সুদিবসৈ র্যত্র তে নির্ব্বিশঙ্কাঃ
সম্প্রাপ্স্যন্তে জরঠহরিণা গাত্রকণ্ডূবিনোদম্!

মর্ম্মার্থ,—হায়, তেমন সুদিন কি আমার কখনও উপস্থিত হইবে, যখন আমি জাহ্নবী তীরে হিমগিরির শিলাতলে বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস-বিধানে নিযুক্ত থাকিয়া যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হইব, আর প্রবীণ হরিণকুল আমার তৎকালীন স্পন্দহীন দেহে নির্ভয়ে স্বদেহ ঘর্ষণ করিয়া গাত্রকণ্ডূয়ন-সুখ অনুভব করিবে!

বঙ্গবাসীর প্রচারিত শান্তিশতকের অনুবাদ।

কি উচ্ছৃঙ্খল নৃত্যরঙ্গেই অবিরাম ধাবিত হইতেছে! যেন এস্থানে শব্দান্তরের অবকাশ নাই! দৃশ্যান্তরের অবসর নাই! বিচার-বিবেচনার স্থল নাই! এখানে আসিয়া অনিমিষে শুদ্ধ দেখিতে হইবে, দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হইবে! বাস্তবিক তাহাই হইল। কিয়ৎকালের জন্য বিস্ময়-বিমূঢ় হইলাম। ধর্ম্মশালায় নিজ নিত্য-পূজনীয় মহাদেব থাকিতেও, স্নানান্তে উদ্ধৃত ঐ গঙ্গাজল পাত্রে পরিপূর্ণ থাকিতেও তীরে গিয়া তরঙ্গ-রঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে আপ্লুত, অর্দ্ধমগ্নোন্মগ্ন পাষাণখণ্ডে উপবেশন-পূর্ব্বক শুদ্ধ ঐ স্রোতের অঞ্জলিপূর্ণ জলে জলে একবার পূজা করিয়া আসিলাম, পরে ধর্ম্মশালার বারান্দায় বসিয়া পুনর্ব্বার আপন শিবপূজাদি করিলাম, আর জননী জাহ্নবীর বিস্ময়করী মূর্ত্তি অতৃপ্ত-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। পুনঃ পুনঃ ভাবিলাম, "গঙ্গাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি" এই বাক্য এখানেই যেন সম্পূর্ণ সার্থক। এইরূপ কত কথাই অনর্গল অশ্রান্তভাবে মনে আন্দোলিত হইতে লাগিল। কত মুনি-ঋষি, সিদ্ধ-সাধক, ভক্ত-ভাবুকের শতমুখে গীত জাহ্নবী-মাতার স্তুতিগাথা স্মৃতি-পথে উপস্থিত হইল। দিল্লীশ্বরের প্রিয়কবীশ্বর জগন্নাথের অপূর্ব্ব গঙ্গাস্তুতি "অমৃত-লহরী" আরও কত অমৃতময়ী বোধ হইল। ভারতচন্দ্রের নৃত্যৎ প্রায় পদাবলীনিবদ্ধ গঙ্গাস্তোত্র যেন গঙ্গাতরঙ্গের আকারে হৃদয়তট প্রহত করিতে লাগিল। আমাদের দেশীয় প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা পণ্ডিত-কবি দেওয়ান মহাশয়ের গঙ্গামাহাত্ম্য-কীর্ত্তনাত্মক সঙ্গীতটীও কণ্ঠদেশ অধিকার করিয়া বসিল। নিমিষের অবসর পাইতে না পাইতে আমাদের খাঁটি-কবি নটগুরু গিরিশচন্দ্রের ও ভাবুক-কবি নীলকণ্ঠের অপূর্ব্ব গীতিও আমার প্রাণ-মন উল্লসিত ও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। ফলতঃ আজিকার দিন-যামিনী কি নির্ম্মল আনন্দেই যাপন করিলাম! *

* কেবল নাম-মালার উল্লেখ না করিয়া পদগুলির একটু আধটু উদ্ধৃত করিয়া দিই। যথা ভারতচন্দ্রের—

ধরাস্থ হইতেই যমুনোত্তরী যাওয়ার রাস্তা বাহির হইয়াছে। রাস্তা বড় দুর্গম বলিয়া আমাদের যমুনোত্তরী যাওয়া হইল না। একজন বৈরাগী ও শ্রীযুত ভগবান্‌চন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রহ্মচারী, এই দুইজন বাঙ্গালী এবার যমুনোত্তরী গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বৈরাগী-বাবাজী কিছুদুর যাইয়াই ফিরিয়া আসেন, ব্রহ্মচারীজী শেষ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিলেন। গঙ্গোত্তরী হইতে আমাদের প্রত্যাগমনের সময় তাঁহাদের উভয়ের সহিতই ক্রমে ক্রমে সাক্ষাৎ হওয়ায় সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলাম। উক্ত ব্রহ্মচারীজীর মুখে ঐ দুর্গম তীর্থের যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছি, তাহাই এখানে বিবৃত করিতেছি।

ধরাস্থ হইতে যমুনোত্তরী ৪০ মাইল রাস্তা হইবে। টিহরীমহারাজের নিয়ত চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে এই রাস্তা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা যাতায়াত-যোগ্য হইয়াছে। প্রথম প্রথম ১০।১২ মাইল অন্তর যে সামান্য চটী আছে, তাহাতে আটা, ঘি, লবণ, কদাচিৎ ডাউলও মিলে। একস্থানে ১২ মাইলব্যাপী ১টা বিষম চড়াই আছে, তাহাতে চটীও নাই। খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হয়। সদাব্রত নাই, সাধুসন্ন্যাসীদিগের বিশেষ কষ্ট। কেবল পাণ্ডারগাঁও নামক ১টী স্থানে সদাব্রত আছে। ঐ গ্রামে সামান্য ভিক্ষাও মিলে। কিন্তু সেখানকার নিয়ম, পুরুষেরা ছেলে-পিলে লইয়া ঘরে বসিয়া থাকে, আর স্ত্রীলোকেরা ক্ষেতে চাষের কাজ করে, ঐ স্ত্রীলোকেরা ঘরে না ফিরিলে ভিক্ষাও পাওয়া যায় না।

জয় জয় গঙ্গে, জয় গঙ্গে।
হরিপদ-কমল-কমল-কলদঙ্গে।
টল-টল ঢল-ঢল, চল-চল ছল-ছল,
কল-কল তরল-তরঙ্গে!
পুটকিত শিবজট- বিঘটিত সুবিকট,
লটপট কমঠ ভুজঙ্গে! ইত্যাদি।

কখন কখন উদরের জ্বালায় ভিক্ষার জন্য গন্তব্য পথ হইতে ২।৩ মাইল অনর্থক নীচে নামিয়া যাইতে হয়। কিন্তু পথ কি রকম, তাহা বলা হয় নাই, বলিতেছি শুনুন।

পথ প্রায়ই বরফে আচ্ছন্ন, তবে বরফের কম-বেশি আছে। কোথাও পায়ের গোছ পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। ডোবা পাখানি ধীরে ধীরে উঠাইয়া আর এক পা বাড়াইতে হয়। পা পাহাড়ের দিকে ঘেঁসিয়াই ফেলিতে হইবে। কি জানি বরফের নীচে পথ কোথায় কতটুকু আছে। রাস্তা-ভ্রমে একটু বাহিরের দিকে পুরু বরফের রাশির উপর পা দিলে, যদি ঐ বরফ খসিয়া পড়ে, তাহাহইলে কি সর্ব্বনাশ! ঐ বরফস্তূপের সহিত নিজেও তথা হইতে স্খলিত হইয়া সহস্র সহস্র হস্ত নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়। এইজন্য পাহাড়ের দিকে ঘেঁসিয়াই পা ফেলা কর্ত্তব্য। পথ স্থির লক্ষ্য না হওয়ায় আন্দাজি আন্দাজিই বরফের উপর দিয়া চলিতে হইবে। ঐ বরফ খুঁড়িলেই ঝরঝর করিয়া ঝরনার জল বাহির হয়। আর মধ্যে মধ্যে আপনা-আপনিই বরফ ফুটিয়া ঝরণা বাহির হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঝরণার ঐ জল এত কন্‌ক’নে যে তাহাতে হাত দেওয়া যায় না, বরফ অপেক্ষাও তাহা শীতল।

পথে মানুষের সঙ্গে দেখা হইবার যো নাই। চারিদিকে বরফ আর জঙ্গল। তবে সে জঙ্গলে বাঘ-ভালুক নাই। আর, কোথাও জঙ্গলও নাই, কেবল বরফের রাশি ঊর্দ্ধ, অধঃ, সম্মুখে পার্শ্বে সর্ব্বশ্বেত-মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র ধপধপ করিতেছে! না-পশ্চিম না-উত্তর মুখে ঐ রাস্তায় কয়েক দিন চলিতে চলিতে পাণ্ডাদিগের বসতি পাণ্ডারগাঁও বা খরশালী নামক স্থান পাওয়া যায়। যেদিন পাণ্ডাগাঁওয়ে পঁহুছিতে হয়, সে দিন ৬ মাইল চড়াই অতিক্রম করিয়া ঐ গ্রাম পাওয়া যায়। ঐ ৬ মাইল সবই চড়াই এবং এক-দম বরফ। সকালে বাহির হইলে বৈকালে ঐ পথখানি যাওয়া যায়।

পাণ্ডাগাঁও হইতে পুরা ১ দিনে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারিলেই যমুনোত্তরী পঁহুছান যায়। ঐ ৬ মাইল চড়াই এবং উহার মধ্যে আর চটী নাই। রাস্তা প্রায় ১ হাত পরিসর আছে, কিন্তু প্রায়ই লক্ষ্য হয় না, বরফ-বর্ষণে অদৃশ্য হইয়া যায়। এখানে নীলবর্ণ মেঘ সর্ব্বদাই আছে এবং গুঁড়ি-গুঁড়ি বরফ-বৃষ্টি মাঝে-মাঝেই হইতেছে।

পাঁওরা যাত্রী পাইলে ৫।৬ জন দলবদ্ধ হইয়া পাণ্ডাগাঁও হইতে বাহির হইয়া যমুনোত্তরী পঁহুছেন। তথায় গুহার মধ্যে ধুনী জ্বালাইয়া কোনরূপে দুর্জ্জয় শীতে আত্মরক্ষা করেন। সপ্তাহকাল তথায় থাকিয়া পাণ্ডাগাঁওয়ে চলিয়া আসেন। আবার ৫।৬ জন মিলিয়া একদল পাণ্ডা যমুনোত্তরী রওনা হন।

পাণ্ডাদের জন্য যেমন গুহা আশ্রয়স্থান আছে, যাত্রীদিগের জন্য তেমনি ১টী ধর্ম্মশালা আছে। অহমদাবাদনিবাসী শ্রীযুক্ত চুন্নুভাই-মাধোলালজী ঐ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মশালাটী তেমন প্রশস্ত নহে, উহার কাঠের ছাদ দিয়া জলও ঝরে। ঠাণ্ডা হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। আর ঠাণ্ডাও গঙ্গোত্তরী অপেক্ষাও বহুগুণে বেশি। ঝরণার জল স্পর্শ করা যায় না। উপর পাহাড় হইতে অতিবেগে যমুনোত্তরীর ঝরণা পড়িতেছে। অতিবেগে সে প্রবাহের পতনে পতন-স্থলের পাষাণ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! প্রবাহের উপর চাঁই চাঁই বরফ ভাসিয়া যাইতেছে। সে জলে স্নান ত দূরের কথা, তাহা স্পর্শ করাই অসাধ্য। কিন্তু করুণাময় ভগবান্ নারায়ণ এরূপ সঙ্কটস্থলেও স্নানাদির উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে ৯টী উষ্ণকুণ্ড আছে। তন্মধ্যে ৬টীর জল অত্যন্ত গরম। ৩টীর জল গা-সহা গোচ। তাহাতেই অত্যন্ত উপকার হয়। যেমন ধুনীর কাঠের অভাব, তেমনি অত্যন্ত শীতের কষ্টের সময় ঐ ৩টী কুণ্ডে গা ডুবাইলে সকল কষ্ট দূর হয়।

অত্যুষ্ণ কুণ্ডগুলিও যে কত প্রয়োজনীয়, তাহা বলিতেছি। আলানি

কাঠের এখানে নিতান্ত অভাব। জঙ্গল যাহা কিছু আছে, তাহা বরফে সর্ব্বদা ভিজিয়া থাকে। যাত্রীদের পাকের উপায় কি? উপায় ঐ গরমকুণ্ড। রুটী তৈয়ার করিয়া ঐ কুণ্ডের ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করিলে আধঘণ্টার মধ্যে উহা সিদ্ধ হইয়া ভাসিয়া উঠে। চা'ল্ ডা'ল, আলুও বেশ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অবশ্য চা'ল-ড'াল, গামচায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। এইরূপে যাত্রীদের জীবন রক্ষাপক্ষে ভক্তের-ভগবান্ কোন অনুপায় করিয়া রাখেন নাই। তবে কিছু কষ্ট। কোন্ দুর্ল্লভবস্তু পাইবার জন্য এরূপ কষ্টস্বীকার করিতে না হয়? কষ্টই তপস্যা, তাহাতে ভয় করিলে চলিবে কেন? আর মনকে প্রস্তুত করিতে পারিলে, তাঁহাকে পাইবার উপযুক্ত করিতে পারিলে, সে কষ্টও বোধহয় কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।

তার পর ভগবদ্দর্শন। তপ্তকুণ্ডের ঝরণার উপরে ১টী ছোট পাষাণময় মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যে ভগবানের শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজমান। ভক্ত যাত্রিগণ দর্শন করিয়া সকল দুঃখ দূর করে।

যমুনোত্তরী হইতে ফিরিয়া যাত্রিগণ উত্তর-কাশী আসিয়া পঁহুছে। আসিবার এ রাস্তাও উত্তম নহে। তৎপরে ঐ যাত্রীরা উত্তর-কাশী হইতে গঙ্গোত্তরী গমন করে।

যমুনোত্তরীর কথা সমাপ্ত হইল। এক্ষণে আমরা গঙ্গোত্তরীর পথে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসি।

যমুনোত্তরী সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ অভিধানে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—উহা হিমালয়ের যমুনোত্তরী নামক শৃঙ্গের ৫ মাইল উত্তরে এবং পাঁচ-বাঁদর নামক শৃঙ্গের (২০৭৩১ ফিট) ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে উদ্ভূত হইয়াছে। যমুনোত্তরী শৃঙ্গ ২৫৬৬৯ ফিট্ উচ্চ। পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচ-বাঁদর শৃঙ্গ (২০৭৫৮ ফিট) হইতে কয়েকটী প্রস্রবণ নিঃসৃত হইয়াছে। এই পাঁচ-বাঁদর শৈলের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ হ্রদ আছে। যমুনোত্তরী

হিন্দুর একটী পবিত্র তীর্থ। এখানে ৩টী স্রোতোধারা একত্র সংমিলিত হইয়াছে। নিকটে বসুস্রোতা নামে ১টী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উহাতে পিতৃলোকের পিণ্ডদান পরম পুণ্যপ্রদ। এতদ্‌ভিন্ন তথায় আরও কয়েকটী উষ্ণ প্রস্রবণ দৃষ্ট হয়।

—o—
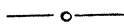
গঙ্গার দৃশ্য।

১৩ই বৈশাখ, মঙ্গলবার। প্রভাত।

কল্যকার ন্যায় আজিও আমাদিগের সুদিন, সুপ্রভাত! নিদ্রাভঙ্গেই মাতা ভাগীরথীর পবিত্র দর্শন। তার পর জননীকে দক্ষিণধারে রাখিয়া তাঁহার তীর দিয়া তাঁহার তরঙ্গ-লীলা দর্শন করিতে করিতে তদীয় সলিল-স্নিগ্ধ মন্দ পবন সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ করিতে করিতে, ধরাসু হইতে রওনা হইয়াছি। অদ্য ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিলে চুড়াগ্রামের ধর্ম্মশালা পাওয়া যাইবে। পথ অধিক, দ্রুত চলিতে হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গার ধারে ধারে সিধা সড়ক দিয়া যাইতে হওয়ায় তেমন কষ্ট বোধ হইতেছে না। অধিকন্তু অবিরামে গঙ্গাদর্শন, পাষাণে প্রহত গঙ্গাস্রোতোবেগের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ, তরঙ্গতাড়িত স্নিগ্ধ সমীর সেবন ও গঙ্গার উভয়তীরস্থ তরুলতাপর্ব্বতের মধুর-ভীষণ দৃশ্য দর্শন প্রভৃতি কারণে অজ্ঞাতে অলক্ষিতে বহুপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। স্থানে স্থানে উভয়তীরে এত নিবিড় উন্নত সতেজ তরুশ্রেণী ও স্নিগ্ধহরিত গুল্মলতাগহন জন্মিয়াছে যে অনেক সময় জাহ্নবীর প্রবাহ একবারেই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, সূর্য্যের সুতীক্ষ্ণ কিরণচ্ছটা প্রবাহকে স্পর্শ করিতেও পারিতেছেনা, তরঙ্গাবলীর আস্ফালন-জনিত গভীর গর্জ্জনে খরপ্রবাহ অনুমিত হইতেছে মাত্র। আবার কোন স্থলে হয় ত তরুলতা অতি বিরল, বহুদূর পর্য্যন্ত জাহ্নবীর স্ফূর্ত্তিশীল ফেন-ধবল নির্ম্মল প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। জননী জাহ্নবীর এই সকল অব-

স্থান অবলম্বনেই কবিগুরু বাল্মীকি স্বকৃত অতুল্য স্তোত্রে উক্ত প্রবাহকে "তালতমাল-শাল-সরল-ব্যালোল-বল্লী-লতাচ্ছন্নং" "সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং" "শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলং" এইরূপ বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যেই বক্রপথে সম্মুখস্থ পর্ব্বতে গঙ্গার প্রবাহ দৃষ্টির ব্যবধানে পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, এই পর্য্যন্তই বুঝি প্রবাহের শেষ, সম্মুখবর্ত্তী শৈলশ্রেণী হইতেই বুঝি গঙ্গা নির্গত হইয়াছেন! স্থানে স্থানে উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতদ্বয় এরূপ নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রবাহের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়-মান হইয়াছে যে একবিন্দু তটের পর্য্যন্ত স্থান নাই! এইরূপে মর্য্যাদা-ভঙ্গ করায় জননী জাহ্নবী যেন সেই সেই স্থানে নিতান্ত নিপীড়িতই হইয়াছেন। আবার অনেকস্থলে তটের সুন্দর অবকাশ আছে, তথায় তটদেশে এক একটা প্রকাণ্ড পাথর এরূপভাবে পড়িয়া আছে যে, গঙ্গার সেই প্রথম নির্গম-কালীন তাঁহার দুর্জ্জয়প্রবাহবেগে বিজিত ইন্দ্রের ঐরাবতই যেন অদ্যাপি সেইরূপ বিকল ও বিহ্বল অবস্থায় পড়িয়া আছে! কোথাও প্রবাহে নিমগ্নপ্রায় ঐরূপ পাষাণখণ্ড দেখিয়া জল-কেলিমগ্ন মাতঙ্গযূথের উর্দ্ধীকৃত মস্তক বলিয়া ভ্রম হইতেছে। আমরা এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে পথবাহন করিতেছি, এমন সময়ে পূর্ব্ব ধর্ম্মশালার পরিচিত ১জন নেপালী সন্ন্যাসী আসিয়া আমাদের সঙ্গ ধরিলেন। তাঁহার সঙ্গে নেপাল অঞ্চলের আরও ২ জন ছিলেন, ১টী চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী, অপরটী ঐ কুমারীর সহোদর। নেপালী সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে কহিলেন, * মহারাজ আপনি এদিকে-ওদিকে কি দেখিতেছেন? সম্মুখভাগে একটু উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দেখুন, অই কৈলাসধাম দেখা যাইতেছে। আমি চাহিয়া দেখিলাম, যথার্থই জগন্নাথের বা ভুবনেশ্বরের মন্দির-আকারে তুষার-ধবল কয়েকটী শৃঙ্গ

* আমরা যেমন সম্মান করিয়া মহাশয় বলি, হিন্দুস্থানীতে সেইরূপ স্থলে মহারাজ বলা রীতি।

দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আহা কি রমণীয় দর্শন! ব্যোম কেদার! বিশ্বনাথ, কবে তোমার পূর্ণ ও প্রকট অধিষ্ঠানভূমি কৈলাসধাম দর্শন করিয়া ইহজন্ম সফল করিব? এখন আভাসে যাহা দেখিলাম, তাহাতেই পরম পুলকিত হইলাম। ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলাম। চলিতে চলিতে ক্ষণকাল পরেই শৃঙ্গ কয়েকটী দৃষ্টির অগোচর হইল। ক্রমে আমাদের ক্লান্তি ও পিপাসা অধিক হইয়া উঠিল। গঙ্গার ধারের সড়ক দিয়া বরাবর যাইতে হইবে বলিয়া অদ্য আমরা শূন্য কমণ্ডলু হাতে হইয়া চলিয়াছি। অন্যদিন উহা ঝরণার জলে পূর্ণ করিয়া লই। প্রয়োজন হইলে গঙ্গায় নামিয়া কমণ্ডলু পুরিয়া লইব, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু এখন বোধ হইতে লাগিল, আমরা যে সড়ক দিয়া চলিয়াছি, গঙ্গা তথা হইতে অনেক নীচে। নীচে হউক, পিপাসার জন্য যখন জলের প্রয়োজন হইয়াছে, কষ্ট করিয়া একটু নীচে নামিতেই হইবে। দেখিতে দেখিতে, একস্থানে নীচে নামিবার পথ পাওয়া গেল। আশ্বস্তচিত্তে আমরা নীচে নামিতে লাগিলাম। কিছুদূর নামিতেই ১টা ঝরণা পাওয়া গেল। কিন্তু গঙ্গা যখন নিকটে রহিয়াছেন, তখন ঝরণার জল কেন পান করিব, এই বিবেচনা করিয়া ক্রমাগত নামিতে লাগিলাম। নামিবার পথে গাছ-পালা গুল্মাদিও অনেক পাইলাম, কিন্তু গঙ্গা আর পাওয়া যায় না। ক্রমে এতদূর নামিতে হইল ও নামিতে এত কষ্টবোধ হইল যে, ইহা অপেক্ষা ঝরণার জল লওয়াই উচিত ছিল, বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু এতদূর নামিয়া ফেরাটাও ভাল হয় না বলিয়া আরও কতকদূর নামিলাম। তথা হইতে দেখা গেল, আরও কিছুদূর নামিলে গঙ্গার ধার অবশ্য পাওয়া যাইবে, কিন্তু এ ধারে সিধা খাড়াই, নামিয়া জল লওয়া দুষ্কর। অপর পারে নামিবার বেশ উপায় আছে দেখা যাইতেছে। এ পারেও অবশ্য উপায় ছিল, নতুবা পথের চিহ্ন রহিয়াছে কেন? কিন্তু স্রোতের বেগে স্থানটা ধ্বস্ খাইয়া বোধ হয় পথটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হায় এত কষ্ট করা বৃথা হইল! এতক্ষণে কতদূর পথ যাওয়া হইত। তাহা না হয় নাই হউক, পিপাসার কষ্ট ত দূর করিতে পারিতাম! কিছুই হইল না, কষ্ট ও অনুতাপ সার হইল। বালা সঙ্গে থাকিলে অদ্য আমাদিগকে এত কষ্ট ও অনুতাপ ভোগ করিতে হইত না। সে আমাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিত যে এখানকার এত দূরকে এত নিকট দেখায়! কিন্তু সকল দিন সে ঠিক্ সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারিত না; কোন দিন কিছু অগ্রে, কোন দিন বা কিছু পশ্চাতে পড়িত! আজ আমরা তাহার অপেক্ষা না করিয়া নিজ বুদ্ধিতে নূতন পথে চলিয়া ঠকিয়াছি। তাহাই আলোচনা করিতে করিতে উঠিতে লাগিলাম ও বহুক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ঝরণা পাইলাম। এখন পুনর্মূষিকো ভব! সেই ঝরণার জলই আদর করিয়া খাও! ঝরণার জল নির্ম্মল হইলেও গঙ্গা-জলের মত শীতল হইবার সম্ভব কি? ধরাসুর ধর্ম্মশালার নিম্নেই যে তুষার-শীতল গঙ্গাজলে স্নানপানাদি করিয়াছি, তাহার তুলনা নাই; তদবধি অন্য জলে তৃপ্তি দূরগত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আজ ইহাকেও অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। এই ঝরণার জলই আজি অমৃত-স্থানীয়। ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া হইলেই ত হয় না, ঘোড়াকে ধরিতে পারিলে বটে। নতুবা আপন পায়েরই সম্মান করিয়া হাঁটিয়া চলিতে হয়।

ক্রমে পূর্ব্বপথে উঠিয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করা গেল। চলিতে চলিতে আজ একটী সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। পথের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের নিম্ন গড়ান হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে ভূরি পরিমাণে বন্য ঝাউগাছ যেন শ্রেণীবদ্ধ সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তন্মধ্যে উর্দ্ধভাগের ঝাউগাছগুলি ঠিক্ দেবপ্রতিমার চালে সুসন্নিবিষ্ট কল্কার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হয় ত ইহা ইতিপূর্ব্বেও দেখিয়াছি, কিন্তু তখন তাহাতে চিত্তনিবেশ হয় নাই। এখন উহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য

অনুভবের গোচর হওয়ায় চমৎকৃত হইয়া গেলাম। আরও কিছুদুর অগ্রসর হইলে কয়েকটী আপাদমস্তক-পুষ্পিত পুষ্পবৃক্ষ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তন্মধ্যে কতকগুলি শ্বেত-পুষ্পসম্পদে সুসজ্জিত, কিন্তু তাহাদের সৌরভ-সম্পদ নাই। অপর গাছগুলি, যুথিকার অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, কিন্তু দিব্য সৌরভোদ্গারী লবঙ্গের আকৃতি পুষ্পে ও তাহার সুঘ্রাণে দিক্ উজ্জ্বল ও আমোদিত করিয়াছে। আমি শ্বেতপুষ্প কতক-গুলি তুলিতে গেলাম। কিন্তু তুলিতে পাপ্‌ড়িগুলি খসিয়া পড়িল, কোন কাজেরই হইল না। মাঝে হইতে সেই ডালগুলি শ্রীভ্রষ্ট হইল! দেখিলাম, এ ফুল তোলা অপেক্ষা গাছগুলি আপাদমস্তক ঐ শুভ্র ফুলের রাশিতে ভূষিত হইয়া থাকে, তাহাই উত্তম। তাহারা আমাদের স্থায় এ পথের কত যাত্রীকে কতই আনন্দিত ও আপ্যায়িত করিতেছে! আর ফুল তোলায় সময় নষ্ট করিলাম না। ক্রমে কখনও দ্রুত, কখনও মন্থরগতিতে আমরা বাবা কালী-কম্বলীবালার চুণ্ডার ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। কিছু উপরে ঐ স্থানে আরও ১টী ধর্ম্মশালা আছে। সেখানে ঝরণা নিকট, কিন্তু গঙ্গার ঘাট কিছু দুর। এজন্য আমরা এখানকার ধর্ম্মশালাটীই আশ্রয় করিয়া বহু সাধুসন্ন্যাসী সহ এখানেই অদ্য মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যাপন করিলাম।

—o—

উত্তর-কাশীর পথে।

১৪ই বৈশাখ, বুধবার।

প্রভাতে পুনর্ব্বার পথবাহন। অদ্য আমরা সুবিখ্যাত উত্তর-কাশী পঁহুছিব। অদ্য ১০।১১ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। আমরা প্রভাত হইতেই খুব দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। কোথাও কোথাও আমাদিগের গতিপথ হইতে ভাগীরথী আমাদের দৃষ্টির দুরবর্ত্তিনী হইতে

লাগিলেন। গঙ্গাতটে প্রশস্ত চর পড়িয়া আমাদিগকে ঐরূপ দূরবর্ত্তী করিতে লাগিল। ঐ চরে কৃষকেরা পাথরের আলি দিয়া আপন আপন খণ্ড চিহ্নিত করিয়া লইয়াছে ও উহাতে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। ইহা অপেক্ষা অল্প বিস্তৃত চর ইতিপূর্ব্বেও কয়েক স্থানে দেখিয়াছি। পথের ধারে একস্থানে একটী চারা অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে পাষাণবদ্ধ বেদীর উপর একব্যক্তি দীনবেশে ঘড়ায় করিয়া গঙ্গাজল ও কিছু ছাতু লইয়া বসিয়া আছে। আমরা সমীপবর্ত্তী হইলে ঐ ব্যক্তি আমাদিগকে কিছু ছাতু ও গঙ্গাজল লইতে অনুরোধ করিল। আমরা জিজ্ঞাসিলাম, কে এ সকল দান করিতেছেন? ঐ ব্যক্তি ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নীরবে জানাইল, ভগবান্ এ সকল দিতেছেন। আমরা বলিলাম, বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি উত্তম কার্য্য করিতেছেন। আপনার ঘর কোথায়? অদূর উপরে পর্ব্বতের গাত্রে তাহার সামান্য ১টী ঘর সে দেখাইয়া দিল। আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া ১ কমণ্ডলু গঙ্গাজল মাত্র তাহার নিকট হইতে লইয়া তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে দিতে পুনর্ব্বার পথবাহন করিতে লাগিলাম।

এ পথে ২।১টী পার্ব্বত্য নদী ও বড় বড় ঝরণা দেখিলাম। তাহারা অবিরাম প্রবল গতিতে আপন আপন গতি-পথে প্রশস্ত খাত নির্ম্মাণ করিয়া গঙ্গায় আসিয়া মিশিতেছে। আমাদের সড়ক রাস্তায় সেই সেই স্থলে সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। উহাদের মধ্যে চুঁড়া হইতে ৩ মাইল পরে যেটী পাওয়া যায়, সেটীর নাম দুধ গঙ্গা ও দুধগঙ্গার ৩ মাইল পরে বর্ণানদী। ঐ গুলি পথিকদিগের এ দীর্ঘপথে পরিশ্রান্ত দেহের কম সাহায্যকারী নহে। বড় বড় বৃক্ষও যাত্রীদিগের ঐরূপ সহায় ও তাহা এ পথে আছে। যেখানে সেখানে ঐরূপ ঘনচ্ছায় বৃহৎ বৃক্ষ দেখিলাম, তথায় একটু একটু বিশ্রামের লোভ আমরা সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উহাতে মন্দ [illegible]না বটে, কিন্তু তাহাতে দোষ এই,

পথ কিছুতেই ফুরাইতে চাহে না। প্রবাদবাক্যই আছে,—"দাঁড়ালে দণ্ড, ব'স্‌লে কোশ, পথ বলে মোর কি দোষ।"

অদূরে আমাদের পাকদাণ্ডি পথের পরিচিত পাণ্ডাজীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি ও আরও ২টী পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহের নিমিত্ত ১ মাইল কি তাহার কিছু অধিক পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। পাণ্ডাদের যেমন রীতি আছে, তদনুসারে অপরিচিত দুইজন আমাদের পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বারেন্দ্রশ্রেণী শুনিয়া একজন জিদ করিলেন যে আমার বাঙ্গালী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বহুত যজমান আছে। যথা রাজসাহীর অমুক, পাবনার অমুক ইত্যাদি; সুতরাং আমিই আপনাদের পাণ্ডা। আমি কহিলাম, লক্ষ লক্ষ রাঢ়ীয় ও লক্ষ লক্ষ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আছেন, তাহাতে তাঁহাদের পরস্পর বাধ্যবাধকতার প্রমাণ কিছু হয় না। তাহাতে ঐ পাণ্ডাজী খাতা খুলিয়া দেখাইলেন, তাঁহার যজমানেরা প্রত্যেকেই এইরূপ লিখিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের বংশাবলীর যে কেহ এখানে আসিবেন, তাঁহারা সকলেই উঁহাকে পাণ্ডা করিতে বাধ্য হইবেন। আমি কহিলাম যে আমি উঁহাদের বংশীয় কেহ নহি, তবে উঁহাদিগের মধ্যে একজন আমার শিষ্য আছেন বটে। শেষোক্ত কথাটী আমার প্রকাশ না করাই উচিত ছিল। কিন্তু সহজ পথে সত্যই নির্গত হয়। আগত্যা আরও কিছুক্ষণের জন্য আমার বিপদ্ বাড়িয়া গেল। আমি আপাততঃ তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বলিলাম, আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন। আমরা বড় পরিশ্রান্ত, আগে আশ্রয়ে উপস্থিত হই, স্নানাহ্নিক করিয়া জল গ্রহণ করি, পরে আপনা-দিগের অভিযোগের মীমাংসা হইবে। পরিচিত পাণ্ডাজী আমাদিগকে মাড়োয়ারিদিগের এক পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালায় স্থান ঠিক করিয়া দিলেন এবং আমাদিগকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া গিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক তথায় স্নান করাইলেন। স্নানান্তে আমরা বাসায় আসিলাম। বাসায় আসিয়াও আমরা

বিশ্রাম করিতে পাই নাই। আমাদের পূজাহ্নিক সমাপ্তি হইতে না হইতে পূর্ব্বোক্ত অভিযোক্তা পাণ্ডাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি দেখিলাম, মন্দ নহে, যতক্ষণ পাক সমাপ্তি না হয়, অভিযোগের একটা নিষ্পত্তি হইতে পারিবে।

পাণ্ডাজী কহিতে লাগিলেন,—দেখুন, এ তীর্থস্থান, ধর্ম্ম উপার্জ্জন মানসেই লোক তীর্থে আসিয়া থাকে, ধর্ম্মোপার্জ্জনের পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম উপার্জ্জন না হয়, ইহাই আপনাকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বিচারের স্থল বিশেষরূপেই উপস্থিত দেখা যাইতেছে। কেন না, আমার যজমানগুলি বাঙ্গালী, আপনিও তাই। তাঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণী, আপনিও বারেন্দ্র। বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যে একজন আপনার শিষ্য। গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পর বাক্যলঙ্ঘন অতি গুরুতর কথা। অবিচারে আপনার না হয় যাহা হয় হইবে, কিন্তু আমার ব্যবসায় ও জীবিকা পাছে মারা যায়, ইহাই আমি অধিক লক্ষ্য করিতেছি। আপনিও দয়া করিয়া সেইটা বিশেষ করিয়া দেখিবেন। আপনার উপরই আমি বিচারের ভার দিতেছি।

আমি কহিলাম, ভয় নাই, আপনার জীবিকা মারা যাইবে না। গুরুশিষ্যের এ দৃষ্টান্তে আপনার কোন ক্ষতি হইবে না। আপনার যজমানেরা যাহা আপনার খাতায় লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা আমি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়াছি। তাঁহাদের কাহারও বংশাবলীর আমি কেহ নহি। সুতরাং আমার শিষ্য যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কথা আমার লঙ্ঘন করা হইতেছে না। কেননা, নিজবংশীয় ভিন্ন অন্যের সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখেন নাই। তবে আমার শিষ্য আপনার যজমান, এজন্য আমার সঙ্গে আপনার সাধারণ পাণ্ডা অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতা আপনি দেখাইয়াছেন। আমিও তাহাই মানিয়া লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার বর্ত্তমান পাণ্ডাকে আমি পূর্ব্বে

একরূপ কথা দিয়াছি। তাহা লঙ্ঘন করিলে আমার জ্ঞানকৃত নিজবাক্য লঙ্ঘন-জন্য ধর্ম্মহানি সম্ভাবনা আছে। তাই আমি আপনার সঙ্গে এত তর্কবিতর্ক করিতেছি, নতুবা আপনারা সকলেই আমার পক্ষে সমান মান্য। ভরসা করি, ইহাতে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হইবেন না। পাণ্ডাজী ইহাতেও কুতর্কে নিরস্ত হইলেন না, কিন্তু আমি তাঁহার অসার প্রতিবাদের প্রত্যেকবার উত্তরদানে আর মনোযোগ না করিয়া ভোজনের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডাজী নিরস্ত হইলেন।

উত্তর-কাশীতে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। অন্যান্য ধর্ম্মশালাগুলি আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে অবসর পাই নাই। কিন্তু বাবা কালী কম্বলীবালা সাধুর এই ধর্ম্মশালা যে অতি শ্রেষ্ঠ ও সুব্যবস্থাময় ধর্ম্মশালা, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মশালাটী অনেকটুকু স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রশস্ত অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ঘর, ঠিক্ মধ্যস্থলেও ঘর আছে। ভবনের দক্ষিণধারে, মাতা ভাগীরথী যথায় অবিরল কল্লোল-কলরবে প্রবাহিত রহিয়াছেন, তাঁহার দিকে সম্মুখ করিয়া দ্বিতলে যে প্রশস্ত খোলা বারান্দা আছে, তাহা ও তৎসংলগ্ন ১টী কুঠুরি আমরা অধিকার করিয়াছিলাম। নিম্নতলে পাকের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিম্নে, উপরে অধিকাংশ ঘরই যাত্রীতে পরিপূর্ণ, কিন্তু সকল ঘরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ধর্ম্মশালার কার্য্যকারকটীও হাস্যমুখ, সরলচিত্ত, স্বকর্ম্মে অভি-নিবিষ্ট। পরিচয়ে জানিলাম, বুলন্দসহর জেলায় ইঁহার নিবাস, নাম বিহারীলাল্ বহরা। কোন্ যাত্রীর কি অভাব, ইনি স্বয়ংই স্বেচ্ছাক্রমে কর্ত্তব্যবোধে তৎসমুদায় অনুসন্ধান করিয়া পূরণ করিতেছেন। ভোজনের জন্য চাল, ডাল, আটা, ঘৃত, লবণ, লঙ্কা আদি, ভোজনপাত্র থালা ও জল-পাত্র ঘড়া আদি, শয়ন উপবেশনের জন্য শতরঞ্চ প্রভৃতি যাহার যাহা দরকার প্রত্যেককে প্রার্থনামত সেই সেই দ্রব্য আনাইয়া

দিতেছেন। উক্ত দ্রব্যাদি দেওয়া, লওয়া প্রভৃতি কার্য্যের জন্য তাঁহার অধীনে চাকর নিযুক্ত আছে। উহা ভিন্ন, যাত্রীদিগের ঔষধের প্রয়োজন হইলে, তাহাও এখানে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপুস্তকের প্রয়োজন হইলে তাহাও পাঠ করিতে দেওয়া হয়। সকলই এখানে সংগ্রহ করা আছে। ফলতঃ এরূপ ধর্ম্মশালা ইতিপূর্ব্বে আর আমি কখনও দেখি নাই। বাজারে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি একরূপ মিলিল। এখানে চাউল ।০ আনা ও আলু ৵০ আনা করিয়া সের পাওয়া গেল।

উত্তর-কাশী স্থানটীও অতি সুন্দর। কাশীক্ষেত্রের নামে আমাদের যে নিত্য উৎসবময়, অসংখ্য সৌধময়, অগণ্য জনকোলাহলপূর্ণ, অন্নপূর্ণার মুক্তভাণ্ডারস্বরূপ বিস্তীর্ণ শিবরাজধানীর ধারণা আছে, যদিও এ ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র স্থান তাহা নহে, তথাপি ইহা মনোরম। ইহাতে ঊর্দ্ধসংখ্যায় ১২৫ কি ১৫০ ঘর লোকের বসতি হইবে। সুতরাং সে কাশীর তুলনায় ইহা নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। তরঙ্গোন্মত্ত সমুদ্রের তুলনায় নিস্তরঙ্গ হ্রদ যেমন দেখায়, ইহা তেমনি। উভয়ই শোভার আধার, কিন্তু উভয়ের উভয় শোভা পরস্পর পৃথগ্‌বিধ।

নির্জ্জন বলিয়া এস্থানে গাম্ভীর্য্য ভূরিপরিমাণে বর্ত্তমান। বিশেষতঃ চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্ব্বত দণ্ডায়মান থাকিয়া এখানকার ক্ষুদ্র সমতল প্রান্তরটাকে অথবা ঐ প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র লোকালয়টীকে বিলক্ষণ গাম্ভীর্য্যময় করিয়াছে। তদ্‌ভিন্ন গঙ্গা যেরূপ অনন্তকাল ব্যাপিয়া দিবা-রাত্রি অবিরামে প্রচণ্ড কল্লোল-কোলাহলে উত্তর-কাশী বেড়িয়া প্রবাহিত আছেন, বারাণসী নগরীতে সর্ব্বদা সেরূপ মহোচ্চ প্রাকৃতিক কোলাহল নাই। পক্ষান্তরে, এখানকার বসতির সংখ্যা কত যৎসামান্য, তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। দোকান ২ খানি মাত্র আছে। তাহাতেও চাউল মিলিল ত আটা মিলিল না। দধি দুগ্ধের ত কথাই নাই। একটী পোষ্ট আফিস্ সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে দোকানদারই পোষ্টমাষ্টার এবং

দোকানের কিয়দংশই ঐ পোষ্ট আফিস্। পাণ্ডাগণও অতি দরিদ্র। তাহাদের বসতির মধ্যে মধ্যে, সামান্য সামান্য শস্যক্ষেত্র, ও শস্যক্ষেত্রের এদিকে ওদিকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী দেবমন্দির। ঐ শস্যক্ষেত্র না থাকিলে শুদ্ধ পাণ্ডাগিরিতে পাণ্ডাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। তীর্থযাত্রীর সংখ্যাও এ তীর্থে খুব কম। বস্তুতঃ কোনরূপে কোন জাঁকজমক এখানে নাই। কিন্তু সকল ত্রুটির পরিহার হইয়াছে ঐ নিত্য কল্লোল-কোলাহলময়ী উন্মাদিনী গঙ্গার ও মহোচ্চ মূর্ত্তিতে দিগন্ত ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান বারণাবত পর্ব্বতের বিরাট দৃশ্যে। এ বিরাট দৃশ্যের মহিমা যুগযুগান্তে ফুরায় না, নিত্য দর্শনেও পুরাতন হয় না।

উক্ত বারণাবত পর্ব্বতে উত্তর-কাশীর অবস্থিতির কথা, উত্তর-কাশীতে উত্তরবাহিনী গঙ্গার কথা ও ঐ গঙ্গার সহিত অসি-বরুণার সঙ্গমের কথা স্কন্দপুরাণের কেদার খণ্ডে * যাহা উল্লিখিত আছে, এখনও তাহা প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। এখানে পরশুরামের তপস্যার কথা ও ধাতুময়ী

---

* যত্র ভাগীরথী পুণ্যা গঙ্গা চোত্তরবাহিনী।
সৌম্যকাশীতি বিখ্যাতা গিরৌ বৈ বারণাবতে।
অসী চ বরুণা চৈব দ্বে নদ্যৌ পুণ্যগোচরে।
যত্র ব্রহ্মাচ বিষ্ণুশ্চ মহেশশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
নিত্যং সন্নিহিতাঃ সন্তি মুক্তিক্ষেত্রে তথোত্তরে।
যত্রর্ষীণাঞ্চ স্থানানি আশ্রমাশ্চ তথা শুভাঃ।
যত্র মারকতীং ভাসং বিভর্ত্তেব সদাশিবঃ।
নিক্ষিপ্তা যত্র পূর্ব্বং হি সঙ্গরেচ সুরাসুরৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে তত্র শক্তির্ধাতুময়ী শুভা।
জমদগ্নিসুতো যত্র তপস্তেপে সুদুষ্করং।
তস্য ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সাবধানোঽবধারয়। ইত্যাদি।

স্কন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড।

মহাশক্তির অবস্থিতির কথা প্রভৃতি যাহা উক্ত আছে, তাহারও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য মূর্ত্তির সহিত পরশুরামের প্রাচীন মন্দির মধ্যস্থ মূর্ত্তি এবং অষ্টধাতুময় ত্রিশূলশক্তিও আমরা অবলোকন করিলাম। ত্রিশূল সম্বন্ধে পাণ্ডাদিগের মুখে এক অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনিলাম। তাঁহারা কহিলেন, বহুকাল পূর্ব্বে নেপাল-অধীশ্বর একবার এখানে অধিকার স্থাপন করিলে তাঁহার আদেশক্রমে গোরখা-সৈন্যেরা ঐ বিশ্বনাথের ত্রিশূল উৎখাত করিয়া নেপালে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বহু আয়াসে বহুদূর মৃত্তিকা ও পাষাণ খনন করিয়াও উহা উঠাইতে পারে নাই। তাই অষ্টধাতুময় ঐ বৃহৎ ত্রিশূল এস্থানে যথাপূর্ব্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহার উপরই আদি-শক্তির পূজা হইয়া থাকে।

আমরা যেমন এই কাশীকে উত্তর-কাশী বলিয়া থাকি, এখানকার পাণ্ডারা তেমনি আমাদের কাশীকে পূর্ব্ব-কাশী বলিয়া থাকেন। শাস্ত্রে ইহা সৌম্য-কাশী ও উত্তর-কাশী উভয় নামেই উল্লিখিত। সাধারণ লোকে ইহাকে বাড়াহাট বলে।

মন্দিরের মধ্যে একটী নূতন মন্দির এখানে সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি অনুসারে প্রসিদ্ধ হইয়াছে দেখিলাম। মন্দিরটী জয়পুর-রাজমহিষীর স্থাপিত। মন্দিরে অম্বামাতা প্রতিষ্ঠিতা আছেন, অন্যান্য অনেক দেবতারও ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মন্দির ও তাহার বিস্তৃত অঙ্গন এবং অঙ্গনের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ প্রভৃতি সকলই সুন্দর।

সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতি অনেকে এ তীর্থদর্শনে আসিয়া থাকেন, অনেক সাধুসন্ন্যাসী এখানে অবস্থানও করেন। বৈকালে ৺গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে ঐরূপ অনেকগুলি সাধুর সমাগম দেখিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলাম। হিন্দুস্থানী সাধু ভিন্ন একটী পরোপকারী মহাত্মা বাঙ্গালী সাধুও এখানে দেখিলাম। বিখ্যাত মহাত্মা সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীজীও অনেক সময় এখানে অবস্থিতি করেন।

১৫ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার।

মণিকর্ণিকার ঘাট আমাদের বাসার নিকট। অদ্যও ঐ ঘাটে স্নান করিয়া সকালে-সকালে অবশিষ্ট দেবদর্শন সমাপ্ত করিব ভাবিয়া স্নানে চলিলাম। ঘাটটী বাঁধানো, নিম্নভাগটা খানিক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ঘাটে স্রোত বিষম, কিন্তু স্রোতের জন্য তত কিছু নয়, শীতের জন্য স্নান দুষ্কর। গঙ্গোত্তরী এখান হইতে ৫০।৬০ মাইল মাত্র। সুতরাং তথাকার তুষারদ্রবময় গঙ্গাপ্রবাহ যে এখান পর্য্যন্ত নিতান্ত শীতল থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এখানে একটা কথা মনে পড়িল। আমাদের কোন সংস্কৃত কবি তাঁহার একটী কবিতায়, কোথাকার গঙ্গাপ্রবাহ শীতল, এই প্রশ্ন করিয়া সেই প্রশ্নেই সুকৌশলে তাহার উত্তর দিয়াছেন যে, কাশী-ক্ষেত্রের তল দিয়া যে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন, তাহাই শীতল। কবিতার সে অংশটুকু এই—কা শীতলবাহিনী গঙ্গা? উহাতেই উহার উত্তর এইরূপ—কাশী-তলবাহিনী গঙ্গা। কবিতাটীর সর্ব্বাংশই ঐরূপ প্রশ্নময় ও প্রশ্নেই উত্তরময়। তা হউক, আমার কথা এই যে কবি কাশীতল-বাহিনী গঙ্গার যে এইরূপ শৈত্যের কথা লিখিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই এখানকার এই উত্তর-কাশীর তলবাহিনী গঙ্গার সম্বন্ধে। অন্যত্র হইলে তাঁহার ঐ উত্তর বেশ সুসঙ্গত হইবে না।

যাহাহউক কষ্টেস্বষ্টে জলেস্থলে একরূপ স্নান সম্পন্ন করা গেল। স্নান-ঘাট হইতে আসিবার পথে কয়েকটী ফুলগাছ হইতে করবীর প্রভৃতি কতকগুলি ফুলও সংগ্রহ করা হইল। দেবদর্শনান্তে ঐ নির্ম্মল ফুল-জলে অদ্য পরিতোষের সহিত নিত্যপূজা নির্ব্বাহ করিলাম।

ভোজনান্তে অদ্য এখানে থাকা, না-থাকা সম্বন্ধে কথা উঠিল। কেননা, কাজ সারা হইলে আর সেখানে থাকা কেন, এ প্রশ্ন স্বতঃই উঠিয়া থাকে। আর তাহার দৃষ্টান্তও চক্ষুর উপর সর্ব্বদা বর্ত্তমান। দেখ না, এখানকার অত যাত্রীর মধ্যে কত লোকই চলিয়া গেল, আবার

থাকিলও অনেক, আসিলও অনেক। এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য? যদি না থাকা হয়, কতদুর গিয়া আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে? একজন কহিলেন, ২ মাইল দুরে একটা আশ্রয়স্থান পাইবার সম্ভাবনা। রাজা-সাহেবের একটা খালি কুঠী পড়িয়া আছে। তথায় গিয়া রাত্রি যাপন করা যাইতে পারে। দুই মাইল অগ্রসর হইয়া থাকা মন্দ কি? আবার চিন্তা হইল, দুই মাইল পথ বৈত নয়। বেশী কিছু লাভ নয়, আর বৃহস্পতির অপরাহ্ন, পক্ষান্তরে এ সকল প্রধান তীর্থ, ত্রিরাত্র না হইলেও দুই রাত্রি বাস অকর্ত্তব্য নহে। তবে এখন সকলের যে বিবেচনা।

এই সময়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সুতরাং বিবেচনা স্থির করিতে কাহারও আর কষ্ট পাইতে হইল না। সেদিন সেখানে থাকার ব্যবস্থা দেবতাই করিয়া দিলেন। সকলে বসিয়াই ছিলাম, এবার নিশ্চিন্ত হইয়া বসা গেল। খোলা বারান্দায় বসিয়া সম্মুখে সে বৃষ্টিকালীন দৃশ্য দেখিতে বড় সুন্দর বোধ হইল। নিরন্তর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিক্ যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। সম্মুখস্থ উচ্চশৃঙ্গ ও তাহার নিম্নবর্ত্তী শৃঙ্গের মধ্যভাগ হইতে কতকালের লুক্কায়িত ধূমরাশি বা বাষ্পরাশি যেন অনবরত উদ্গত হইতে লাগিল। যেন ১খানি মেঘ পাহাড়ের গায়ে ভর দিয়া আপন অবয়ব বিস্তার করিতে করিতে উঠিতেছে বোধ হইল। অন্ধকারের এমন আধিপত্যে আর কে প্রসন্ন থাকিতে পারে? স্বচ্ছ-সুন্দর গঙ্গাপ্রবাহের মূর্ত্তিও মলিন হইয়া আসিল। গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। ছাগলের সম্পূর্ণ-উন্মুক্ত অক্ষত ছালের খোলের মধ্যে বায়ুপূর্ণ করিয়া ভিস্তির আকারে পরিণত সেই বস্তুটা অবলম্বনে কতকগুলি লোক সাঁতার কাটিয়া সেই তরঙ্গোন্মত্ত গঙ্গার স্রোতে তীরবেগে ধাবিত হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে গিয়া উঠিতেছে। রাশিরাশি তক্তা, স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে ঐরূপ স্থানগুলিতে ঠেকিয়া দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা বহু আয়াসে ঐ তক্তার রাশি তথা

হইতে সরাইয়া পুনর্ব্বার প্রবল প্রবাহে ভাসাইয়া দিতেছে! জীবিকা নির্ব্বাহার্থ এমন দুর্দ্দিনেও দুর্ভাগ্যেরা জীবন সঙ্কট স্বীকার করিয়াছে! ক্রমে আর কিছুই সুস্পষ্ট দেখা যায় না, আকাশ আরও ঘোর হইয়া আসিল। পর্ব্বতগুলি এখন নিজ গাত্রোৎপন্ন বৃক্ষশ্রেণীর সহিত একত্র মিশিয়া নিবিড় অরণ্যাকারে দেখা যাইতে লাগিল! সে দিন আর কিছু দেখিবার বা বাহির হইবার সুযোগ হইল না।

মনেরির পথে।

১৬ই বৈশাখ।

পরদিন ১৬ই তারিখে প্রভাতে উত্তর-কাশী হইতে রওনা হওয়া গেল। সমতল স্থানটুকু শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। কোন কোন স্থানে কতকগুলি কলাগাছও দেখা গেল। ক্রমে পর্ব্বত ঘুরিতে ঘুরিতে এ কাশীও যে উত্তরবাহিনী, তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। আরও কিছুদূর যাইয়া দেখিলাম, একটা প্রবল নদী আসিয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে, বোধ হয় উহাই অসি হইবে। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড়ই বিভ্রাট্! নিকটেও দাঁড়াইবার স্থান নাই, ছুটিয়া গিয়াও শীঘ্র যে কোথাও আশ্রয়স্থল পাইব, তাহারও আশা নাই। তথাপি ছুটিতে ছুটিতে চলিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটু প্রশস্ত স্থানে রাস্তার ধারে একটা বাড়ী পাওয়া গেল। গত বৈকালে বাহির হইয়া যে কুঠীতে আসিয়া রাত্রিযাপন করার পরামর্শ হইয়াছিল, ইহা সেই কুঠী। আমরা ৪জন ও প্রায় ২০জন তীর্থযাত্রী হিন্দুস্থানী নর-নারী, আমরা সকলে বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেই বাড়ীর দরোজায় ও দরোজা হইতে অঙ্গন পার হইয়া কুঠীর কামরাগুলির সংলগ্ন যে লম্বা দালান আছে, তথায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে কয়েকটী চাকর ছিল, তাহারা সকলকে বলিল যে কুঠীতে মেম-

সাহেব আছেন, তোমরা একধার হইয়া দাঁড়াও। আমরা সেইরূপই দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, সম্প্রতি বৃষ্টি হইতে ত পরিত্রাণ পাওয়া গেল। কিন্তু আমাদের শব্দ পাইয়াই গৃহমধ্যস্থিত মেম-সাহেব ক্রোধে মার-মূর্ত্তি হইয়া, বিড়ালচক্ষু আরও পিঙ্গল বর্ণ করিয়া, আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! প্রথম উদ্যমে চাকরদিগের প্রতি অজস্র তিরস্কার বর্ষণ করিয়া পরক্ষণে আমাদিগের প্রতি সেই রুক্ষ, উগ্র, বিকট চিঁচিঁস্বরে "নিক্‌লো নিক্‌লো হিঁয়াসে,অভী নিক্‌লো! সাহাব্‌কে মকানমে ড্যাম্ নেটিব্? ইত্‌না মক্‌দুর তুম লোগোঁকা!" বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, আমরা সেই প্রবল বৃষ্টিতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। কানাচে একটু দাঁড়াইতেই মেমের চাকরেরা বলিল, আপনারা নিরাশ্রয় তীর্থযাত্রী বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু কি উপায়? মেমের চরিত্র দেখিতেই পাইতেছেন! আমাদের সঙ্গী হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষগুলি অগ্রেই সরিয়া পড়িয়াছিলেন।– অগ্রসর হইয়া বাহিরে সড়কের উপর যে ১ খানি খোলা দোচালা ছিল, তাহাতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঐ চালাখানি, তাঁহাদের দ্বারাই পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আশু আমাদের আশ্রয়স্থানের কোন উপায় নাই। বৃষ্টি ও বাদলা যে গতিকে আরম্ভ হইয়াছে, দিনমানের মধ্যে ছাড়িবে এমন লক্ষণ দেখা যায় না। কুঠীতে যে রায়বাঘিনী বর্ত্তমান, আমরা দ্বারে দাঁড়াইয়া মারা পড়িলেও সে যে একটু আশ্রয় দিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। অগত্যা আমাদিগকে বৃষ্টিতেই বাহির হইতে হইল। মনে ভাবিলাম, গত কল্য বৈকালে বাহির হইয়া যদি আমরা কল্যকার পরামর্শমত এখানে আসিয়া পঁহুছিতাম, তাহা হইলে সমস্ত রাত্রির বৃষ্টিতে নিরাশ্রয় আমাদিগের কি সর্ব্বনাশ হইত! ফলতঃ এই রাক্ষসীর মত মনুষ্যত্ববর্জ্জিত, নিতান্ত ঘৃণাস্পদ, নিষ্ঠুর চরিত্র কোন জাতীয় কোন স্ত্রীতেই আমরা কখনও দেখি নাই। পরে শুনিলাম, এ কুঠীতেও তাঁহার ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকার নাই। ইহা রাজা-সাহেবের খাসে আছে। পূর্ব্বে এই মোকাম কিছুকাল

একজন সাহেবের অধিকারে ছিল : তাঁহার অস্তে রাজা-সাহেব ইহার অদ্যাপি কোন বন্দোবস্ত না করিয়া এইরূপই ফেলিয়া রাখিয়াছেন। সাহেব হউক, নেটিভ হউক, যখন-তখন যে কোন যাত্রী-লোকই এখন এ স্থানে আশ্রয় পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ইয়ুরোপীয় লোক এইরূপে কোন স্থানে কোন গতিকে প্রবেশ করিতে পারিলে কি এক অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যবশতঃ সে স্থান তাঁহাদেরই হইয়া থাকে। তা পাহাড়েই কি, আর জলে-জঙ্গলেই কি, আর মরুভূমিতেই বা কি!

আমরা ভিজিতে ভিজিতেই দ্রুতপদে চলিলাম। কোথাও মাথা রাখিবার একটু স্থান নাই। পর্ব্বতপৃষ্ঠের কতক কতক অংশ কাটিয়াই সড়ক প্রস্তুত করা হইয়াছে, সড়কের উপরিভাগেই পর্ব্বতের অংশ কাটিয়া যাত্রীদিগের যাতায়াত নিরাপদ্ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং মাথা রাখিবার স্থানের সম্ভাবনা কি? কিন্তু কোন কোন স্থানে সড়কের ক্রোড়ে পর্ব্বতের দিকে যেন স্বাভাবিক এক আধটু গুহা আছে, কোথাও বা মাথার উপরে সড়কের দিকে পর্ব্বত একটু অঙ্গ বাড়াইয়া আছে, ঝড় বৃষ্টিতে তথায় নিরাশ্রয়ের অনেকটা আশ্রয় হয়। কিছুক্ষণ পরে আমরা ঐরূপ একটা স্থান পাইয়া তথায় দাঁড়াইলাম। আমাদের ন্যায় আরও কয়েকটী লোক তথায় আশ্রয় লইয়াছিল। তন্মধ্যে ১টী ১০।১২ বৎসর বয়স্ক সুন্দর ক্ষত্রিয়বালক ১টী কালসার-জাতীয় দুগ্ধপোষ্য হরিণ-শিশু লইয়া গহ্বরের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া কৌতূহলবশতঃ ঐ সম্বন্ধে বালকটীকে অনেক কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসার উত্তরে জানিতে পারিলাম, বালক নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের জঙ্গলে বাচ্চাটী পাইয়াছে; অদ্য ২০ দিন হইল, ছাগ-দুগ্ধ খাওয়াইয়া সে উহাকে লালনপালন করিতেছে। বাচ্চাটী ঘাস ধরিতে শিখিলে সে উহা রাজা-সাহেবকে ভেট দিয়া আসিবে, এই তাহার মনের ইচ্ছা। আবার আমি জিজ্ঞাসিলাম, মহারাজকে ভেট দিয়া তুমি কি পাইবে? বালক কহিল, পাইবার জন্য

নহে, আমাদের রাজা-সাহেব এই বাচ্চাটী পাইয়া খুসি হইবেন এবং কি করিয়া, কোথায়, আমি ইহাকে পাইয়াছি, আমার মুখে সমস্ত শুনিয়া কত আনন্দপ্রকাশ করিবেন, এইজন্য। শুনিয়া আমার হৃদয় আর্দ্র হইল। মনে করিলাম, ধন্য সেই রাজা, যাঁহার প্রজাদিগের প্রতি এইরূপ সন্তানবৎ উদার স্নেহভাব! আর ধন্য এই পাহাড়ী বালক-প্রজা, যাহার রাজার প্রতি এইরূপ পিতৃবৎ উন্মুক্ত, অকপট ভক্তিভাব! ঐ বালকের সঙ্গে কতকগুলি ছাগলও ছিল এবং ছাগলগুলি চরাইবার জন্য সঙ্গে এক জন রাখাল ছিল। বালক আর বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া চাকরটীকে ঐ ছাগলের পাল খেদাইতে কহিল এবং আমাদিগের পানে চাহিয়া কহিল, আপনারা আর এখানে কতক্ষণ থাকিবেন। দেবতার গতিক ভাল নয়। আগে ধর্ম্মশালা আছে, আর সেখানে আমাদের দোকান আছে, সব পাইবেন, চলুন। আমরা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। চলিতে চলিতে তাহাদের দোকানে আটার কি দর, চাউলের কি দর, ইত্যাদি জিজ্ঞাসিতে লাগিলাম। তাহাতে বালক কহিল, সে সব আমি কিছু জানি না। দোকানে লোক আছে, সেই সব জানে ও সব করে। বালকের কথার ভরসায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া কিছুক্ষণ পরে আমরা মনেরি-ধর্ম্মশালা পাইলাম ও বৃষ্টির উপদ্রব হইতে কোনরূপে মাথা রক্ষা করিতে পাইলাম। মনেরি উত্তর-কাশী হইতে ৯ মাইল পথ। এখানে আরও ১টী ধর্ম্মশালা আছে, সেটী প্রথমেই পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে দোকান নাই বলিয়া আমরা বালকের নির্দ্দেশমত এই দ্বিতীয় ধর্ম্মশালাতেই উপস্থিত হইলাম। আলু, চাউল, ঘি, এখানকার দোকানে পাওয়া গেল। গঙ্গাও নিকট ও অধিক নিম্নে নয়। স্নানাহ্নিকাদির কোন কষ্ট হইল না। তবে বৃষ্টিতে যে কষ্ট হইবার, সমস্ত পথ তাহা হইয়াছে ও ভোজনেরও সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। উপায়, কি আছে? তথাপি এই সঙ্কট পথে মাঝে মাঝে ৮।১০ মাইল অন্তর যে ধর্ম্মশালা ও দোকান আদি আছে, তাই

রক্ষা। আমাদের অদ্যকার দোকানটীতে আলু ৵১০ আনা সের ও চাউল ।০ আনা সের পাওয়া গেল। চাউল এদেশে সর্ব্বত্রই আতপ এবং চাউলের দর আটা অপেক্ষা সর্ব্বত্র বেশি। আলু সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া গেল, দিন বুঝিয়া, তাহাতে একপাকে খিচুড়ীই প্রস্তুত করা হইল। অপরাহ্নে ভোজন সম্পন্ন করিয়া এই সকল ধর্ম্মশালার স্থাপয়িতা মহাত্মাদিগকে ধন্যবাদ দিতে দিতে সে দুর্য্যোগের রাত্রি সেখানেই যাপন করা গেল।

কিন্তু দুঃখের উপর দুঃখ না হইলে তাহার নাম আর দুঃখ কি? দিনমান ধরিয়া সমস্ত পথ বৃষ্টিতে ভিজিয়া হাঁটিয়া আসায় রাত্রিতে আমার জ্বর বোধ হইল। বাঙ্গালীদিগের যতই গর্ব্ব থাকুক, কিন্তু কায়ক্লেশ-সহিষ্ণুতায় অন্য দেশীয়দিগের নিকট তাঁহাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। অন্য দেশীয় যাত্রীরা আমাদের তুলনায় প্রত্যহ কত বেশি হাঁটিতেছে, এমন কত ঝড় বৃষ্টি সহ্য করিতেছে, পিঠে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোঝা প্রত্যেকেই লইয়া চলিয়াছে, তাহাদের কিন্তু কথায় কথায় এমন জ্বর হয় না। কথায় কথায় কথা উঠে, "বাঙ্গালী লোক অতি সুকুমার হ্যায়!" কি লজ্জার কথা! আমরা কেন এমন সুকুমার হইয়া জন্মিয়াছি! কে আমাদের এমন হইতে শিক্ষা দিল? একটু রৌদ্রে বাহির হইলেই মাথা ধরে, একটু বৃষ্টিতে ভিজিলেই জ্বর হয়, একটু ঠাণ্ডায় বাহির হইলেই সর্দ্দি-কাসি, একটু হিম-ভোগেই নিউমোনিয়া, একটু গুরুপাক বা পুষ্টিকর দ্রব্য খাইলেই অম্ল অজীর্ণ উপস্থিত হয়! বাঙ্গালীর এমন অকর্ম্মণ্য, এমন অপটু শরীর কেন হইল!

—o—

ভাটোয়ারি।

১৭ই বৈশাখ।

আমি সহযাত্রী শ্রীমতীদিগের নিকট আমার জ্বরের কথা গোপন করিয়া জ্বরে অভিভূত অবস্থায় টলিতে টলিতে অগ্রসর হইয়াছি, অভিপ্রায় কোনরূপে অগ্রবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় পঁহুছিতে পারিলেই হয়। কিন্তু সম্বরণ-শক্তি নাই, তেমন কষ্টসহিষ্ণুতা নাই, সড়কে দুইবার পদস্খলন হওয়ায় দুইবারই নিম্নে পতনোন্মুখ হইয়াছিলাম। সঙ্গিনীরা খুব সাবধান করিতে লাগিলেন। তখন আমি আমার জ্বরের কথা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিলাম। কিন্তু তখন আর কি উপায় আছে? নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। যতই কষ্ট হউক, সেই অবস্থায়ই চলিতে হইবে। বহু কষ্টে, বহু বিলম্বে ৯ মাইল পথ হাঁটিয়া ভাটোয়ারি ধর্ম্মশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ভাটোয়ারির ধর্ম্মশালাটী উত্তম স্থানে স্থাপিত। গঙ্গার ঘাট নিকট, ঘাটে বিস্তর বড় বড় পাথর পড়িয়া আছে, গঙ্গার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সেই সকল পাথর কতক মগ্ন, কতক অর্দ্ধমগ্ন সর্ব্বদাই হইতেছে। তাহার উপর বসিয়া স্নানাহ্নিক করিবার বেশ সুবিধা, জল লইবারও বেশ সুবিধা। অসংখ্য যাত্রী সর্ব্বদা ঘাটে যাতায়াত করিতেছেন। এখানে যাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণ, যাঁহারা গঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া ফিরিবেন, তাঁহারা এখানে আসিয়াই কেদারনাথ যাইবার পথ পাইবেন। ধর্ম্মশালা এ সময় ঐ যাতায়াতকারী যাত্রিসমূহে সর্ব্বদাই পূর্ণ থাকে। আমরা কাঠের সিঁড়ি দিয়া ধর্ম্মশালার দ্বিতলে উঠিয়া একটা কুঠুরিতে জায়গা লইলাম। তথায় যেমন প্রবল বায়ু, তেমনি প্রবল শীত, আমার শরীর মুহুর্মুহুঃ কম্পান্বিত হইতে লাগিল। কোনরূপে সত্বরে শয্যা বিস্তৃত করিয়া আপাদমস্তক আচ্ছাদনপূর্ব্বক সেই শয্যাতে দিনরাত্রির

জন্ম আশ্রয় লইলাম। সঙ্গিনীরা নিম্নতলে গিয়া পাকের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মশালাটী পথ হইতে একটু নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত, অর্থাৎ একটু উপরে উঠিয়াই পথের ধারে দোকান ঘর। দোকান হইতে পাকের দ্রব্যাদি, গঙ্গা হইতে জল বালা যেমন আনিয়া থাকে আনিয়া দিল, আমি আর কিছু তত্ত্বাবধান করিতে পারিলাম না, আমারই তত্ত্বাবধান করা এখন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সঙ্গিনীরা তাহাতে যদিও কিছুমাত্র ত্রুটি করিলেন না, এবং দোকানদারটীও অতি ভদ্রলোক, মধ্যে মধ্যে সে আমাদের দেখাশুনা করিয়াছে, কিন্তু নিজ অদৃষ্টের ভোগ দূর করা অন্যের চেষ্টার আয়ত্ত নয়, সুতরাং আমার কষ্টভোগ চলিতেই লাগিল।

এই কষ্টের উপর আর এক কষ্ট, এই সময় টিহরী-রাজসরকারের এক কর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিলেন, আপনার সঙ্গের মালপত্র ওজন করিতে হইবে। মালের ওজন অনুসারে ও ঐ মাল লইয়া কুলী আপনার সঙ্গে যতদূর পথ যাইবে তদনুসারে আমাদের রাজসরকারের প্রাপ্য মাশুল আমরা এখানে কুলির নিকট আদায় করিয়া লইব। কুলীর সহিত আপনার যে মজুরি চুক্তি হইবে, তদনুসারে আপনাদের ঐ দেনা-পাওনার বাধ্যবাধকতাসূচক রসিদ দুই খণ্ডও আপনাদিগের দুইজনকে এখানে আমরা দিব। আমি জ্বরের যন্ত্রণার জন্য অদ্য ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অসামর্থ্য ও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কিন্তু কর্ম্মচারিটী তাহা শুনিবেন কেন? তাঁহার কাজ সারা হইলেই তিনি নিশ্চিন্ত, পরের অসুখ-বিসুখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত করিবার অবসর কোথায়? বালাও নিজের বোঝার একটা কিনারা হইলেই নিশ্চিন্ত হয়, সেই বা অপেক্ষা করিয়া উদ্বেগ ভোগ করিবে কেন? কর্ম্মচারীটীর ন্যায় সেও আমাকে কাতরভাবে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল, বাবুজী, একবার উঠিয়া বসিয়া কার্য্যটা শেষ করিয়া দেন। নিতান্ত বিরক্তির সহিত আমি

উহাতে সম্মতি দিলাম। মালপত্র ওজন হইয়া ১/০ মনই ঠিক হইল। গঙ্গোত্তরী, কেদার ও বদরীনারায়ণ দর্শন করাইয়া রামনগরের পথে যাইতে ঐ পথের মধ্যবর্ত্তী মেহলচৌরী নামক স্থান পর্য্যন্ত এই মালপত্র পহুঁছিয়া দিবে এই সর্ত্তে ৬৪৲ টাকা মজুরি চুক্তি হইল। কিন্তু আমরা রামনগরের পথ দিয়া ফিরিলে হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ আদি তীর্থস্থান ছাড় পড়ে বলিয়া পুনর্ব্বার হরিদ্বার দিয়া ফিরিব মনস্থ থাকায় মেহলচৌরীর পরিবর্ত্তে শ্রীনগর পর্য্যন্ত পহুঁছাইয়া দিবার সর্ত্ত বালাকে সমঝাইয়া দিয়া রসিদে তাহা লিখাইয়া লইলাম। মজুরির টাকার মধ্যে অদ্য এখানে ১৬৲ টাকা দিলাম, বুড়া-কেদারে ১৬৲ টাকা এবং অবশিষ্ট ৩২৲ টাকা কতক বদরী-নারায়ণে ও কতক শ্রীনগরে দিতে হইবে, ইহাও ঐ রসিদে লেখা থাকিল। উত্তর-কাশী, গঙ্গোত্তরী, কেদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থস্থলে বালার ইনাম বা পারিতোষিক ।০ আনা ও খিচুড়ীভোজন দিতে হইবে এবং কোথাও গিয়া ২।৪ দিন বিশ্রাম করিলে দৈনিক ।০ আনা করিয়া দিতে হইবে, ইহাই কেবল লেখা না হইয়া মৌখিক থাকিল। যাহাহউক ঐ রসিদের ১খণ্ড বালাকে ও ১খণ্ড আমার হস্তে দিয়া কর্ম্মচারীটী আমার সহিত বড়ই সৌজন্য আরম্ভ করিলেন। বালাকে শাসনবাক্যে কহিলেন, বাবুজীকে সমস্ত পথ বিশেষ যত্নপূর্ব্বক লইয়া যাইবে, পথের কোনস্থানে কোনরূপে উঁহাদের কোন কষ্ট হয়, তুমি সে সমস্তের জন্য দায়ী। পরে আমার জ্বরের সম্বন্ধে বলিলেন, আপনারা বাঙ্গালী, সুকুমার লোক, গাড়ী ঘোড়া ভিন্ন কখনও পথ চলা নাই, তাহার উপর একবারে অতিরিক্ত পরিশ্রম হইয়াছে, সেই সূত্রেই এই জ্বর, তা কোন চিন্তা নাই, অদ্য ভাত না খাইয়া খিচুড়ী খাইবেন, ইত্যাদি। শেষে কহিলেন, দেখুন, এই রসিদ দেওয়ার জন্য আমরা ৷৷০ আনা করিয়া পাইয়া থাকি, আপনি যাহাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমি কর্ম্মচারীজীর এতদূর সৌজন্য প্রকাশের অর্থ এতক্ষণে বুঝিলাম। যাহাহউক, তাঁহার আলাপ আপ্যায়িত

হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যত শীঘ্র শয়ন করিতে পারি, তাহাই আমার প্রার্থনীয় হইয়াছিল, সুতরাং সত্বরে তাঁহাকে ॥০ আনা দিয়া শয্যা-গ্রহণ করিলাম। বালাও তাঁহাকে মাশুল ৪৲ টাকা তৎক্ষণাৎ দিল, কি পূর্ব্বেই দিয়াছিল, এবং আর কিছু দিয়াছিল কিনা, জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এ দিন আমার অবস্থা বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল। রাত্রিও আমার অজ্ঞাতেই অবসান হইল।

জ্বরের জন্য আরও দুই দিন ভাটোয়ারিতে থাকা হইল। জ্বরের ঔষধ সঙ্গে ছিল না। স্থানীয় দোকানদারের নিকট দুই পুরিয়া অতি পুরাতন, পাণ্ডুবর্ণ একটু কুইনাইন ছিল, আমার অবস্থা দেখিয়া সে ব্যক্তি উহা আমাকে দিয়াছিল। তাহার নিকট আর ছিল না, থাকিলে দিত। যেটুকু দিয়াছিল, তাহার মূল্য কিছুতেই লইল না। লোকটী বড় ভদ্র। তাহার মুখে শুনিলাম, ঔষধ সেখানে পাওয়া যায় না, ঔষধের ব্যবহারও সেখানে নাই। কি করা যাইবে, ঐ কুইনাইন দুই পুরিয়াই সেবন করিলাম। কিন্তু জ্বর প্রায় লগ্নই থাকিত, জিহ্বা কর্কশ ও অপরিষ্কার ছিল, সুতরাং ক্ষুদ্র দুই পুরিয়া কুইনাইনে বা কয়েক দিন লঙ্ঘনে তাহা যাইবে কেন? জোলাপ না লইলেও বহু পরিমাণে কুইনাইন না খাইলে দেশে কখনও জ্বর যায় নাই। সে চির-অভ্যাস যাইবে কোথায়? দিন দিন নিজেই ক্ষীণ হইতে লাগিলাম, জ্বর কিছুমাত্র ক্ষীণ হইল না। অগত্যা কাণ্ডীওয়ালা ২ জন ডাকাইয়া পূর্ব্বোক্ত সরকারী কর্ম্মচারীটী দ্বারা তাহাদিগের সহিত ১৪৲টাকা মজুরি চুক্তিতে ২০শে বৈশাখ তারিখে আমি কাণ্ডীযোগে ভাটোয়ারি হইতে রওনা হইলাম, সঙ্গিনীরা যথাপূর্ব্ব পদব্রজে আসিতে লাগিলেন।

—০—

গাঙ্গনানী।

১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা গাঙ্গনানী ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। ধর্ম্মশালাটী মন্দ নহে, গঙ্গা নিকট, ঝরণাও নিকট। এখানে সদাব্রতও আছে, সাধুরা সদাব্রতের দ্রব্যাদি লইতেছেন দেখিলাম। কিন্তু ঐ দ্রব্যাদি বিতরণের ভার যাহার উপর আছে, সে লোকটী তেমন সরল প্রকৃতির নহে। আটা দিতেই চাহেন না, চা'ল যাহা দেয়, তাহা অর্দ্ধেক ধান্যপূর্ণ খুক্‌ড়ি চাল, আর কাঁচা মাসকলায়ের ডাল। কোন সদাব্রতে আমরা এ পর্য্যন্ত এরূপ অপকৃষ্ট দ্রব্য দিতে দেখি নাই। অবশ্য সদাব্রতধারীর যদি ঐরূপ ব্যবস্থাই থাকে, তাহা হইলে আমার এই সকল কথা উল্লেখ করিয়া নিন্দা করা নিতান্ত নীচাশয়ের ন্যায় কার্য্য করা হইতেছে বলিয়া বোধ হইবে। কেননা, হিমালয়ের এই দুর্গম সঙ্কটময় পথে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি নিজের শক্তি-সামর্থ্যমতে নিরাশ্রয় যাত্রীদিগের জন্য এইরূপ সদাব্রত চালাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মশীলতার কথা আর কি হইতে পারে? এবং এই কথা উল্লেখ করিয়া তাহার প্রশংসা করা ও তাহার জন্য কৃতজ্ঞ থাকাই যাত্রীদিগের পক্ষে সঙ্গত। ইহা জানিয়াও আমি এই জন্য পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি যে, দাতা ব্যক্তির ঐ সকল দেয় দ্রব্য সম্বন্ধে যদি অন্যরূপ ব্যবস্থা থাকে, অথচ কর্ম্মচারীর দোষে দ্রব্যাদির ঐরূপ নিকৃষ্টতা হয়, আমাদিগের এইরূপ আলোচনায় তাহার সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

এই ধর্ম্মশালার অদূরে গঙ্গার উপর ১টী ঝোলা আছে। তদ্দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া ১ মাইল উপরে উঠিলেই এক তপ্ত কুণ্ড পাওয়া যায়। উহা হইতে সর্ব্বদা গরম জল নির্গত হইতেছে। তথায় যাইলে ও তথাকার জল পান করিলে পীড়াদি দূর হয় শুনিলাম। কিন্তু তখন বায়ু প্রবল বহিতেছিল, ঝোলায় পার হওয়া আমাদের সাধ্য নহে। সঙ্গের কুলীও

এই পথ হাঁটার পর আর হাঁটিতে সম্মত নহে। ঈশ্বরেচ্ছায় একটা পাহাড়ী লোক পাওয়া গেল, সে ৵১৫ পয়সা লইয়া ২ লোটা ঐ কুণ্ডের জল আনিয়া দিল। তখনও ঐ জল খুব গরম আছে। জলে একটু গন্ধ বোধ হইল। যাহা হউক, ঐ জল পানে আমার পীড়ার কোন উপকার হয় নাই।

———০———

ঝালার পথে।

২১শে বৈশাখ, বুধবার, দশমী।

গাঙ্গনানী ধর্ম্মশালা হইতে আমরা প্রভাতেই রওনা হইয়াছি। আমি জ্বরে অভিভূত অবস্থায় কাণ্ডীতে চলিয়াছি, দেবীত্রয় যথাপূর্ব্ব পদব্রজেই চলিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আবার দ্বিতীয়া শ্রীমতী কিছু অধিক অশক্তা। বিশেষতঃ পূর্ব্বে পাকদাণ্ডির পথে তিনি পায়ে আঘাত পাইয়াছেন। তিনি সকলের সঙ্গে সমান চলিতে পারিবেন না, ইহা নিজেই বিবেচনা করিয়া অদ্য সকলের অগ্রেই তিনি রওনা হইয়াছেন। প্রথমা যদিও সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে প্রবীণা এবং দেখিতেও অসমর্থার ন্যায়, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি সকল হইতে অধিক সমর্থা। তিনি স্বপাকে আহার করেন, সুতরাং তিনিই আমাদিগকে এপর্য্যন্ত আহার করাইয়া আসিতেছেন। শৌচ আচার তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। কোথাও গোময় পাওয়া যায় না যায়, পথে যাইতে যাইতেই তিনি তাহার সন্ধান করেন এবং সংগ্রহ হইলেই শুষ্ক গোময় ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া লয়েন। শীত যতই হউক, প্রত্যূষে একবার স্নান তাঁহার চাইই, তার পর অবসরমত ও আবশ্যকমত হইয়া থাকে। হাজার অসুখেও তিনি আপন আচার-নিয়ম বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করেন না, অথচ সকলের সঙ্গে প্রত্যহ সমান হাঁটিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যের অধিক পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

তৃতীয়া শ্রীমতী শক্তি-সামর্থ্যে তত বেশি না হউন, সকল কার্য্যেই অগ্রসর, সকল কার্য্যে নিপুণাও বটেন, কিছু ব্যস্ত সমস্ত। কাজে হাত দিলে কাজ পড়িয়া থাকে না। কিছু স্পষ্টবাদিনী, কাহারও খাতির নাই। রাগের কারণ হইলে রাগ চাপিয়া রাখিতে পারেন না। এজন্য বয়সে কনিষ্ঠা হইলেও, সকলে তাঁহাকে একটু মানিয়া চলেন। যাহাহউক, আজ হিন্দুস্থানী যাত্রীদের রওনার পরই দ্বিতীয়া শ্রীমতী রওনা হইয়াছেন। হিন্দুস্থানীরা প্রতিদিন সর্ব্বাগ্রেই রওনা হইয়া থাকেন। আমরা ৩ জনে সকলের পশ্চাতে পড়িয়াছি। আমরা ২॥০ মাইল আসার পর সড়কের ধারে এক ধর্ম্মশালা পাইলাম। এখানে গঙ্গার ঘাট খুব নিকট বলিয়া আমাদের কাণ্ডী ও বোঝাওয়ালারা রুটী পাকাইতে বসিল। এই অবসর পাইয়া প্রথমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী এখানে স্নানাহ্নিক সারিয়া লইলেন। আমার স্নান-ভোজন নাই, যেখানে স্থিরতর আড্ডা লওয়া হইবে, সেখানেই আহ্নিক সারিয়া লইব, আপাততঃ জ্বরের ক্লেশে ধর্ম্মশালার সাধারণ শয্যার উপরে, কখনও বা ভূমির উপরে গড়াগড়ি করিতে লাগিলাম।

ঝাঁপা ও কাণ্ডীওয়ালারা অতি লঘুহস্ত। শ্রীমতীদ্বয়ের স্নানাহ্নিকের পূর্ব্বেই তাহাদের রুটী তৈয়ারি ও ভোজনকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। এখন আমরা বিবেচনা করিলাম, দ্বিতীয়া শ্রীমতী এখানে আসিয়া যখন বিশ্রাম করেন নাই, আর কেনই বা করিবেন, প্রভাতে ২॥০ মাইল মাত্র পথ আসিয়া আমরা কখনই বিশ্রাম করি না, তাহা তিনি জানেন, নিশ্চয় তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। কেননা, ইহাই একমাত্র সড়ক, অতএব আমাদের অগ্রসর হওয়াই উচিত। সকলেরই সেই মত হইল। ভারবাহকেরা আমাদের মতামতেরও অপেক্ষা করিতে না দিয়া আমাদিগকে লইয়া সত্বর অগ্রসর হইল। এইরূপে আরও ৩।৪ মাইল চলা হইয়া গেল। এ দিকে গঙ্গাগর্ভ ক্রমে বিস্তীর্ণ হইতেছে, দূর হইতে দেশের গঙ্গার মত বোধ

হইতেছে। গ্রীষ্মকালে যেমন হইয়া থাকে, গঙ্গার শুভ্র চর জাগিয়াছে; দুইপার্শ্বে পর্ব্বতও একটু দূর দিয়া চলিয়াছে। এইরূপে গঙ্গাগর্ভ ক্রমে প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু ধারা ক্রমে ক্ষুদ্র হইতেছে। চরে বালি কম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ নুড়ির রাশি অবিরলে যেন সাজানো হইয়া পড়িয়া থাকায় দূর হইতে বালির চর বলিয়া ভ্রম হইতেছে। এইরূপ পথ দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। কাণ্ডী ও বোঝাওয়ালাদের, পথ যাহাতে সংক্ষিপ্ত হয়, সেইদিকেই দৃষ্টি, সেইজন্য এই সময়ে তাহারা উপরের সড়ক ত্যাগ করিয়া গঙ্গাগর্ভের পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে যে কত অন্যায় কাজ হইয়াছিল, তাহা কিঞ্চিৎ পরেই প্রকাশ পাইবে।

উপরের সড়ক দিয়া চলিলে মধ্যে সুকি-নামক ধর্ম্মশালা পাওয়া যাইত; তাহা না হইয়া আমরা বরাবর গঙ্গাগর্ভস্থ নিম্নপথ দিয়া চলিতে থাকায় উহা পাইলাম না। ঐ নিম্নপথ বাহিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে একস্থানে কিছু উপরে উঠিয়া ঝালা নামক গ্রাম প্রাপ্ত হইলাম। সকলেই ক্ষুধার্ত্ত, অসময় হইয়া গিয়াছে, আর চলা যাইতেছে না, বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু ধর্ম্মশালা নাই, ১খানি দোকান মাত্র আছে। দোকানী জায়গা দিতে চাহিল; সেখানে আটা, আলু ও গুড়ও পাওয়া যাইত। আপাততঃ জলযোগের জন্য ।০ আনা দিয়া /১ সের আখরোটও কেনা হইল। কিন্তু দ্বিতীয়া শ্রীমতীর দেখা নাই। আমরা তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় দোকানী কহিল, আমি উপরে সড়কের ধারে ইতিপূর্ব্বেই এক মায়ীকে দেখিয়াছিলাম, নীচে আমার দোকানে আসিতে তাঁহাকে অনুরোধও করিয়া ছিলাম, তিনি তাহা আসেন নাই। পরে ধর্ম্মশালাও দেখাইয়া দিয়াছিলাম, তিনি তাহাও থাকিলেন না, আমার কোন কথা না শুনিয়া বা না বুঝিয়া সড়ক ধরিয়া চলিয়াই গেলেন। আমরা ভাব-ভঙ্গিতে বুঝিলাম, তিনিই আমাদের সঙ্গিনী দ্বিতীয়া শ্রীমতী, আমাদের দেখা না পাইয়া কোথাও স্থির হইতে না পারিয়া হতাশচিত্তে ক্রমাগতই চলিয়াছেন।

আমাদের নীচের পথ দিয়া চলা বড়ই অন্যায় হইয়াছে বুঝিলাম। কিন্তু সে অন্যায় অধিকাংশই আমাদের কুলী ও কাণ্ডীওয়ালার গতিকে হইয়াছে, কতক আমাদের অপরিণামদর্শিতার দোষেও হইয়াছে। এখন আর তাহা ভাবিলে কি হইবে? সত্বর দোকান হইতে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইলাম। গ্রামের মধ্য দিয়া উঠিয়া সড়কের নিম্নেই ঝালা-ধর্ম্মশালা পাইলাম। গাছপালার মধ্যে উত্তমস্থানে ধর্ম্মশালাটী স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহা অত্যন্ত বে-মেরামত। বৃষ্টি আসিলে দাঁড়াইবার উপায় নাই। তন্ন তন্ন করিয়া ধর্ম্মশালার প্রত্যেক ঘর খুঁজিয়া তথায় শ্রীমতীকে না পাইয়া আরও দ্রুতপদে সকলে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদুর আসিয়াই দুর হইতে দেখা গেল, শ্রীমতী দীনহীনার ন্যায় নৈরাশ্য-কাতরচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে রাস্তায় চলিয়াছেন। অবিলম্বে আমরা নিকটস্থ হইয়া তাঁহার তৎকালীন শোচনীয় অবস্থা দর্শনে বড়ই দুঃখিত ও অপ্রতিভ হইলাম। তিনি আমাদের জন্য অজ্ঞাত পথে পথে কত স্থানে কত খুঁজিয়াছেন, কত লোককে আমাদের কথা জিজ্ঞাসিয়াছেন, কোথাও কোন সন্ধান না পাইয়া একাকিনী হতাশ হইয়া কত জায়গায় বসিয়া অপার ভাবনা ভাবিয়াছেন, আবার তখনি উঠিয়া, আমরা তাঁহাকে ফেলিয়া গিয়াছি বিবেচনায় অধীর পদে অগ্রসর হইয়াছেন, এই সকল কষ্টের কাহিনী এত করুণা করিয়া ও এত অভিমানের সহিত বিবৃত করিতে লাগিলেন যে আমরা তাঁহাকে বুঝাইয়া উঠিতেও অবসর পাইলাম না। তাঁহার রোদনে আমাদের সব কথা ভাসিয়া গেল, আমরা আমাদের দোষই স্বীকার করিয়া কোনরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম। ফল কথা, আমাদের দেখা পাইয়া তিনিও যেন প্রাণ পাইলেন, আমরাও দুর্ভর দুশ্চিন্তাভার হইতে মুক্ত হইলাম। অন্য কষ্ট আর তখন কষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। আরও কতকদূর অবিরামে চলিয়া হরশিল নামক ধর্ম্মশালা পাওয়া গেল। অদ্য ১২ মাইল পথ হাঁটা হইয়াছে। হাঁটিতে হাঁটিতে বেলা অপরাহ্ন

হইয়া গিয়াছে। কষ্টেরও একশেষ, কেহ জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই। যাহাহউক, ধর্ম্মশালা পাইয়া প্রাণ রক্ষা হইল। অসময়ে কষ্টস্বষ্টে একরূপে পাকাদি সম্পন্ন করা হইল ও তাহাই তৃপ্তিপূর্ব্বক সকলে ভোজন করিলেন। কষ্টস্বষ্টে কেন, না নীচে-তলায় যাত্রীদের পাকধূমে উপর পর্য্যন্ত ধূমান্ধকার হইয়াছিল। তথাপি তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতে হইল, কেন না, পরদিন একাদশী। আর আমার ত কয়েক দিন হইতেই একাদশী চলিয়াছে।

তা হউক, কিন্তু স্থানটী যে অতি সুন্দর, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যেমন নিকটে ও সমতলে গঙ্গা, তেমনি অন্যদিকে প্রবাহিত প্রবল ঝরণা, যেন ধর্ম্মশালাটীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সুন্দর সমতল ভূমি, বহুদূর ব্যাপিয়া ছায়াময় বৃক্ষশ্রেণী, তাহাতে পাহাড়ও যেন ঢাকা পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিকে হরিত-শ্যামকান্তি, স্থানটীকে অপূর্ব্ব সুস্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আরও এক কথা, শুধু এইটুকু স্থান কেন, হরশিলের কিছু পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া, হরশিল অতিক্রম করিয়াও কিছু দূর পর্য্যন্ত স্থান এইরূপ সুন্দর। এই গঙ্গা-তটভূমি গঙ্গা হইতে অল্প উচ্চ, প্রায় সমতল ও বিস্তৃত, তাহাতে নিরন্তর দেবদারুবন অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! দেখিলে বোধ হয়, গাছগুলি স্বয়ংজাত নহে, কেহ যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করিয়া কেবল দেবদারুর উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছে। কি সুন্দর সতেজ বৃক্ষগুলি, সুকোমল সবুজবর্ণমণ্ডিত শাখা ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে ২।৩ হস্ত অন্তর থাকে-থাকে প্রসারিত করিয়া সরল-উন্নতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! শাখার পল্লব আম-কাঁঠালের পত্রাবলীর ন্যায় ঘন বা বৃহদাকৃতি নহে, সূক্ষ্ম শলাকার ন্যায় কতকগুলি করিয়া একত্র নিবিড়-ভাবে থাকায় দূর হইতে জটাবদ্ধের মত বোধ হয়। বড় বৃক্ষগুলির নিম্নের শাখা নাই, উপরভাগে ঐরূপ নিবিড় শাখায় আকীর্ণ থাকিলেও তলভাগে আলোকের অভাব নাই এবং শীর্ণ-পতিত ঐরূপ সূক্ষ্ম পত্ররাশিতে তলভূমি

আকীর্ণ থাকিলেও তেমন অপরিষ্কার বোধ হয় না। অধিকন্তু বৃহত্তম বৃক্ষগুলির পবিত্র নির্য্যাসগন্ধে সমস্ত বনভূমি সর্ব্বদা আমোদিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বেগবান্ নির্ম্মল-ধারাবাহী নির্ঝরেরও অভাব নাই। ফলতঃ এই পবিত্র কাননভাগ দর্শন করিলেই মর্ম্মজ্ঞ দর্শকের চিত্তে কৈলাসের আভাস উদিত হইবে এবং কৈলাসনিকেতনের ও সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসনাথের সেই দিব্য বর্ণনা স্মরণপথে পতিত হইবে—

গিরীন্দ্রশিখরে রম্যে নানারত্নোপশোভিতে।
নানাবৃক্ষলতাকীর্ণে নানাপক্ষিরবৈর্যুতে।
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমামোদ-মোদিতে সুমনোহরে
শৈত্য-সৌগন্ধ্যমান্দ্যাঢ্য-মরুদ্ভিরুপবীজিতে।
অপ্সরাগণসঙ্গীত-কলধ্বনিনিনাদিতে।
স্থিরচ্ছায়-দ্রুমচ্ছায়াচ্ছাদিতে স্নিগ্ধ-মঞ্জুলে।
মত্ত কোকিল সন্দোহ-সংঘুষ্ট বিপিনান্তরে।
সর্ব্বদা স্বগণৈঃ সার্দ্ধং ঋতুরাজ-নিষেবিতে।
সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্ব-গাণপত্যগণৈর্বৃতে।
তত্র মৌনধরং দেবং চরাচরজগদ্‌গুরুং।
সদাশিবং সদানন্দং করুণামৃতসাগরং।
কর্পূর-কুন্দধবলং শুদ্ধসত্ত্বময়ং বিভুং।
দিগম্বরং দীননাথং যোগীন্দ্রং যোগিবল্লভং।
গঙ্গাশীকরসংসিক্ত-জটামণ্ডল-মণ্ডিতং।
বিভূতি-ভূষিতং শান্তং ব্যালমালং কপালিনং।
ত্রিলোচনং ত্রিলোকেশং ত্রিশূলবরধারিণং।
আশুতোষং জ্ঞানময়ং কৈবল্য-ফলদায়কং।
নির্ব্বিকল্পং নিরাতঙ্কং নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনং। ইত্যাদি।

বাস্তবিক, ইহাই কি কৈলাসভূমি—দেবদেবের অধিষ্ঠান-স্থান? নতুবা বাহিরে ইহার দিব্য প্রভাব অব্যক্ত থাকিলেও ভিতর হইতে যেন তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে বলিয়া অনুভব হইবে কেন? এস্থানে

আসিয়া অন্তঃকরণ এত প্রসন্ন হইবে কেন? এস্থানের নামই বা হরশিল বা হর-শৈল হইবে কেন? ফলতঃ এস্থানের দিব্যভাব লুকাইয়াও যেন ঢাকা পড়িতেছে না! এবং কানন-ভূমির এরূপ মোহন ও পাবন দৃশ্য আর কোথাও আমি দেখি নাই।

এইস্থানে শিকারী সাহেবদিগের নিমিত্ত কুঠী ও তৎসংলগ্ন সুন্দর ১টী বাগান রাজাসাহেব প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সাহেবেরা সময়ে সময়ে এখানে পদার্পণ করিয়া থাকেন।

—o—
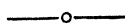
ধরালী।

২২শে বৃহস্পতিবার।

অদ্য একাদশী। গতকল্য দ্বিতীয়া শ্রীমতী পথে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার জন্যও কাণ্ডী বন্দোবস্ত করা হইল। ধর্ম্মশালার নিকটে গঙ্গার উপর কাঠের পুল আছে। তদ্দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া অপর পার দিয়া রাস্তা পাওয়া গেল। দেবদারুবনমধ্যস্থ ঐ রাস্তায় অদ্য আমরা পরস্পর কেহ কাহারও তফাৎ না থাকিয়া এক সঙ্গেই চলিয়াছি। ২মাইল পথ চলা হইলে ধরালী নামক ধর্ম্মশালা পাওয়া গেল। পার্শ্বে শ্রীকণ্ঠ নামক পর্ব্বত হইতে একটী ধারা, যাহাকে দুধগঙ্গা বলে, ঐ ধারা নামিয়া আসিয়া এই স্থানের গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থলে ২টী প্রাচীন শিবমন্দির আছে, মন্দিরদ্বয়ের মধ্যে বাঁধা ঘাট। আশে পাশে কয়েকটী ফুলগাছ আগা-গোড়া ফুলে ভূষিত হইয়া স্থানটীকেও ভূষিত করিয়াছে।

যে মন্দিরের কথা বলা গেল, উহার অভ্যন্তরে জলময়গর্ভে ২টী শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছে। মন্দিরের নিম্নেই গঙ্গা ও তাহার প্রশস্ত চর। গঙ্গার অপর পারে পর্ব্বতগাত্রে গঙ্গোত্তরীর পাণ্ডাগণের বাসস্থান। উহার

নাম মুখবা-মঠ। অনুমান উহার ১ মাইল দূরে গঙ্গামাতার মন্দির। শীতের ৬ মাস গঙ্গামাতার পূজা ঐ মন্দিরেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং পাণ্ডাগণ ঐ কয়েক মাস নিজ বাসস্থান মুখবা-মঠে বাস করেন। শ্রীমতীদিগের স্নানাদি হইলে আমরা সকলে দেবদর্শন করিয়া রওনা হইলাম।

—o—

জাংলা।

ধরালী হইতে ৩ মাইল আসিয়া জাংলা নামক স্থানে গঙ্গার পুল পার হওয়া গেল। পারে আসিয়া দেখিলাম, এস্থানে যাত্রীদিগের উপযুক্ত কোনরূপ আশ্রয় বা দোকান নাই, কেবল রাজাসাহেবের ১টী কুঠী আছে। বোধ হয় রাজাসাহেবের জঙ্গলবিভাগের ঐটী বাঙ্গলা হইবে! ঐ স্থানে আশ্রয় লওয়া যায় কি না বিবেচ্য। কিন্তু অসময় হইতেছে, আর বৃষ্টিও আরম্ভ হইল দেখিয়া অন্যরূপ বিবেচনার অবসর হইল না। জনশূন্য কুঠীতেই আশ্রয় লইতে হইল। কিয়ৎকাল পরে কুঠীর রক্ষক আসিয়া একটু তেরি-মেরি করিলেও সে হিন্দুলোক ও পাহাড়ী, দুকথা বলিয়া তাহাকে রাজি করা গেল। বেশ নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থান বলিয়া বাদলার দিনে সেখানে কোন কষ্ট হইল না, বরং উত্তমরূপে আগুন করিয়া দুরন্ত শীতেও আরামের সহিত সে দিনরাত্রি তথায় বাস করা গেল।

—o—
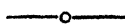
ভৈরবঘাটী।

২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার, দ্বাদশী।

অদ্য প্রভাতে ঝরণার জলে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রীমতীরা দ্বাদশীর পারণ জলযোগ মাত্র করিয়া লইলেন, এখানে অন্য কিছু মিলিবার

উপায় নাই। সত্বরে সকলে দ্রুতপদে রওনা হইলেন। ডাংলা কুঠী হইতে ৪ মাইল পথ অতিক্রমের পর ভৈরবঘাটীর ভয়ঙ্কর উচ্চ পুল পাওয়া গেল। নীচের রাস্তা দিয়া আসিলে নীচের রাস্তায়ও এক পুল আছে, তাহাতে কোন ভয় নাই। কিন্তু কাণ্ডীওয়ালারা সঙ্ক্ষিপ্ত পথই খুঁজে। সুতরাং সেই সঙ্ক্ষিপ্ত উচ্চপথে অতি উচ্চে যে ভয়াবহ অপ্রশস্ত কাঠের পুল আছে, তাহা দিয়াই আমরা সশঙ্কে একে একে পার হইলাম। যদিও হাত দিয়া ধরিবার জন্য দুই ধারে লম্বা তার আছে, কিন্তু পুলের উপর উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেই উহা দুলিতে থাকে বলিয়া একে একে সতর্কে পার হইতে হয়। কিন্তু একাই হউন, আর সতর্কই হউন, দূর নিম্নে কল্লোল-কোলাহলে ধাবমানা গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই চক্ষুঃ স্থির! কি উপায়? সকলেই সেইরূপে পার হইতেছে, আমাদিগকেও পার হইতে হইল। তথাহইতে আরও কিছুদূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভৈরবঘাটী-ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে ভৈরবজীর এক মন্দির আছে। মন্দিরের সম্মুখে অনেকটুকু সমতল স্থান ও সেই স্থান উচ্চ উচ্চ বৃক্ষছায়ায় সমাকীর্ণ। দেবদর্শনান্তে পাকের উদ্যোগ হইল। পাকের দ্রব্যাদি যাহাই মিলুক, কিন্তু জলের এখানে বড়ই কষ্ট। জলের নল কোন্ পুণ্যাত্মা করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু নলের একস্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উক্ত ব্যক্তি আর তাহার মেরামতে মনোযোগ করেন নাই। পাণ্ডারা যাত্রীদিগের নিকট সাহায্য সংগ্রহ করিয়া ঐ নলের পুনঃ স্থাপনে সচেষ্ট আছেন। তাঁহারা সহায্যের খাতা দেখাইলেন। অনেক ধার্ম্মিক যাত্রী উক্ত সাহায্যে কিছু কিছু দিয়াছেন দেখিলাম, এবং আমরাও তদর্থে ৪৲ টাকা দিলাম। দূরস্থ ঝরণা হইতে নির্ম্মল জল আসিলে এস্থানে আর কোন কষ্ট নাই। বরং চতুর্দ্দিকে বড় বড় বৃক্ষের ঘন ছায়ায় আচ্ছন্ন, তপোবন-প্রায়, প্রশস্ত স্থানটী মনোরমই বলিতে হইবে। আশ্রয়ের স্থান অধিক নাই, তথাপি ঘরে, বাহিরে,

ভৈরবজীর অঙ্গনে বহু সাধু-সন্ন্যাসী এখানে পাক ভোজন করিয়া রওনা হইলেন। আমিও ভৈরবজীর মন্দিরের সম্মুখস্থ উচ্চ ভূমিতে গড়াগড়ি করিতে লাগিলাম। আমার আর এক বিড়ম্বনা অদ্য উপস্থিত। জ্বর যাহা আছে, অবিরামে তাহা আছেই এবং তাহার জন্য যে যন্ত্রণা, ক্রমাগত উপবাসের জন্য যে ক্ষীণতা, সে সকলও পূর্ব্ববৎই আছে। ইহার উপর এই হইয়াছে যে গতকল্য কাণ্ডীওয়ালারা পথের মধ্যে মধ্যে যে বিশ্রাম করে, তাহাদের সেই বিশ্রামাবসরে পথের একস্থানে আমি পদব্রজে দুই চারি পা অগ্রসর হইয়াছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে, অলক্ষ্যপ্রায় ক্ষুদ্র একটী ঝরণার জলে সেই স্থানটী সিক্ত ছিল। কয়েকদিন নিয়ত কাণ্ডীতে যাওয়ার পর আমিও যেমন সাধ করিয়া ২।১ পা বেড়াইতে গিয়াছি, সেই জলসিক্ত দুর্ব্বাময় গড়ান রাস্তায় আমার দুর্ব্বল পা পিছলাইয়া পড়িয়া মোচড়াইয়া গেল, দাড়ির জুতার উপরদিকে কাদামাখা হইল, কোনক্রমে আমি একবারে পড়িয়া গেলাম না মাত্র। ব্যাপারটা তখন আর কাহাকেও বলিলাম না। অদ্য ভৈরবঘাটীর ধর্ম্মশালায় পাক-ভোজনান্তে সকলে যেমন রওনা হইতেছেন, আমরাও তেমনি রওনা হইব, কিন্তু এখন আমার পা এত ফুলিয়াছে ও মোচড়ান পায়ের পাতার উপর এত বেদনা হইয়াছে যে তাহার উপর ভর দিয়া আর দাঁড়াইবার যো নাই। দাঁড়াইবার জন্য বারবার বিফল চেষ্টা করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইলাম। একি সর্ব্বনাশ! এত কষ্ট সহিয়াও নিত্য অগ্রসর হইতেছি, এত নিকটে আসিয়াছি, আর ৬ মাইল অতিক্রম করিতে পারিলেই গঙ্গোত্তরী, তাই তাড়াতাড়ি করিয়া সহযাত্রী সকলে অগ্রসর হইতেছেন, আজ সকলের সাধ পূর্ণ হইবে, আজ আমার এই দশা হইল! এখন কি উপায়? কিন্তু কাণ্ডীওয়ালারা অবস্থা দেখিয়াও আর বিবেচনার অবসর দিল না, ধরাধরি করিয়া সত্বরে আমায় কাণ্ডীতে বসাইয়া দিল। সকলেই আমরা রওনা হইলাম। আমার পায়ের কন্-

কনানি ক্রমেই বেশি হইতে লাগিল। তাহার শঙ্কায় জ্বরও আজি খুব বাড়িয়া গেল। কিন্তু সে জ্বরের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র নাই, পায়ের যন্ত্রণাই অসহ্য হইয়া উঠিল ও তাহাতে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলাম। যন্ত্রণা নিবারণের কোন উপায় নাই। কাণ্ডী হইতে নামিবার চেষ্টা হইল, নামিতেও প্রাণান্তকর কষ্ট। কে কোলে করিয়া ইচ্ছামত নামাইবে? নামাইয়া দিলেও পায়ে ভর দিবার একবারেই যো নাই! আর নামিয়াই বা কি হইবে? এ ৬ মাইলের মধ্যে বিশ্রামস্থান নাই। রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে হইবে। পাহাড়ের রাস্তায় স্থানই বা কোথায়? সময়ও অপরাহ্ন, বেগে বায়ু বহিতেছে, পদে পদে বৃষ্টির সম্ভাবনা হইতেছে, অপরাহ্নের মেঘ অন্ধকার করিয়া আসিতেছে, প্রবল শীতে সর্ব্বশরীর কম্পান্বিত হইতেছে! তাহার উপর পিপাসার কষ্ট। ঝরণার আশায় লালায়িত হইতেছি। মাঝে মাঝে ঝরণা দেখিলেই জোর করিয়া নামিয়া পড়িতেছি, জল খাইতেছি ও ধুলায় গড়াইতেছি। পিপাসার যন্ত্রণা ক্ষণেকের জন্য যাইতেছে, কিন্তু পায়ের যন্ত্রণার কোনরূপ উপশমই হইতেছে না। একবার নামিয়া যথায় বেদনা সেই স্থানে, পায়ের পাতায়, পায়ের তলার নীচে হইতে ফের দিয়া, পট্টিদ্বারা হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত স্থান উত্তম করিয়া বাঁধিয়া দিলাম, তাহাতেও যন্ত্রণার অবসান নাই। পা ঝুলিয়া থাকাতে যন্ত্রণা উপশমের কোন উপায়ই হইতেছে না। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছি, একবার নামাইয়া দেও বলিয়া কাণ্ডীওয়ালাদিগকে কতই মিনতি করিতেছি, তাহারা জোর করিয়া আমাকে লইয়া চলিয়াছে। না লইয়া গিয়াই বা কি করে? কয়েকবার তাহারা ঐরূপ অনুনয় বিনয়ে নামাইয়া দিয়া দেখিয়াছে, নামিলে আমি আর উঠিতে চাহি না। এদিকে রাত্রি আসন্ন, বৃষ্টিরও পূর্ব্ব লক্ষণ, পথ উৎকট ও নিরাশ্রয়, আড্ডা লইতে না পারিলে কোন উপায়ই নাই। স্ত্রীলোকেরা অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছেন, নিরুপায়-নৈরাশ্যে আমারও দুই চক্ষে কতই ধারা

বহিতেছে! সেই ধারার সহিত কতই ডাকিয়াছি, "গুরুদেব, গুরুব্রহ্ম, এ কি করিলে! দুঃখ দূর কর দেব, আর যে সহ্য হইতেছে না! কোথায় আছ, একবার চাহিয়া দেখ! মহাতীর্থে আসিয়া চলৎশক্তি রহিত হইলাম, মল-মূত্রশৌচ-উপায় বর্জ্জিত হইলাম!" গভীর কাতরতার সহিত এইরূপ পরিদেবনা করিতে করিতে, অলক্ষিতে সেই বিশ্বপাবন মহাতীর্থে উপনীত হইলাম। পাণ্ডারা উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ১টা কুঠারি স্থির করিয়া দিলেন ও আমার অবস্থা শুনিয়া কেহ গরম জলের সেক, কেহ নানা দ্রব্যের প্রলেপ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে আমার শয্যা প্রস্তুত হইল ও শীতত্রাণের জন্য গৃহমধ্যে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হইল। কোথায় আমি সর্ব্বাগ্রে, সকল কার্য্য ছাড়িয়া দেবদর্শন করিব, না সেই উত্তাপের সমীপে, স্থূল গাত্রবস্ত্ররাশির মধ্যে, সেই সন্ধ্যাকালেই আমি গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলাম! প্রত্যূষে সে নিদ্রাভঙ্গ হইল। পরে শুনিলাম, আমার গাঢ় নিদ্রার জন্য রাত্রিতে কোন ঔষধই দেওয়া হয় নাই।

নিদ্রাভঙ্গে মাতা ভাগীরথীর প্রাভাতিক আরতির মধুর মাঙ্গল্যধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল! আর তাহা দেখিবার জন্য যাত্রীদিগের বিরল কলকলধ্বনিও কর্ণে প্রবেশ করিল। আরও কি শুইয়া থাকা যায়? ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলাম। অদূরবর্ত্তিনী জননী জাহ্নবীর দর্শনার্থ ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া সোপানের উপরি পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলাম। কি আশ্চর্য্য! আমার পায়ে আর বেদনার লেশ মাত্র নাই! শরীরে আর লগ্ন জ্বরের দারুণ দাহসন্তাপের লেশমাত্র নাই! অনুপায়ে এমন উপায়, সঙ্কটে এমন নিস্তার, মর্ম্মান্তিক ব্যাধিযন্ত্রণায় এমন আকস্মিক আরাম আমি কখনও অনুভব করি নাই! কল্যকার সেই আমি—আমি শঙ্কা-সঙ্কুচিতপদে স্বচ্ছন্দে সোপানের উপরিপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলাম! শ্রীগুরুদেব কি মোহান্ধ মনুষ্যকে নিতান্ত অশরণ

অগতিক অবস্থায় এমনি করিয়া কৃপা করিয়া থাকেন! সকলের এ-এ কথা এরূপভাবে বিশ্বাসযোগ্য হইবে কি না, জানি না; কিন্তু আমার সুহৃৎস্বজন, শিষ্যসন্তানাদি অনেক আছেন, তাঁহারা আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন, তাই আমি এরূপভাবে উহা উল্লেখ করিলাম। সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে এ কথা বলিয়া আর কি করিব? গুরুকৃপার এ সামান্য নিদর্শনে তাঁহাদের কি কাজ? ক্ষুদ্র মানবের অনুভূত ক্ষুদ্র কথায় কর্ণপাত করিয়া তাঁহাদের কি প্রয়োজন? এ সকল, কি অন্য সকল কথা, কিছুই তাহাদিগকে শুনাইতে চাহি না। যে গুরুবাক্য, যে শাস্ত্ররহস্য একবার তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশিয়া চিরজীবনের জন্য অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছে, যাহা তাঁহাদের হৃদয়-কন্দরে শ্রদ্ধাভরে প্রতিক্ষণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাহাতেই তাঁহাদের চিত্ত অভিনিবিষ্ট থাকুক। তাঁহারা জীবনব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সাংসারিক সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদের অবিরাম ঝটিকাবর্ত্তে তৃণতুচ্ছভাব প্রদর্শনে অভ্যস্ত হইয়াছেন, এবং সেইরূপ হইয়া শৈলসার সর্ব্বাত্মায় সদা সমানআনন্দে বিরাজ করিতেছেন! তাঁহাদিগের চরণে বার বার প্রণতি করিয়া, সংসারী জীব আমরা, সংসারীদিগকে শুনাইবার নিমিত্ত এ সামান্য বৃত্তান্ত লিখিতে থাকি।

সোপান-পার্শ্ববর্ত্তী তটভাগে উপবেশন করিলাম বলিয়াছি। উপবেশন করিয়া কি দেখিলাম? দেখিলাম, সম্মুখভাগে ধবল-নির্ম্মল তুষার-সমুজ্জ্বল উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ প্রভাতসূর্য্যকরে আরও সমুজ্জ্বল হইয়া দিগন্ত আলোকিত করিয়াছে! উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতগাত্রে সতেজ সুনীল দেবদারু-তরুশ্রেণী যেন ভক্তিনম্র নিষ্পন্দমূর্ত্তিতে করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! আর নিম্নে ভাগীরথী অপূর্ণ অল্প অবয়বে পূর্ণ পবিত্রতার উচ্ছ্বাসময় ধবল-নির্ম্মল প্রবল প্রবাহে অনাহত পদ্মের অবিরাম ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে অধীরে এক লক্ষ্যে প্রধাবিত হইয়াছেন! দেখিয়া শাস্ত্রবাক্য স্মৃতিপথারূঢ় হইল। বিস্ময়ের সহিত চিত্তে উদিত

হইল, অয়ে, ইনিই সাক্ষাৎ সেই বিষ্ণুপদোদ্ভবা! ইনিই ভগবানের সেই অমৃতময়ী মূর্ত্তি! ইহাও কি কখন সাধারণ সলিল-ধারা হইতে পারে? ইনি যে সেই শাস্ত্রকথিত দ্রবীভূত ধর্ম্মধারা! অনাদি যোগীশ্বর কোন্ আদিযুগে ইহাঁকে আপন জটাজূটে স্থান দান করিয়াছেন, আজি আমরা ইহাঁকে সেই কারণ-বারি জানিয়া শতবার শিরে ধারণ করি, করিয়া কৃতার্থ হই! ইনিই ত্রিমূর্ত্তিতে আমাদিগের কর্ম্মভূমিকে সিক্ত-শোধিত করিয়া রাখিয়াছেন! ইনিই আমাদের ক্ষুদ্র দেহে রূপান্তরে সূক্ষ্ম ত্রিমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিয়া এই দেহধারণের কারণ হইয়াছেন! আবার স্থূলমূর্ত্তিতেও মাতৃস্তন্যধারারূপে আর্য্যাবর্ত্তের কোটি কোটি নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-শস্য, তরু-লতা উজ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন! সেই চরাচর-জড়জীব-জননী জননী জাহ্নবীকে আজি প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে নিরীক্ষণ করিতেছি! অহো, আজি আমার অনির্ব্বচনীয় অভাবনীয় সৌভাগ্য-সংযোগ! জননি, ক্ষুদ্র মনুষ্য-কীট আমি, তোমার স্বরূপ কি বুঝিব ও কি কহিব? তোমার পাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণাম! আর আমার বুঝিবার ও কহিবার কিছু নাই, শাস্ত্র-কীর্ত্তিত তোমার পবিত্র মাহাত্ম্যেই যেন আমাদিগের গতি-মতি স্থিরতর থাকে! বিস্ময়ে উল্লাসে অধীর অন্তরে ধীরে ধীরে সোপান-পথে অবতরণ করিয়া সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইলাম।

যথাকালে আমাদিগের তীর্থকৃত্যাদি সম্পন্ন করা হইল। পাণ্ডাদিগের সাধু ব্যবহারে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। গঙ্গোত্তরী স্থান যেমন পবিত্র ও সুন্দর, এখানকার পাণ্ডাদিগের প্রকৃতিও তেমনি পবিত্র ও সুন্দর। যাত্রীদিগের উপর তাঁহাদের কোনরূপ উৎপীড়ন নাই, নিজেদের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা তাহারা নম্রভাবে যাত্রীদিগকে জানাইয়া থাকেন মাত্র। কিন্তু শুদ্ধ নিজেদের অভাব পূরণেই তাঁহারা ব্যস্ত নহেন, গঙ্গামাতার মন্দিরের যাহা অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের জন্যও

তাঁহারা চেষ্টা করিয়া থাকেন। যাত্রীদিগের প্রতি তাঁহাদের যথাশক্তি যত্ন প্রকাশের কোন ত্রুটি নাই। সে হিমময় স্থানে গরম জলের সর্ব্বদা প্রয়োজন। তাঁহারা ঐ জল গরমের জন্য যাত্রীদিগকে বড় বড় কড়া দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদিগকে আমাদের পাণ্ডা গঙ্গাদত্তজী সমস্ত উদ্‌যোগ আয়োজন করিয়া দিয়া যথেষ্ট উপকৃত করিলেন। এখানে মহাত্মা উদয়রাম-সেবারামের সদাব্রত আছে। সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত ১টী পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালা ও আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা আছে। অহমদাবাদ নিবাসী শ্রীমান্ চুন্নীভাই মাধোলাল ৩ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী উত্তম বাঁধা ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ষার প্রবল প্রবাহে উহা ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায় রায় ভগবান্ দাস বগলা বাহাদুরের পত্নী দুই হাজার টাকা ব্যয়ে পুনর্ব্বার ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। গঙ্গোত্তরীর মন্দিরগুলি বৃহৎ নহে। গঙ্গামাতার মন্দিরটী বেদান্তভাষ্যকার পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ মন্দিরের মধ্যে গঙ্গামাতা, মহাদেব, নারায়ণ, ভগীরথ ও পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। পৃথক্ মন্দিরে শিবস্থাপন আছে। উচ্চ চত্বরটীর চতুর্দ্দিকেই মন্দির। স্থানটী ক্ষুদ্র, দোকানপাটও সামান্য, যাত্রীসমাগমও অল্প। যাত্রীদিগের খাদ্য আটা, চাউল, লবণ, লঙ্কা প্রভৃতি ছাগপৃষ্ঠে এখানে আনীত হয়। এখানে মুগের ডাউল পাওয়া গিয়াছিল। আলু ৵০ আনা সের ও চাউল ।০ আনা সের। চিনি, মিছরিও পাওয়া যায়, অত্যন্ত মহার্ঘ্য। ঘৃত ভাল পাওয়া যায় না।

পাণ্ডাজী গঙ্গার প্রবাহ মধ্যে অবস্থিত ভগীরথের তপঃশিলা আমাদিগকে দেখাইলেন। মাতা ভাগীরথীকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিবার জন্য রাজর্ষি ভগীরথ ঐ স্থানে দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ পাণ্ডুবর্ণ শিলাখণ্ড যুগযুগান্তকাল ব্যাপিয়া গঙ্গাপ্রবাহে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। তাহার ২।১ স্থান কমণ্ডলুর ন্যায় জল রাখিবার আধাররূপে

পরিণত হইয়াছে। সেই শিলাখণ্ড দেখিলে দর্শকের অন্তঃকরণে পবিত্রতার সহিত কি অপূর্ব্ব তৃপ্তিরই উদয় হয়!

মাতা জাহ্নবী যে স্থান হইতে প্রকট হইয়াছেন, সেই গোমুখী এখান হইতে ১৮ মাইল উপরে বর্ত্তমান। ঐ স্থানে যাইবার রাস্তা অতি সঙ্কটময়। কদাচিৎ কোন মহাপুরুষ ঐ রাস্তা বাহিয়া গোমুখী দর্শনলাভ করিতে পারেন। আমরা যে পারি নাই, তাহা লেখাই বাহুল্য।

গোমুখী চিরতুষারে আবৃত। উহা সমুদ্র-সমতল হইতে ৯২০০ হাত উচ্চ। ঐ বরফাচ্ছন্ন বৃহৎ খাতের চতুর্দ্দিকে প্রস্তরখণ্ড ও মৃত্তিকার অংশ সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উহার বিস্তার অর্দ্ধ ক্রোশ। ঐ খাত পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে ক্রমশঃ অবতরণ করিয়া একটী গহ্বরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেই গহ্বর হইতে গঙ্গা ভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন। এই স্থানের নাম গোমুখী বা গঙ্গোত্তরী। চিরতুষারময়ী গঙ্গোত্তরীর নিকট গঙ্গার বিস্তার ১৮ হাতের অধিক নহে। তথায় জল ১ হাতেরও কম হইবে।

উক্ত গোমুখী বা প্রকৃত গঙ্গোত্তরীর কথা এক্ষণে দূরে থাক, যাহা একালে গঙ্গোত্তরী বলিয়া বিখ্যাত, অর্থাৎ যেখানে আমরা গিয়াছি বা সাধারণ যাত্রীলোক যেখানে সচরাচর গিয়া থাকেন, তাহার কথা এক্ষণে শেষ করি।

এই গঙ্গোত্তরী পহুঁছিবার ১ মাইল আগে আমাদিগকে ১টা পুল পার হইয়া বাম পারের রাস্তায় আসিয়া গঙ্গোত্তরী পহুঁছিতে হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বেও আরও ২।১ বার নিকটে নিকটে পুল পার হইয়া একবার গঙ্গার বামধারে, একবার বা দক্ষিণ ধার দিয়া আসিতে হইয়াছে। রাস্তা যেখানে কিছু খারাপ হইয়াছে বা একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেখানেই পুল নির্ম্মাণ করিয়া অপর ধার দিয়া রাস্তা করিতে হইয়াছে।

* গোমুখীর বৃত্তান্ত বিশ্ববিখ্যাত "বিশ্বকোষ" অভিধান হইতে সঙ্কলিত হইল।

প্রবল বর্ষায়, প্রখর নির্ঝর-ধারায় ও ভাগীরথীর বর্ষাকালীন উন্মত্ত প্রবাহে রাস্তা সর্ব্বদা ঠিক্ থাকে না।

গঙ্গোত্তরীর অপর পারে শিকারী সাহেবদিগের তাম্বু পড়িয়াছিল। দেখিয়া আবার আমার কালিদাসের শ্লোক মনে পড়িল। আবার আমি আবৃত্তি করিলাম—

ভাগীরথী-নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ রাসেব্যতে ভিন্ন-শিখণ্ডিবর্হঃ॥

অর্থাৎ হিমালয়ের সেই শীতল বায়ু, যাহা ভাগীরথীর নির্ঝরসমূহের অবিরল-নিঃসৃত জলকণা বহন করিয়া আরও শীতল হইয়াছে, যে বায়ুর হিল্লোলে তীরবর্ত্তী দেবদারু বৃক্ষগুলি মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতেছে, নিবিড় পক্ষপুঞ্জে সজ্জিত ময়ূরের পুচ্ছভাগ যে বায়ুবেগে বিশ্লিষ্ট হইতেছে, কিরাতগণ সেই উন্মুক্ত-শীতল বায়ুপ্রবাহ সহ্য করিয়াও মৃগ অন্বেষণে তথায় বিচরণ করিতেছে।

তখন কিরাতেরা ছিল, এখন ইঁহারা আছেন। সেই হিমবায়ু ভোগ করিয়া তখনকার কিরাতগণের যে কাজ ছিল, ইঁহারাও এখন সেই-কর্ম্ম, সেইরূপ শিকার চলিতেছে। তবে তাহাদিগের শিকার জীবিকার জন্য ছিল, ইঁহাদের শিকার সখের জন্য। যাহা হউক, মহাকবির কবিতা আজিও কোনরূপে সার্থক হইয়া রহিয়াছে।

গঙ্গোত্তরীর নিকটেই লোকে হাঁটিয়া গঙ্গা পারাপার হইতেছে। গঙ্গাগর্ভে প্রবাহের মধ্যে যে সকল বড় বড় পাথর অল্প অল্প মাথা উঁচু করিয়া আছে, তাহাদের উপর পা দিয়া ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া অনেকদূর আসা যায়। তারপর অবশিষ্ট যে স্থানটায় প্রবাহের পরিসর কিছু বেশি, অথচ পাথর জাগিয়া নাই, সেখানে পাহাড়ীরা মোটা মোটা কড়ির মত কাঠ ফেলিয়া দিয়াছে। তাহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে যাতায়াত চলে, জলে পা দিতে হয় না। এইরূপে অনেক যাত্রী লোকও যাতায়াত

করিতেছে, আর পাহাড়ী লোকেরা ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূর্জ্জপত্রের বোঝা লইয়া সর্ব্বদাই গঙ্গা পারাপার হইতেছে।

ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার এখানে যথেষ্ট। দোকানে তুমি চিনি, আটা প্রভৃতি কোন জিনিষ কিনিতে যাও, দোকানি তাহা ভূর্জ্জপত্রে করিয়া দিবে। ভূর্জ্জপত্রে লুচিপুরিও খাওয়া যায়। ভূর্জ্জপত্রের সেখানে দাম নাই, আমাদের দেশে যেমন পুরাতন খবরের কাগজ।

আমরা একটু ভূর্জ্জপত্র দেখিলে কতই আদর করি। ভাল ভূর্জ্জপত্র দেখিলে যন্ত্র-কবচাদি লেখার জন্য কত যত্ন করিয়া রাখি। ভাল ভূর্জ্জপত্রের দেশে অভাবও বটে। কিন্তু এখানে ভালও ন-গণ্য, মন্দের ত কথাই নাই।

সংস্কৃতে একটা কবিতা আছে—

অতিপরিচয়াদবজ্ঞা
সন্ততগমনাদনাদরোভবতি।
গহনে ভিল্লপুরন্ধ্রী
চন্দনতরু মিন্ধনং কুরুতে॥

অর্থাৎ অত্যন্ত পরিচয়ে পরিচিতের প্রতি সম্মানবুদ্ধি চলিয়া যায়, অবজ্ঞার ভাব উপস্থিত হয়। সর্ব্বক্ষণ গতিবিধি চলিলে আর আদর থাকিবে কি করিয়া? দেখ অরণ্যবাসিনী ভিল্লরমণীরা চন্দনকাষ্ঠে জ্বালানী কাঠের কাজ করিয়া থাকে। পাহাড়ীদেরও ভূর্জ্জপত্রের সেইরূপ ব্যবহার।

আমরা পরমানন্দে এ তীর্থের স্নান-দান ও দেবপূজাদি কৃত্য সম্পাদন করিলাম। ফিরিবার দিন পাণ্ডাবিদায় শেষ হইলে রামেশ্বর শিবের মস্তকে অর্পণের জন্য পূর্ব্বদিনের সংগৃহীত গোমুখী-গঙ্গোদকের তাম্র-পাত্রটী হস্তে করিয়া লইলাম এবং শেষপ্রণতিপূর্ব্বক গঙ্গোত্তরীর শেষদর্শন সমাপ্ত করিয়া ক্ষুণ্নমনে গঙ্গোত্তরী ত্যাগ করিলাম। কিন্তু গঙ্গোত্তরীর রমণীয় দৃশ্য—প্রবাহমধ্যস্থ মগ্নোন্মগ্ন নানাবর্ণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, ঐসকল শিলাখণ্ডে প্রতিহত হইয়া প্রচণ্ড কল্লোলকোলাহলে

উন্মত্তনৃত্যে তীরবেগে নিরন্তর প্রধাবিত জননী জাহ্নবীর নির্ম্মল ধারা, জাহ্নবীর তীরবর্ত্তী সতেজ-সমুন্নত বিবিধ তরুশ্রেণী, সর্ব্বোপরি উভয়তটে বিরাট অবয়বে দণ্ডায়মান গগনস্পর্শী হিমগিরিশৃঙ্গ কিছুই আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল না। তখন পরিত্যাগ করা ত দূরের কথা, এখনও মনে হয়, আর একবার গঙ্গোত্তরী দর্শন করিতে পারিলে বুঝি মনের আশ মিটে। অনেকে কেদার-বদরীনাথ প্রভৃতি দুর্গম তীর্থে ২।৩ বার করিয়া আসেন, শুনিয়াছি; তাঁহারা গঙ্গোত্তরীতে ঐরূপ আসেন কি না জানি না। অবশ্য পুনঃ পুনঃ পুণ্যক্ষেত্রে দর্শন-স্পর্শনে প্রভূত পুণ্য সঞ্চয়ই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য; কিন্তু এইসকল রমণীয় দৃশ্য দর্শনও এই সকল স্থানে আগমনপক্ষে কম-আকর্ষণ নহে। আমার বোধ হয় পবিত্রতার সহিত রমণীয়তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিয়াই যায় না। কেন না, যাহা পবিত্র, তাহাই ত রমণীয় দেখিতে পাই!

ফিরিবার পথে সেই উন্নত ভৈরবঘাটী, সেই উন্নতাবনত জাংলাচটি, সেই সমতল হরশিল প্রভৃতি আরও কত রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যাইবার সময় ঐ সকল দুর্গম পথে কত কষ্টই পাইয়াছি, কিন্তু এখন তাহা মনে করিয়া আর কিছুই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল না। হিম-গিরির ক্রোড়বর্ত্তী দুর্গম তীর্থের দর্শন জন্য কঠোর সাধনায় আমাদের সিদ্ধি-লাভ হইয়াছে বলিয়াই বুঝি আমাদের ক্লেশকে আর ক্লেশ জ্ঞান নাই। যাহা হউক, মনের উল্লাসে সকল কষ্ট অসুবিধা বিস্মৃত হইয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে চলিতে চলিতে আমরা ভাটোয়ারি আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এই ভাটোয়ারির পূর্ব্বেই এক চটীতে একটী বাঙ্গালী সাধুর বৃত্তান্ত আমি ছাট করিয়া যাইতেছি। কিন্তু সৎকথা একটুও ছাড়িতে নাই। তাই অল্পবিস্তর যাহাহউক, যেটুকু মনে পড়ে, সেই বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ করি-তেছি। এই সাধুটী সদানন্দময়, আপনিই ডাকিয়া সকলের সঙ্গে কথা কন। তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতে আমার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল—

সাধু। হরিবোল ব'লে, আপনি না বাঙ্গালী হরিবোল-মশায়?

আমি মজা পাইয়া গেলাম। বলিলাম, আজ্ঞা হাঁ হরিবোল-মশায়।

সাধু। হরিবোল হরিবোল, পরমানন্দ! এইত চাই হরিবোল-মশায়!

আমি। তা, আপনার নিবাস কোথায় হরিবোল-মশায়?

সাধু। হরিবোল ব'লে আর সে-নিবাসের খোঁজে কাজ কি হরিবোল-মশায়? এখন হরিবোল ব'লে এই হরিবোলের পথেই নিবাস হরিবোল-মশায়।

আমি। উত্তম হরিবোল, আপনার সাক্ষাতে আমি চরিতার্থ হ'লাম।

সাধু। হরিবোল ব'লে বলেন কি মশাই? হরিবোল হরিবোল! আমিই আপনার সাক্ষাতে হরিবোল ব'লে চরিতার্থ হ'লাম হরিবোল মশায়!

আমি। তা বেশ। আপনাদের ত ঐরূপ মতি-গতিই বটে। তা চলুন না, হরিবোল ব'লে একসঙ্গেই এ পথে যাওয়া যাক্।

সাধু। হরিবোল ব'লে যা ঘট্‌বে, তাই উত্তম হরিবোল। এক সঙ্গেও সেই হরিবোল, নিঃসঙ্গেও সেই হরিবোল! হরিবোল ব'লে আপনার কি গঙ্গোত্তরী হ'য়েছে হরিবোল-মশাই?

আমি। আজ্ঞা, আপনার কৃপায় একরূপ।

সাধু। হরি হরি! আপনি ত হরিবোল ব'লে পার পেয়েছেন মশাই! আমার কি হবে হরিবোল-মশাই! আমি যে হরিবোল ব'লে সেই পথেই চলেছি হরিবোল-মশাই!

আমি মজা করিতে গিয়া সাধুর এই নামপ্রেমে, এই অকিঞ্চনতায় মুগ্ধ হইয়া গেলাম! আহা ভগবৎসমীপে ভক্তের কি দীনহীনতা! এই মুখেই ত হরিনাম শোভা পায়। শ্রীচৈতন্যদেব এইজন্যই ত বলিয়া গিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অর্থাৎ তৃণের অপেক্ষাও নীচ বলিয়া আপনাকে যাঁহার বোধ আছে, তরুর অপেক্ষাও দুঃখ-সন্তাপ সহ্য করা যাঁহার অভ্যাস আছে, নিজের মান-অভিমান বোধ যাঁহার কিছুই নাই, কিন্তু পরের সম্মান দিতে যিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত, তিনিই হরিনাম কীর্ত্তনের প্রকৃত অধিকারী।

হরিবোলা সাধু গঙ্গোত্তরীর পথে যাইতেছেন, আমরা গঙ্গোত্তরী হইতে ফিরিতেছি, সুতরাং তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী হওয়া আমাদের আর সম্ভব নহে। আমরা আর তাঁহার কি করিতে পারি? ভক্তবৃন্দের কল্যাণে তাঁহার সেবার অভাব নাই। তবে গঙ্গোত্তরী হইতে তিনি যে গঙ্গাজল সংগ্রহ করিবেন, (রামেশ্বরের মস্তকে চড়াইবার নিমিত্ত এ পথের যাত্রীরা গঙ্গোত্তরী হইতে গঙ্গাজল লইয়া গিয়া থাকেন) তাহার জন্য তাঁহার একটী তাম্রপাত্রের প্রয়োজন হইবে জানিয়া আমরা ঐ পাত্রের মূল্য তাঁহাকে দিলাম।

অদ্য ৩১শে বৈশাখ, শনিবার, সংক্রান্তি।

ভাটোয়ারিতে গঙ্গাস্নানাদি করিয়া কেদার যাত্রার উদ্দেশে রওনা হইলাম। যাইতে যাইতে আমাদের গন্তব্য কেদারনাথের পথ লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইল। তর্ক বিতর্কের কারণ, মসুরি হইতে উত্তর-কাশী আসিতে পাকদাণ্ডির পথে আমাদিগকে বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। এখন কেদারনাথ যাইতে বালা আমাদিগকে যে-পথে লইয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহাও সেই পাকদাণ্ডির পথ। আমরা একবারকার ভুক্তভোগী, সুতরাং এবার পাকদাণ্ডির পথে যাইতে কাহারও বিশেষ সম্মতি নাই। বিশেষতঃ এখান হইতে ফিরিয়া টিহরী ও হৃষীকেশ পঁহুছিলে, তথা হইতে কেদারনাথ যাইবার সিধা ও সুগম রাস্তা পাওয়া যায়। সুগম বলিতে যদিও চড়াই-উতরাইশূন্য সমতল পথ নহে, কেন না, এ হিমালয় প্রদেশে চড়াই-উতরাইশূন্য

সমতল স্থান নিতান্তই দুর্লভ, তথাপি এ পথ অনেকটা প্রশস্ত ও বিপদ-শূন্য। আর পাকদাণ্ডির পথ পথই নহে, তাহাতে পদে পদে বিপদ্। এই কারণেই এত তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু বালা বলিতে লাগিল, এ পথ পাকদাণ্ডি হইলেও পূর্ব্বের পাকদাণ্ডি পথের মত বিপৎসঙ্কুল নহে, এ পথে অনেক লোক যাতায়াত করে। বিশেষতঃ এখান হইতে টিহরী হইয়া যাইবার পথ অত্যন্ত ঘোর। তাহাতে অনর্থক বহুদিন লাগিবে। এখন কি করা যায়। অনেক ভাবা ভাবনা করিতে করিতে শেষে বালার পাকদাণ্ডির পথেই আবার আমার মতি হইল। কাজেই গতির ব্যবস্থাও সকলেরই সেই অনুসারে হইল। ভাটোয়ারী হইতে ১ মাইল আন্দাজ পথ আসিয়া বাম ধারে নামিতে নামিতে আমরা গঙ্গার সমীপবর্ত্তী হইলাম। তথায় গঙ্গার উপর কাঠের একটী নূতন পুল হইয়াছে দেখিলাম। পুল দিয়া পার হইতে কয়েকটী করিয়া পয়সা দিতে হইল। ঐ পথ দিয়া আরও অনেকে আসিতে লাগিল। কিন্তু সবই প্রায় সন্ন্যাসীর দল। যাহা হউক, এ পথে লোক চলে দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। গঙ্গার ধারে ধারে সঙ্কীর্ণ পথে বহুক্ষণ আসিতে আসিতে ক্রমে গঙ্গাতট ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। দূরে পর্ব্বতে উঠিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া রজত-রেখাকারে গঙ্গাপ্রবাহ কি সুন্দর মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইলাম! দূর উন্নত আর একটা স্থান হইতে পশ্চাৎ পতিত ১ খানি গ্রামের বাড়ীঘরগুলি দেখা যাইতে লাগিল। সেগুলি দেখিয়া বোধ হইল যেন সেখানে অসংখ্য শ্বেতবর্ণ গরুর পাল চরিতেছে! ক্রমে ৫ মাইল পথ আসার পর সালু নামক গ্রাম পাওয়া গেল।

এই গ্রামে কয়েক ঘর চাষী লোক আছে। সকল গ্রামই এইরূপ। জমি কোথায় যে চাষ করিবে? তবে জীবনধারণের জন্য আর কি উপায় করিবে, পাহাড়ের গায়ে আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া, তাহাতে নিয়ত গোবরের সার ফেলিয়া দুই চারি কাঠা করিয়া স্থানে, যে একটু আধটু ধান বা গম

বুনিতে পারে, তাহাই বুনে। গরুর খাবারের জন্য জঙ্গলের অপ্রতুল নাই বটে, ঝরণাও প্রত্যেক গ্রামে এক একটা আছে। এ গ্রামের ঝরণাটী ক্ষুদ্রধার, বিশেষতঃ গরুর পাল ঐ ঝরণার নিকটেই জলপান করে বলিয়া সে স্থানটী কর্দ্দমময়, নিতান্ত অপরিষ্কার ও তজ্জন্য অপ্রীতিকর। চাউল ।৴৹ সের মিলিল, দাম ।৹ আনা। আলু মিলিল না, আটাও তথৈবচ। এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমাদিগকে ১টী কুঠুরি ছাড়িয়া দিল, আমরা তথায় পাক করিলাম। একদল হিন্দুস্থানী যাত্রী, দেখিলাম ঝরণাটী হইতে কিছু দূরে রাস্তার মধ্যেই পাথর কুড়াইয়া পাক আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীটীতে টিহরীরাজসরকারের একজন কর্ম্মচারী ভাটোয়ারী হইতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন দেখিলাম। কাণ্ডী বা ঝাম্পানওয়ালারা ঐ ঐ ব্যবসার জন্য সরকারে মাশুল দিয়া থাকে। ভাটোয়ারীতে ঐ মাশুল দিতে হয়। ভাটোয়ারী অতিক্রমপূর্ব্বক কাণ্ডী বা ঝাম্পানওয়ালারা এই সকল মফঃস্বল গ্রামে আসিয়া পাছে সোয়ারি লইয়া মাশুল ফাকি দেয়, তজ্জন্য মাশুল আদায়কারীরা এই সকল স্থানে আসিয়াও আড্ডা গাড়িয়াছেন। তদ্‌ভিন্ন সরকার হইতে গ্রামে ১ জন মণ্ডল নিযুক্ত আছেন। গ্রামের মধ্যে রাত্রিকালে কাহারও বাড়ীতে কোন আগন্তুক লোক থাকিলে, তিনি তাহার নিকট ৵৹ আনা করিয়া লইয়া থাকেন, নতুবা ঐ লোককে রাত্রিতে বাটীর বাহিরে পড়িয়া থাকিতে হয়। এই গ্রামের মণ্ডলটী কিছু রুক্ষ প্রকৃতির। তা প্রভুত্ব থাকিলে প্রকৃতি প্রায়ই কিছু রুক্ষ হইতে দেখা যায়। কি কারণে ঐ ৵৹ আনা আদায় করা হয়, জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তাহার পরিচয় পাইলাম। তবে এরূপস্থলেও যিনি মিষ্টমুখের পরিচয় দেন, তাঁহাকে মহাত্মা লোকই বলিতে হইবে।

কাণ্ডীর মাশুল আদায়কারী লোকটী বেশ নম্রভাবে ঐরূপ শেষোক্ত ভাবের পরিচয় দিলেন। তিনি অশেষ-বিশেষে আমাদিগকে বুঝাইতে

লাগিলেন যে "কেদারনাথ যাত্রার এই পথ পাকদাণ্ডি, এ পথে অত্যন্ত চড়াই আছে, বিশেষতঃ ইহাতে বহুবিস্তৃত জঙ্গল, ঐ জঙ্গলে বাঘ ও ভালুকের ভয় আছে, ২।৪ জন পাহাড়ী লোক সঙ্গী না লইয়া আপনারা কিছুতেই ঐ সঙ্কট পথে যাইতে পারিবেন না। বিশেষতঃ আপনারা বাঙ্গালী, সুকুমার লোক, মারা পড়িবেন। অতএব প্রত্যেকে এক একটী কাণ্ডী করিয়া লউন।" বর্ণিত পথে আমাদের কষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনায় তাঁহার উদ্বেগ যত হউক না হউক, তাঁহার মাশুলের জন্য ও মাশুল লেখাপড়ার সময় ১খানি রসিদ কাণ্ডীওয়ালাকে ও ১ খানি রসিদ আরোহীকে যে দিতে হইবে, তাহাতে উভয়ের নিকটই কিছু কিছু পাওনা হইবে, সেই পাওনার জন্য, তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ও কাণ্ডীপ্রভৃতির বন্দোবস্ত না হইলে ঐ সকল লাভের একবারেই সম্ভাবনা নাই বলিয়া উদ্বেগ বেশ বুঝিতে পারিলাম। কথায় বার্ত্তায় আরও শুনিলাম যে বোঝাওয়ালাদিগের নিকট পূর্ব্বে রাজসরকার হইতে ১ হাজার টাকা মাশুল আদায়ের নিয়ম ছিল। এক্ষণে ইংরেজী আইনের অনুকরণে প্রকাশ্য নিলাম ডাকদ্বারা ঐ মাশুল নির্ণয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। নিলাম বন্দোবস্তে আয় বৃদ্ধি হইলেও উহার দোষ এই, উহাতে প্রজাসাধারণের সাধ্য অসাধ্যের দিকে রাজার দৃষ্টি থাকে না। আবার প্রজাদের মধ্যেও অর্থবলশালী একজন নিজে লাভবান্ হইবার নিমিত্ত ক্রমাগত ডাক বাড়াইয়া দেশবাসী ও প্রতিবেশীদিগের প্রতি সহানুভূতিশূন্য, নির্ম্মম ও অবশেষে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও পাহাড়ী লোকেরা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করিয়া পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ১ হাজারের স্থানে ৯ হাজার পর্য্যন্ত ডাক চড়াইয়া দিয়াছে। এরূপস্থলে বোঝাওয়ালাদিগের উপর ও সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদিগের উপরও কিঞ্চিৎ অত্যাচার অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বোঝাওয়ালাদিগের পরস্পর প্রতিযোগিতা বাড়িয়াছে, কাণ্ডীপ্রভৃতির ভাড়াও কিছু চড়িয়াছে। আর বোঝাওয়ালাদিগের

সহিত সরকারি লোকের বিন্দুমাত্র অ-বনিবনাও হইয়াছে, কি সরকারি-লোক অর্দ্ধপথ হইতে বোঝাওয়ালার কাণ পাকড়াইয়া ধরিয়া লইয়া চলিয়াছে! তাহাতে অর্দ্ধপথে পড়িয়া যাত্রীর যে দুর্গতি হইতে হয় হউক, তাহাতে কাহারও দৃক্‌পাত নাই, এরূপ ঘটনাও যে না দেখিয়াছি তাহা নহে।

—o—

সিয়ালী।

১লা জ্যৈষ্ঠ।

আমরা সালুগ্রাম হইতে প্রত্যূষে রওনা হইয়া ৬ মাইল আসিয়া সিয়ালী ধর্ম্মশালা পাইলাম। এই ৬ মাইলের অধিকাংশই বিষম চড়াই, রাস্তাও সঙ্কটময় পাকদাণ্ডী। পূর্ব্বে এ পাকদাণ্ডীর অবস্থা আরও খারাপ ছিল। প্রায়ই গাছ-পালা, শাখা-প্রশাখা, শিকড় ধরিয়া সাধু সন্ন্যাসী লোক যাতায়াত করিতেন। সে কি কষ্টই তাঁহারা ভোগ করিতেন! তখন এ ধর্ম্মশালাও ছিল না। সমস্ত পথটীর মধ্যে ঝরণা নাই, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেলেও উপায় নাই! পথের চিহ্নও অনেকস্থলেই নাই, সর্ব্বদাই পথ ভুল হয়। পথে ক্রমাগতই জঙ্গল, সে জঙ্গলও নিবিড় ও উচ্চ-নীচ স্থানে অবস্থিত; ২।৪ হাত তফাৎ হইলে আর দেখাসাক্ষাৎ চলে না। তাহাতে আবার বাঘ-ভালুকের ভয়, দলবদ্ধ না হইয়া চলিবার যো নাই। কিন্তু সকলের সামর্থ্য সমান নহে যে ঠিক্ একসঙ্গে যাইতে পারে। তথাপি প্রাণপণ করিয়া সেই একসঙ্গেই যাইতে হইয়াছে। এখন ১০।১২ মাইল যাইয়া ধর্ম্মশালার মধ্যে মাথা রক্ষা করিতে পারা যায়, পূর্ব্বকালে সাধুগণ নিরাশ্রয়ে বৃক্ষতলে ধুনী জ্বালাইয়াই রাত্রিযাপন করিতেন। সৌভাগ্যের বিষয় এখনও সেই সাধু-গণ "জয় কেদারনাথকী জয়" উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, পশ্চাদ্বর্ত্তী যাত্রীদিগকে মধ্যে মধ্যে অভয় দিতেছেন,

"আর চড়াই নাই, অগ্রসর হও" বলিয়া উৎসাহ দিতেছেন, "জন্ম-জন্মান্তরের সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য একটু অধিক কষ্ট সহ্য করিতেই ত হয় বাবা" বলিয়া প্রবোধ দিতেছেন, "সুখকর খাদ্য অভাবে কষ্ট হইতেছে? কি করিবে, এ মহাতীর্থ, ব্রহ্মচর্য্য করিয়া ব্রত-ধারণ করিয়াই এ তীর্থযাত্রা উদ্‌যাপন করিতে হয়।" এইরূপ উপদেশ দিতেছেন, "কেবল কষ্টের কথা কেন ভাবিতেছ বাচ্চা, দেখ দেখি আমরা যে-অত্যুচ্চ অট্টালিকায় উঠিয়াছি, ধনীতে কি এত উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারে? অভ্যাস রাখ, সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকায় আমরা উঠিতে পারিব" বলিয়া পরিহাসের সহিত সারগর্ভ আলাপও করিতেছেন, আমাদের শুষ্ককণ্ঠে এ সকলের প্রত্যুত্তরে বাঙ্‌মাত্র নিঃসরণ হইতেছে না। ফলতঃ আমাদের মত গৃহীলোকের পক্ষে এ পথ অতি ভয়ঙ্কর, অতি সঙ্কটময়। সাধুলোকের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্যই নহে।

এই জঙ্গলপূর্ণ, দুরারোহ, অত্যুচ্চ শৈলপথ যতই বিভীষিকাময় হউক, কিন্তু এমন নিবিড়, বিস্তৃত ও উন্নত অরণ্যও আমি কখনও চর্ম্মচক্ষে দেখি নাই ও এ জীবনে অন্যত্র কুত্রাপি বোধ হয় ঐরূপ দেখিতে পাইব না। মহাকবি ভবভূতির সেই অত্যাশ্চর্য্য অনন্যসাধ্য দণ্ডকারণ্যবর্ণনা—

নিষ্কূজ-স্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ড-সত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্ত-গভীরভোগ-ভুজগশ্বাস-প্রদীপ্তাগ্নয়ঃ। ইত্যাদি।

পদে পদে আমার স্মরণপথে পতিত হইতে লাগিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণী গন্তব্য পথকে, পর্ব্বতগাত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া, নিত্য-নিবিড়-ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে। নিম্নে, পার্শ্বে, পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে দৃষ্টিপাত কর, যেন কেহ অবিরল কুঞ্জবন সাজাইয়া রাখিয়াছে! বৃক্ষের গায় বৃক্ষ, বৃক্ষের পর বৃক্ষ, আর সেই বৃক্ষগুলি যেন সমশীর্ষ, সমাকার!

অগ্রে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, উর্দ্ধে একইরূপ সুন্দর দৃশ্য! চতুর্দ্দিক্ হরিতবর্ণে মণ্ডিত! দ্বিতীয় বর্ণের লেশও যেন সে দেশে প্রবেশ করে নাই! দেখিয়া ব্যাঘ্র-ভল্লূকাদি ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তুর কথা একবারে ভুলিয়া যাইতে হয়। একান্তভীষণ হইলেও তাহাতে যেটুকু একান্তরমণীয় ভাব আছে, তাহা কি বলিয়া উল্লেখ না করিব?

সেয়ালী ধর্ম্মশালার নিকটে একটু নিম্নে ১টী ঝরণা আছে, জলকষ্ট নাই। ধর্ম্মশালার মধ্যবর্ত্তী দোকানে চাউল ।৵০ আনা সের ও আটা ।০ আনা সের পাওয়া গেল। তরকারি মাত্র নাই, কিন্তু ঘৃত দুগ্ধ আছে। নিকটেই ১টী মহিষের বাথান দেখিলাম। এ অঞ্চলে অন্যত্র দুধ মিলে নাই, এখানে যাত্রিগণ সকলেই ইচ্ছামত দুগ্ধ পাইলেন। শুনিলাম, অতঃপর এ পথে যে যে ধর্ম্মশালা পাওয়া যাইবে, তথায়ও উহার অপ্রতুল হইবে না। গঙ্গোত্তরীর পথের ন্যায় এ অঞ্চল দধিদুগ্ধ-বর্জ্জিত নহে। এখানকার সদাব্রতেরও সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিলাম। প্রয়োজনীয় সব বস্তুই দেওয়া হয়। তবেদোকানদারটী তেমন স্নিগ্ধ প্রকৃতির নহে। মধ্যাহ্নেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহাতে কাহারও কষ্ট হয় নাই—সকলেরই স্থান সঙ্কুলান হইয়াছিল। বরং একস্থানে নানাস্থানের লোক সম্মিলিত,কেহ স্নান করিতেছেন, কেহ স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্র শুকাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন, কেহ পাক করিতেছেন, কেহ পূজাপাঠ করিতেছেন, কেহ শয়ন, কেহ বা উপবেশন করিয়া উপস্থিত ও অনুপস্থিত নানা কথার প্রসঙ্গ করিতেছেন, ইহাতে অপূর্ব্ব একরূপ আনন্দই অনুভব হইতে লাগিল। সেই নিবিড় অরণ্যে দুর্য্যোগের দিনে সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রয়াসী নানাদেশীয় নানা লোকের সংসর্গে কালযাপন নিজগৃহে নিরাপদে আরামে অবস্থান অপেক্ষাও আমার মধুর বলিয়া বোধ হইল।

—o—

পাংনানা।

২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

প্রভাতে আমরা সেয়ালি হইতে রওনা হইলাম। ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অদ্য আমাদিগকে পাংনানা ধর্ম্মশালায় পহুঁছিতে হইবে। নতুবা আশ্রয় পাওয়া যাইবে না। সকলেই অগ্রপশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমেই চড়াই আরম্ভ। ৪ মাইল চড়াই, সে চড়াইও বিষম চড়াই ও তাহা যেন আর ফুরায় না। বিষম কষ্ট। ক্রমাগতই উঠিতেছি। এইরূপে বহুক্ষণ ধরিয়া বহুদূর ওঠার পর সামান্য একটু জঙ্গলশূন্য স্থান পাওয়া গেল। ঐরূপ তৃণাচ্ছন্ন কয়েকটী অবকাশস্থানে কোথাও শ্বেতবর্ণ, কোথাও হরিদ্রাবর্ণ, কোথাও বেগ্নি রঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পরাশি অবিরলে ফুটিয়া দিক্ আলো করিয়া রাখিয়াছে! একি, এ ভয়ঙ্কর প্রদেশের মধ্যে এমন সুস্নিগ্ধ, সুরঞ্জিত, নয়নতর্পণ স্থান! গতকল্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে বলিয়া কি এককালে এত ফুল ফুটিয়াছে? না, ইহা দেবগণের সদ্যঃপরিত্যক্ত নিত্য-পুষ্প-ক্রীড়ার নিভৃত নিকেতন! যাহা হউক, সেই কোমল-তৃণাচ্ছন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া, সেই নৈসর্গিক পুষ্পোপহারের অপূর্ব্ব শোভা নিমেষশূন্য চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমাদের মনে হইল না যে আমরা এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিয়াছি, অথবা আমরা দিগন্ত-আচ্ছাদী সুনিবিড় ও সুগভীর অরণ্যের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। যাহাহউক, সুখের স্থানও অল্প, ক্ষণও অল্প। অবিলম্বে এ সকল পার্ব্বত্য অঞ্চলের স্বভাব অনুসারে উতরাই আরম্ভ হইল। উতরাইও বিষম, ক্রমাগতই নামিতেছি, কতই নামিতেছি তাহার সীমাসংখ্যা নাই, মনের আশা, অনুমান নিয়তই ভগ্ন হইতেছে, উতরাই আর শেষ হয় না। যেন পাতালে অবতীর্ণ হইতেছি। নিয়তই এরূপ খাড়া নিম্নে নামিতে থাকা কি কষ্টকর! তাহাও নামিতে হইবে

বলিয়াই নামিয়া যাইতেছি, কোথায় নামিতেছি তাহার স্থিরতা নাই; পথের চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষ্য হইতেছে না। প্রকৃতপক্ষেও পথের চিহ্ন-মাত্র নাই। কেবলই গভীর গড়ান। সেই গড়ানের উপর নিবিড় জঙ্গলের শুষ্ক পাতার রাশি সমস্ত-স্থান এরূপ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে নামিবার সময় প্রতিপদে পদস্খলন হইতেছে। অতি সতর্কতায় প্রতিপদে বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে পাইতে বহুদুর নামিয়া আসিয়া একস্থানে সমতল ভূমি পাইলাম। জঙ্গলেরও তথায় বিচ্ছেদ হইয়াছে। সেই নিম্ন .ভূভাগ হইতে নিবিড়-তরুশ্রেণী-সমাচ্ছন্ন, চতুপার্শ্বস্থ পর্ব্বত-গুলির দৃশ্য কি অদ্ভুতত্তরই বোধ হইতে লাগিল! এমন অদ্ভুত অনন্ত শোভার বিশাল ভাণ্ডার কখনও দেখি নাই! কিন্তু স্থির-চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া যে তাহা দেখিব তাহার অবসর নাই। সে জনশূন্য অপার অরণ্যে সঙ্গিশূন্য হইয়া চলা অসাধ্য। ক্রমে আরও কিছুদুর যাইয়া কতকটা সিধা রাস্তা প্রাপ্ত হইলাম।

এ পার্ব্বত্যপ্রদেশের রাস্তা মোটের উপর তিন প্রকার; চড়াই, উতরাই ও সিধা। চড়াই-উতরাইএর ব্যাপার পাঠকবর্গ নিরন্তর পাঠ করিয়া বিলক্ষণই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। সিধা রাস্তা অল্প বলিয়াই তাহার বিশেষরূপ উল্লেখ হয় নাই। সিধা অর্থে অনেকটা সমতল। এখানকার এই সিধা রাস্তাও জঙ্গলের মধ্যদিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এই সিধা রাস্তায় যাইতে যাইতে হঠাৎ মানুষের মুখনির্গত শিশের মত পরিষ্কার শিশ শুনিতে পাইয়া চমকিত হইলাম। কিন্তু শিশের সম্ভাবনা কোথাও কিছু দেখিলাম না। ক্রমে শ্যামার মধুর ঝঙ্কার কয়েকবার কর্ণে প্রবেশ করিল। বিধাতার ইচ্ছা! এ ভয়ঙ্কর অরণ্যের মধ্যেও এমন সুকণ্ঠ পক্ষিসকল বাস করে! মনে করিলাম, এ নিবিড় নির্ম্মনুষ্য অরণ্যে কে ইহাদের এই প্রকৃতিদত্ত দিব্য কণ্ঠের আদর করিবে? এ যেন সমুদ্রের গভীর গর্ভে মুক্তা-প্রবালের ছড়াছড়ি! এখানে আরও একরূপ

যোগ্যের অনাদর দেখিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ পথ অবরোধ করিয়া, কোথাও পথিপার্শ্বে, সম্মুখসমরে নিহত যোদ্ধার ন্যায় পড়িয়া আছে! কতকাল ঐরূপে পড়িয়া আছে, তাহার সীমা নাই। তাহাদের সেই বিশাল দেহের কতক কতক অংশ মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে, কতক অংশ শীর্ণ হইয়াই দূর-বিস্তৃত অবয়বে কতকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলতঃ সেই সকল সারবান্ বৃক্ষ তৃণতুল্য একবারে মূল্যহীন, মর্য্যাদাহীন ও অপ্রয়োজনীয় অবস্থায় লোকচক্ষুর অগোচরে পতিত থাকিয়া অণু-পরমাণু পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার জন্য অনন্তকালের সহিত যেন যুদ্ধে প্রবৃত্ত রহিয়াছে!

আমরা ক্লান্ত-শরীরে পাংনানায় সামান্য বিশ্রামস্থান পাইয়া এ বন-বাসের উপযুক্ত যথালাভ খাদ্য-পানীয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিয়া অদ্যকার দিন-রাত্রি এখানেই যাপন করিলাম।

—o—
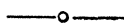
ঝালা।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার।

অদ্য প্রভাতে পাংনানা হইতে রওনা হইয়া ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা ঝালা নামক চটী প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু কিরূপে যে প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আর কি বলিব। এই ৫ মাইলের মত দুর্গম পথ এ পর্য্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হই নাই, বোধ হয় ইহা অপেক্ষা দুর্গম পথও আর কোথাও নাই। প্রথম ১ মাইল আন্দাজ বিষম চড়াই দেখিয়া আমাদের চক্ষুঃস্থির হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর যে উতরাই ক্রমাগত পাওয়া গেল, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। সাধারণতঃ উতরাই অপেক্ষা চড়াই কষ্টকর ও সেইরূপ ধারণাও সকলেরই আছে। কিন্তু এইরূপ ভয়ঙ্কর সুদীর্ঘ উতরাই অপেক্ষা চড়াই সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয়। পর্ব্বতপৃষ্ঠে এমন গড়ান দিয়া আমরা আর

কখনও হাঁটি নাই। প্রত্যেক পা টিপিয়া টিপিয়াও নিস্তার নাই। প্রতি পদক্ষেপেই সকলেরই পদস্খলনের সম্ভাবনা হইতেছে ও মধ্যে মধ্যে সকলেরই পদস্খলন হইতেছে। ঐ পদস্খলন যাত্রীরা যথাসাধ্য সামলাইয়া লইতেছেন। সামলাইতে না পারিলে অর্থাৎ প্রকৃতরূপে পদস্খলন হইলে কি আর রক্ষা আছে? একবারে পাতাল-দর্শন! সে পথ খাড়া উতরাই, তাহাতে বিরল দুর্ব্বাদলমাত্র কি পা আটকাইয়া রাখিতে পারে? তাহাতে আবার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের নুড়ি বা কাঁকর চারিধারে ছড়ানো। তাহাতে ত পা পিছলাইবারই উপায় হইয়া রহিয়াছে। তাহার উপর জঙ্গলের শুষ্ক পাতার রাশিতে পথ অপথ সব ঢাকা। ইহাতে কি পা স্থির রাখিবার যো আছে? আর সেই দারুণ পথও কি ফুরায়? নিরন্তর অভ্যস্ত সতর্কতাতেও অবশে অজ্ঞানে এক একবার পড়িতেছি, সামলাইতেছি, আর চলিতেছি। দাঁড়াইবারও যো নাই, ফিরিবারও উপায় নাই। তা তুমি কাঁদ বা যা কর, মরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে এ পথ অতিক্রম করিতেই হইবে। হায়, এ পথ দিয়া কি মানুষ যায়? ইহা অপেক্ষা ভাটোয়ারি হইতে পূর্ব্বপথে ফিরিয়া যাইয়া হৃষীকেশ হইতে যে-সড়ক রাস্তা কেদারনাথ পর্য্যন্ত সিধা পঁহুছিয়াছে, সেই রাস্তা ধরাই খুব কর্ত্তব্য ছিল, ইহা পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল! সহযোগিনীদিগের তিরস্কার যে ভোগ করিতে হয় নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। এক সিধা পথে বহু ঘোর হইত, এই ত আমার পক্ষের কথা? কিন্তু প্রতিপদে প্রাণ-সংশয় ঘটনার নিকট তাহাও কি একটা উল্লেখযোগ্য কথা? আর এক কথা, সাধুসন্ন্যাসীরাও এ পথে চলিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা চলিতেছেন বা চলিতে পারেন বলিয়া আমাদের কি? কেহ কেহ বিষ খাইয়াও জীর্ণ করিতে পারেন বলিয়া আমরাও কি বিষ খাইব? তাঁহাদের প্রাণ নাই বলিলেই হয়, অথবা তাঁহাদের জীবন অন্যবিধ, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কেন? ফলতঃ অদ্য আমরা যেমন কষ্ট, তেমনি অনুতাপ

ভোগ করিয়াছি এবং এই ৫ মাইল পথ অতিক্রমের পর সকলেই আমরা মনে মনে বুঝিয়াছি যে অদ্য আমাদের পুনর্জীবন লাভ হইল!

সঙ্কটপূর্ণ পথখানি অতিক্রম করার পর ধর্ম্মনদীনামে খরস্রোতা এক পার্ব্বত্য নদী পাইলাম। পাথর ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া নদীটী পার হইলাম। পার হইয়াই ঐ নদীতটে ঝালা চটী। ধর্ম্মশালা এখানে নাই। কিন্তু এই চটীর দোকানদার তাহার শক্তি অনুসারে লম্বা দোচালা উঠাইয়া যাত্রীদের সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া রাখিয়াছে। তদ্‌ভিন্ন স্থানটী বৃক্ষচ্ছায়ায় সুশীতল। আমরা তথায় আশ্রয় লইয়া একটু বিশ্রামের পর স্নানে প্রস্তুত হইলাম। ক্ষুদ্র নদীটির প্রবল প্রবাহে পরিপ্লুত পাষাণখণ্ডের উপর বসিয়া, কখনও প্রখর স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া, সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিতে করিতে আরামের সহিত স্নানে কতই বিলম্ব করিলাম! স্নানান্তে অর্দ্ধমগ্ন ১ খানি পাষাণের উপর পুজা আহ্নিক করিতে কতই তৃপ্তিবোধ হইল। কিন্তু অধিকক্ষণ সে তৃপ্তি অনুভব করিতে পারিলাম না। তৃতীয়া শ্রীমতীর সকল বিষয়েই সাবধানতা কিছু বেশি এবং আমার অন্যমনস্কতাও কিছু বেশি, তজ্জন্য তাঁহার অনুযোগবাক্য অনেক সময়ই আমাকে শুনিতে হইত। বাস্তবিক, আর্দ্র বস্ত্রগুলি শুকাইয়া লওয়া বা পাকাদির চেষ্টা করা, পথে এ গুলি অগ্রে কর্ত্তব্য, শুধু ভাবুকের মত বসিয়া থাকিলে জীবনধারণ হয় না ও এরূপ পথের তীর্থযাত্রা সম্পন্ন হয় না, ইহাও ঠিক। কিন্তু স্বভাব কোথায় যাইবে? আমাকে কিছু চালাইয়াই লইতে হইত। অর্থাৎ চলার শৈথিল্যে আমি কিছু কিছু অনুযোগ ভোগও করিতাম, চারিদিক্ অল্পস্বল্প দেখিয়া শুনিয়া কিছু আনন্দ উপভোগও করিতাম।

বলিয়াছি, স্থানটী বৃক্ষচ্ছায়ায় সুশীতল। যাত্রিগণ কতক বৃক্ষচ্ছায়ায়, কতক চালার আশ্রয়ে পাক আরম্ভ করিয়া দিলেন। দধি, দুগ্ধ, চাউল সবই এখানে মিলিল। খাঁটি দুগ্ধ ৵০ আনা করিয়া সের। অবশ্য এদেশে দুগ্ধ সর্ব্বত্রই খাঁটি। চাউলের সের ।০ আনা করিয়া।

চালাখানির অব্যবহিত পশ্চাতেই নদীটী কুলু কুলু রবে স্নিগ্ধ-প্রখর প্রবাহে, একই ভাবে অবিরামে বহিয়া যাইতেছে। আমাদের জীবন প্রবাহ নয় যে ক্ষণে ক্ষণেই দুঃখ-সন্তাপে দগ্ধপ্রায়, কদাচিৎ শান্তির ছায়ায় স্নিগ্ধ। ইহার স্নিগ্ধতার ব্যাঘাত কেহই কখনও করিতে পারে না।

চটীর সমতলে ও সংলগ্ন পার্শ্বেই সুন্দর জলের এরূপ সুবিধা পাইয়া যাত্রীরা সকলেই স্নান, পান, পাক-ভোজনাদিতে বড়ই আরাম বোধ করিলেন। বিশেষতঃ অদ্যকার পথের অতিকষ্টের পর এই প্রকার সুবিধা ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার মূল্য যেন অত্যন্তই বাড়িয়া গেল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর প্রখর রৌদ্রে এমন সুখকর স্থানে একটু আরাম করিবার ইচ্ছা স্বতঃই প্রবল হইল। কিন্তু আমাদিগের অদৃষ্টে সে আরামের সুখভোগ ঘটিল না। ভোজনান্তে আমাদের সঙ্গী যাত্রীরা সকলেই অদ্য বুড়াকেদার পঁহুছিতে সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, এখান হইতে উক্ত তীর্থ ৫ মাইল মাত্র। এত নিকটে আসিয়া সে দিন এখানেই অতিবাহন করা তাঁহাদের সহ্য হইবে কেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা সমর্থ ও আমাদের অপেক্ষা ভক্ত। তাঁহাদের যেই সঙ্কল্প, অমনি কাল বিলম্ব না করিয়া গাত্রোত্থান। অগত্যা আমাদেরও তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে হইল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। পাংনানা-চটী হইতেই এক বলিষ্ঠ পাণ্ডাযুবক আমাদের সঙ্গ লইয়াছেন ও সর্ব্বদা আমাদের খবরদারি করিতেছেন। প্রথমে আমরা ইহার অনুরোধ গ্রাহ্য করি নাই। কেন না, হরিদ্বারে কেদারের একটী পাণ্ডা আমাদিগকে তাঁহার যাত্রী হইবার জন্য বিশেষ করিয়া আবদ্ধ করিয়াছিলেন। দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত তাঁহার কেদারনাথের ঠিকানা আমাদিগকে দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সঙ্গেই ছিল এবং তাঁহার অনুরোধবাক্যও সর্ব্বদা আমাদের স্মরণে ছিল। নূতন পাণ্ডাযুবককে সে সকলই আমরা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু

তাহাতেও ইনি আমাদের আশা ভরসা ত্যাগ করেন নাই। অধিকন্তু আমাদের সঙ্গ লইয়া অবধি, চটীতে পঁহুছিয়াই আগেভাগে আমাদের অবস্থিতির স্থাননির্দ্ধারণ, আমাদের খাদ্যদ্রব্যাদি আহরণ, সঙ্কট পথে স্থানে স্থানে হাত ধরিয়া ওঠান-নামান প্রভৃতি নানারূপ সাহায্যে কোনরূপে ত্রুটি করেন নাই। কেদারনাথ পঁহুছান পর্য্যন্ত সমস্ত পথ তিনি আমাদের এইরূপ উপকার করিয়া আসিয়াছেন।

মধ্যাহ্নে চটী হইতে নির্গত হইয়াই প্রথমে ঐ নদীর অন্য দিক হইতে আগত এক শাখা পার হইতে হইল। পার হইয়া উপরে উঠিতে কতকগুলি বৃক্ষের প্রতিবন্ধকতায় পথ নিতান্ত দুর্গম দেখা গেল। পাণ্ডাজী ঐ স্থানে আমাদের হাত ধরিয়া উঠাইয়া দিয়া বিশেষ সাহায্য করিলেন। অতঃপর আমরা প্রায়ই ঐ নদীর ধারে ধারে উচ্চ নীচ তট দিয়া, ঝোড় জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, লতা পাতা সরাইয়া সরাইয়া, আসিতে লাগিলাম। গতিপথে কথনও নদীগর্ভে নামিতে হইল, কখন উচ্চ তটে উঠিতে হইল। নিম্ন ও উচ্চ তটে কত রকমের নূতন নূতন বৃক্ষ নয়নগোচর হইল, তাহার সীমা নাই। অনেক দুর ব্যাপিয়া শ্রেণীবদ্ধ একরূপ গাছ পেঁউ-গাছ বলিয়াই বোধ হইল। কঞ্চির ঝাড় অসংখ্য। কঞ্চির ঝাড়ই তাহাকে বলিতে হইবে, বাঁশঝাড় কথনই বলা যায় না। কেন না, শেষ পর্য্যন্ত সেগুলি কঞ্চির ন্যায় সরুই থাকিয়া যায়, তাহা অপেক্ষা মোটাও হয় না, উচ্চও হয় না। একরূপ অতি ক্ষুদ্র ফল পাকিয়া হরিদ্রাবর্ণ ক্ষুদ্র ফুলের মত গাছ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ফলগুলি সুস্বাদ, অম্লমধুর, কিন্তু এ দেশে তাহার আদর নাই, কেন না তাহা থাইয়া পেট ভরে না, অধিকন্তু ডুমুরের মত তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচি আছে। পাণ্ডাঠাকুরও নিষেধ করিয়া কহিলেন উহা থাইলে জ্বর হয়। কিন্তু রৌদ্রে পথবাহন কালে উহা আরও মুখপ্রিয় বলিয়া কাঁটা সরাইয়া সরাইয়া ঐ ফল সংগ্রহে ও তাহার স্বাদগ্রহণে কেহ ত্রুটি করিলেন না।

নিয়ত-পার্শ্ববর্ত্তিনী নদীটীর চঞ্চল প্রবাহ দেখিতে দেখিতে উহার তীরবর্ত্তী তরু-গুল্মলতাকীর্ণ পথে চলিতে হওয়ায় পথের কষ্ট যেমন অনেক সময় অনুভবেই আসিল না, ঐ প্রবাহে ক্রীড়াশীল মন্দ পবনের স্নিগ্ধ স্পর্শেও তেমনি রৌদ্রের কষ্ট আমাদের খুব কম অনুভব হইতে লাগিল। ক্রমে সময়ও অপরাহ্ন হইল, আমরাও ঐ রমণীয় নদীতট দিয়া আসিতে আসিতেই বুড়াকেদার প্রাপ্ত হইলাম। উপস্থিত হইয়াই দেব-দেবের সায়ংকালীন আরতি দেখিতে পাইলাম।

—o—

বুড়াকেদার।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ।

বুড়াকেদার উত্তম রমণীয় স্থান। দেখিয়া আমাদের পথের কষ্ট দূর হইল। যদি তাহাই না হইবে, তাহা হইলে কি এত কষ্ট সহ্য করিয়া এ সকল তীর্থে আসিতে লোকের অনুরাগ ও উৎসাহ হইত? ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধর্ম্মনদীর ধারে ধারে আসিয়াই আমরা বুড়াকেদার প্রাপ্ত হইলাম, বাম ধার দিয়াও দেখিলাম বালগঙ্গা নামে নদী বুড়াকেদারকে বেষ্টন করিয়া উক্ত নদীর সহিত সঙ্গমপ্রাপ্ত হইয়াছে। সঙ্গমস্থান ধর্ম্মকুণ্ড বলিয়া খ্যাত। ঐ স্থানে স্নান তর্পণাদি অতি পুণ্যজনক বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ থাকায় আমরা অনেকটা সমতল ক্ষেত্র ও বসতিস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক ঐ রমণীয় সঙ্গমস্থানে গিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নানাদি করিলাম। অনেক যাত্রী স্ত্রীপুরুষ ঐ স্থানে স্নান করিতেছেন দেখিলাম। সঙ্গমস্থানে প্রবাহদ্বয় আরও প্রবলতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, নদীগর্ভ আরও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে ও অসংখ্য পাষাণখণ্ড ইতস্ততঃ বিকীর্ণ থাকায় উহা অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ ও দুরবগাহ ভাব ধারণ করিয়াছে। সাবধানে আমরা স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া বাসায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বুড়াকেদার মহাদেবের যথাশক্তি অর্চ্চনাদি সম্পন্ন করিলাম।

বুড়াকেদার-দেবালয়ের বাহিরের দরজার সম্মুখেই সদররাস্তা। সেই রাস্তার অপর পার্শ্বেই দোকান ও কতকগুলি ঘর। উহার মধ্যে ১ খানি ঘরের দোতলায় খোলা বারাণ্ডায় আমার অনেকে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। ঐ সকল ঘরের পশ্চাতেই ভৃগুনদী। অসুবিধার কোন কারণ নাই। তবে নদীর পাড় উচ্চ, জল আনিতে অনেকটা নামিতে হয়। ইহা এ পার্ব্বত্য দেশের স্বভাবই। তবে ঘাট খুব নিম্নে নহে, ইহাও ভাগ্য। নদীর অপর পারে গড়ানের উপর ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি দেখিতে অতি সুন্দর বোধ হইল।

আটা, চাউল, দুধ, মিষ্টান্ন খরিদ করা প্রভৃতি বাজারের কাজ অধিকাংশই পাণ্ডাজীর দ্বারা হইত। সঙ্গী বালার দ্বারা কাঠ, জল প্রভৃতি আনার সাহায্য হইত। বাসন মাজার জন্যই কিছু বেগ পাইতে হইত। কখনও তাহার দ্বারা হইত, কখনও সে এমন বাঁকিয়া বসিত যে, কিছুতেই তাহাতে সে স্বীকার হইত না। পাহাড়ী জাতি, স্বভাবতঃ কিছু এক-ঠোকা। তবে অনিষ্টকারী নহে, বিশ্বস্তও বটে।

পাণ্ডাঠাকুর নানাকার্য্যে আমাদের যথেষ্ট সাহায্যকারীই ছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার অন্তঃকরণের উদারতায় বা পরোপকারবুদ্ধিতে নহে, পাণ্ডা-শ্রেণী জীবিকা নির্ব্বাহার্থ যাত্রীদের এইরূপ আনুগত্য করিতেই অভ্যস্ত। তাহাতে কিছু স্বার্থ-সম্পর্ক থাকিলেও অবশ্য সে স্বার্থ তেমন নিন্দনীয় বলা যায় না। আমরা তাঁহার সদ্‌ব্যবহারে আপ্যায়িত হইলেই বাধ্য-বাধকতা জন্মিবে ও তাহার ফলে অবশ্য আমরা তাঁহার যাত্রী বা যজমান হইব, ইহাই তাঁহার আন্তরিক স্বার্থ।

সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সহিত অনেকবার একত্র বাস করা ঘটিল। এই-রূপ একত্র বাসেই গুণাগুণের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম পালন করা সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। তাঁহাদের জীবনের নিতান্ত আবশ্যক জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজসাধ্য নহে। তথাপি তাঁহারা এ পথের পথিক

হইয়া যে এত কায়ক্লেশ, এত চিত্তসংযম করিতেছেন, ইহাতেই তাঁহা-দিগকে আমরা পূজা করি। অবশ্য সকলে ঐ সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভব কি? ততদূর আশাও করিতে নাই। তবে পথস্খলনও মার্জ্জনীয় নহে। নাগা-সম্প্রদায়ভুক্ত একটী সাধুবেশীর মতিগতি আমার ভাল বোধ হইল না, তাহাতেই এ সকল কথার প্রসঙ্গ করিলাম। শতেকের মধ্যে একের ত্রুটি যদিও আমার উল্লেখ না করাই উচিত ছিল, কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমের সর্ব্বোচ্চ গৌরব আমাকে চঞ্চল করিয়াছে বলিয়াই এই ইঙ্গিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আনুষঙ্গিক তুচ্ছ কথা যাউক, মূলের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথার একটু প্রসঙ্গ করি।

এই পর্ব্বতে বালখিল্য নামক মুনিগণ দীর্ঘকাল মহেশ্বরের তপস্যা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। দেবদেব প্রসন্ন হইয়া এই বর দেন যে তোমাদিগের নামানুসারে এই পর্ব্বত বালখিল্যপর্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ হইবে এবং এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্ত্তি-বালখিল্যেশ্বর মহাদেবের যে অর্চ্চনা করিবে বা এই পর্ব্বতে আরোহণ করিবে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হইবে। বালখিল্যেশ্বর মহাদেবই বুড়াকেদার নামে লোকে প্রসিদ্ধ। বুড়াকেদার বিস্তৃত ও উচ্চ পাষাণময় লিঙ্গ। উঁহার গাত্রেও কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে এবং সে গুলিরও পৃথক পৃথক পূজারি ও পাণ্ডা আছেন। বুড়াকেদারের মন্দির বেশ উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটী মধ্যবিধ, মন্দিরের দ্বারগুলি বড় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কিন্তু মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণ বেশ বিস্তৃত। বাহির হইতে প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রথম দ্বারের ভিতর দিকে দুই পার্শ্বেও লোকজন থাকিবার স্থান আছে। প্রাঙ্গণের পূর্ব্বধারে কয়েকটী মহাত্মার সারি সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী সমাধিমন্দির আছে। পূর্ব্বাহ্নে বা অপরাহ্নে প্রাঙ্গণবর্ত্তী প্রশস্ত স্থানটীতে ভ্রমণ করিলে চতুর্দ্দিকের উন্মুক্ত দৃশ্য কি রমণীয় বলিয়াই বোধ হয়! উচ্চভূমিস্থ প্রাঙ্গণ-

সমেত প্রশস্ত দেবালয়টীর পার্শ্বেই নিম্নভূমি। নিম্নভূমিতে লোকালয় ও লোকালয়ের রাস্তা প্রভৃতি। তাহার নিম্নে বালগঙ্গার তটবর্ত্তী হরিতবর্ণ রমণীয় শস্যক্ষেত্র, তৎপরেই নদীপ্রবাহ। অপর-দিকেও নিম্নাংশে রাস্তা ও রাস্তার পার্শ্বে ঘর-বাড়ী ও তৎপরে আরও নিম্নভাগে ধর্ম্মনদী প্রবহমাণা। সম্মুখভাগে উভয় নদীর সঙ্গম পর্য্যন্ত নিম্নস্থানে সমতলক্ষেত্র ও লোকালয়। তৎপরে চতুর্দ্দিকে বিশাল পর্ব্বতপরম্পরা। উচ্চ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দর্শন করিলে এ সমস্তই এককালে নয়নগোচর হওয়ায় উত্তর-কাশী প্রভৃতি অপেক্ষাও এ স্থান সমধিক রমণীয় বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতগুলির মধ্যে উত্তর দিকের অত্যুচ্চ পর্ব্বতটী দেখাইয়া তথাকার কয়েকটী সাধু আমাদিগকে বলিলেন, আপনারা তীর্থ-যাত্রায় আসিয়া ব্যস্ততাসহকারে চলিয়া যান, তাহাতে অনেক দ্রষ্টব্য পদার্থ দেখিতে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। উত্তর দিকে ঐ যে উচ্চ পর্ব্বত দেখিতেছেন, ৫।৭ দিন কষ্ট করিয়া উহাতে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইতেন, উহার উর্দ্ধদেশে অতি রমণীয় সপ্ততালাও (৭টী সরোবর) আছে। কিন্তু স্থানটী বরফে আচ্ছন্ন, জ্বালানি কাঠের তথায় অত্যন্ত অভাব; ছাতু, লবণ, লঙ্কা প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য নীচে হইতেই কয়েক দিনের জন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হয়; এই সকল কষ্টে কেহ ঐ স্থানে উঠিতে চায় না। কিন্তু যতই কষ্ট হউক, অতদূর উর্দ্ধে পর্ব্বতশিখরে অতি নির্ম্মল জলপূর্ণ বিস্তীর্ণ সরোবর কয়েকটী দর্শন করিলেই দর্শনেন্দ্রিয় চরিতার্থ হইল বলিয়া বোধ হয়। আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কৌতূহলান্বিতও যে হই নাই তাহাও নহে। কিন্তু এই দুর্গম পথে স্ত্রীলোক সহযাত্রী কয়েকটীকে রাখিয়া যাওয়াও অসাধ্য, তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াও অতি দুঃসাহস কার্য্য, সুতরাং সকল প্রকারেই ঐ কষ্টকর পর্ব্বতে আরোহণ আমার পক্ষে অসম্ভব ভাবিয়া নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস মাত্র ত্যাগ করিলাম।

ভোঁটচটীর পথে।

৫ই জ্যৈষ্ঠ।

অদ্য প্রভাতে আমরা বুড়াকেদারকে শেষ প্রণাম করিয়া রওনা হইলাম। বাম দিক দিয়া লোকালয়বর্ত্তী নিম্নপথে অবতরণ করিয়া কিছুদূর যাইতে যাইতে চড়াই পথ পাওয়া গেল। ঐ চড়াই ১ মাইলের কিছু অধিক, তারপর অল্প সিধা রাস্তা। পুনর্ব্বার চড়াই আরম্ভ, কিন্তু লোকালয়ের চিহ্ন ও কৃষিকার্য্যের জন্য পর্ব্বতের গড়ান-গাত্রে সামান্য মৃত্তিকা কর্ষণের চিহ্নও মধ্যে মধ্যে আছে। এক স্থানে ১টা মহিষের বাথানও আছে, ঝরণাও আছে। তথায় দধি ও দুগ্ধ মিলিল। যাত্রীরা কেহ কেহ উহা কিছু কিছু পান করিয়া লইলেন। পুনর্ব্বার চড়াই। মধ্যে মধ্যে দুধারে সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষ বিস্তর, কিন্তু চড়াইএর ক্লেশে সে সুখ প্রায়ই অনুভবে আইসে না। সম্মুখবর্ত্তী পথের দিকে চক্ষু থাকিলেও মনোযোগ তাহার প্রতি বড় একটা থাকে না। যাহা কিছু মনোযোগ ক্লান্ত পদদ্বয়ের উপর বা পদদ্বয়ের সার্ব্বাঙ্গিক ক্লান্তির উপর। আরও কিছুক্ষণ পরে আমার পিপাসা অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন আমরা একটা পরিষ্কার ময়দানের মধ্যে আসিয়াছি। পাণ্ডাজী কষ্ট করিয়া জলের জন্য ছুটিলেন, দূর হইতে কিছু জল আনিয়া দিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যগ্র কতকগুলি সহযাত্রীর পিপাসা দূর করিতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল, আমার হাত পর্য্যন্ত পঁহুছিল না। পাণ্ডাজী আবার জলের জন্য ছুটিলেন। আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া সম্মুখবর্ত্তী বৃক্ষতলে শুইয়া পড়িলাম।

শয়ন করিয়া একটু সুস্থ হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম যে, প্রান্তরটী বড় সুন্দর এবং আরও এক সুন্দর ব্যাপার এই যে, ঐ প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে কোন শেঠ ১টা ধর্ম্মশালা প্রস্তুত করিতেছেন। তিনি অবস্থা বুঝিয়াই এই উপযুক্ত স্থানটীতে ঐ

সদ্‌ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা অদ্য এখানে আশ্রয় পাইলাম না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদের ন্যায় শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসার্ত্ত, বহু তীর্থযাত্রী এখানে আশ্রয় পাইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারিবে ভাবিয়া বড় সুখী হইলাম।

পাণ্ডাজী বিলম্বে কিছু জল লইয়া ফিরিলেন, আমার সঙ্গিনীদের অদ্য একাদশী, আমিই সব জলটুকু পান করিলাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হইল না। হইবে কি? সম্মুখেই আবার বিষম চড়াই। উপায় নাই, আবার উঠিতে লাগিলাম। অনেকদূর উঠিতে উঠিতে কিছু উতরাই আরম্ভ হইল। আমরাও নামিতে লাগিলাম, দুই ধারে নিবিড় বনও আরম্ভ হইল। উলঙ্গ পর্ব্বতের রুক্ষ নির্দ্দয় দৃশ্য অপেক্ষা পর্ব্বতের গাত্রে বৃক্ষ-লতা পল্লবময় বনের সমাবেশ দেখিলেও যেন অনেকটা স্বস্তি বোধ হয়। বিশেষতঃ পথের ধারে ধারে অনেক স্থলেই ভ্রাঁস নামক যে বৃক্ষগুলি দেখা গেল, তাহার ফুল অতি মনোহর। যদিও তাহার গন্ধ নাই, কিন্তু ফুল বেশ বড়, পঞ্চমুখী জবার মত। বর্ণ তাহা অপেক্ষাও যেন টুক্‌টুকে লাল। অনেক সময় উহার প্রতি সকলের চক্ষু আকৃষ্ট হইল। ক্রমে পথিপার্শ্বে বন আরও নিবিড় হইয়া আসিল। ছায়ার স্নিগ্ধ স্পর্শে আরও কিছুদূর নামিতে নামিতে ১টী ঝরণাও দেখিতে পাওয়া গেল। দেখিলাম, আমাদের অগ্রে আগত কতকগুলি যাত্রী ঐ ঝরণার নিকটবর্ত্তী নিবিড় বৃক্ষাবলীর ছায়ায় শয়ন করিয়া আছেন। কিন্তু আমাদের সেরূপ গাছতলা মাত্র আশ্রয় হইলে চলিবে না। অগত্যা আবারও কিছুদূর চলিতে হইল। শীঘ্রই আমাদের উপস্থিত ক্লেশের অবসান-চিহ্ন দেখা গেল। অদূরে আমরা ভোঁট নামক স্থানে আসিয়া এক চটী পাইলাম।

—o—

ভোঁটচটী।

দূর হইতে নিম্ন সমতলে চটী দেখিয়া অনেক আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু চটীর ঘরখানি দেখিয়া বড়ই ক্ষুণ্ণমন হইতে হইল। ১খানি মাত্র ঘর, তাহার উপরিভাগে কাঠের আচ্ছাদন প্রায়ই ভগ্ন, কোন স্থানে একবারেই শূন্য। বৃষ্টি আসিলে তথায় তিষ্ঠান ভার হইবে। কিন্তু হিন্দুস্থানী-যাত্রীরা ঐ ভগ্ন ঘরেই স্থায়ী হইলেন। আমরা তাহার নিকটে ২খানি গোহাল-ঘর দেখিয়া বালার পরামর্শে তাহারই মধ্যে অভগ্ন ঘরখানিতে আশ্রয় লইলাম। মাথা উঁচু করিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিবার যো নাই। পাকের ধূম আরম্ভ হইলে সে ঘর হইতে ঐ ধূমরাশির নির্গমের আর উপায় নাই। তাহাও না হয় হউক, কিন্তু সন্ধ্যাকালে গো-মহিষ তাহাদের এই নিজস্ব বাসস্থানে যখন উপস্থিত হইবে, তখন আমরা কিরূপে তাহাদের তাড়াইব? তাড়াইলেই বা তাহাদের মালিক তাহা গ্রাহ্য করিবে কেন? মহা ভাবনা হইল। বালা কহিল, আজিকার জন্য আমি তাহাকে বুঝাইয়া ঐ ভাঙ্গা গোহাল-ঘরেই সেগুলি পুরিয়া রাখিব। পাণ্ডাজীও আমাদিগকে ঐরূপ আশ্বাস দিলেন। আমরা তাঁহাদের কথাতেই একরূপ আশ্বস্ত হইলাম। কেন না, বন্যজাতি বঙ্গদেশীয় লোকের অনুরোধ অবশ্য রক্ষা করিতে পারে।

অদূরে ১খানি ক্ষুদ্র দোকান আছে। দোকানদার সে দিন দোকানের দ্রব্যাদি আহরণ করিতে দূরান্তরে গিয়াছে। তথাপি দোকানে আটা, লবণ ও চাউল ছিল। হিন্দুস্থানীরা বলিলেন, গোটাকতক লঙ্কামরিচ থাকিলেই হইত, কোন অপ্রতুল বোধ হইত না। আমি ভাবিলাম, একটু গুড় থাকিলেই হইত, কোন অসুবিধা বোধ হইত না। যাহা হউক, একাদশী, পাকের আড়ম্বর নাই। ঝরণাটীও মন্দ ছিল না। কয়েকখান

রুটী প্রস্তুত করিয়া মধ্যাহ্ন-কার্য্য সম্পন্ন করিলাম। আর সকলে সে রুদ্ধদ্বার গোহাল-ঘরে ধূমভোগ করিতে থাকিলেন।

অদ্য ৯ মাইল পথ হাঁটা হইয়াছে, তাহার ৬ মাইল চড়াই। সুতরাং আজি আর নড়া-চড়ার কথাবার্ত্তা নাই; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা উপবাস করিয়া আছেন। সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়নে পদ্মনাভ স্মরণ করিলাম। যদিও ঘরের মধ্যে সর্ব্বত্রই উঁচু-নীচু গোষ্পদ-চিহ্ন, তথায় আবদ্ধ গোমূত্র-প্রবাহ ভস্মের আস্তরণে অলক্ষিত, দুই প্রান্তে মৃত্তিকাসংলগ্ন চালের ধারে ধারে শুষ্ক গোময়রাশির উৎসারণে বায়ুর সামান্য গতিপথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ, তথাপি এইরূপ স্থানে এক একখানি কম্বলের শয্যাই কত সুখ-শয্যা বোধ হইল। বাস্তবিক পথশ্রমের এই অতি মহৎ গুণের তুলনাই নাই। কেবল সন্ধ্যাকালে গরুর পাল আসিয়া নিজেদের বাসস্থান বেদখল দেখিয়া, নিজ দখলীস্বত্ব উদ্ধারের জন্য কয়েকবার পীড়াপীড়ি করিয়াছিল ও তাহাতে আমাদের সুখ-শয়নের ক্ষণিক বিঘ্ন হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু বালা ভগ্ন ঘরটিতে অবিলম্বে তাহাদের স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। আবার তাহাদের মালিক আসিয়াও ঐরূপ কিছু গোলযোগ করিলে, বালা তাহাকেও ঐরূপ দু'কথা বুঝাইয়া সুস্থির করিয়াছিল। তৎপরে আর কোন উপদ্রব হয় নাই। বালার ন্যায় বলবান্ পাহাড়ী আমাদের কুটীরের দ্বাররক্ষক থাকিল, আর পাণ্ডাঠাকুর আমাদের সকল কার্য্যেই সহায় ও সঙ্গী আছেন। বিশেষতঃ নিদ্রা সর্ব্বশঙ্কানিবারিণী। সুতরাং এ পথে সর্ব্বত্রই কুটীরই বা কি, আর রাজ-প্রাসাদই বা কি, উভয়ই যেন তুল্যমূল্য বোধ হইয়াছিল।

———o———

গঙ্গোত্রী চটীর পথে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ।

অদ্য প্রত্যূষে সকল যাত্রীই রওনা হইয়া গেলেন। কেবল আমরা এখানে ঝরণার জলে অর্দ্ধস্নান সমাপনপূর্ব্বক যথাশক্তি জপ-পূজা ও একটু জলযোগ করিয়া লইলাম। এরূপ না করিয়া লইলে উপবাসের পরদিন স্ত্রীলোকেরা চলিতে পারিবেন কেন? উপবাসের পর এইরূপ জলযোগের জন্য তাঁহারা কাশীধাম কি হরিদ্বার হইতে পানিফলের আটা কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার সহিত চিনি মিশাইয়া তদ্দ্বারা জলযোগের কার্য্য একরূপ নির্ব্বাহ হইত। চিনি বা গুড় অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। প্রভাতে ঐরূপ কিছু জলযোগ করিলেও দ্বাদশীর দিন স্ত্রীলোকেরা অধিক চলিতে পারিতেন না। বরং একাদশীর দিন তাহা অপেক্ষা বেশি চলিতে পারিতেন। তবে নিত্য পর্য্যটনে এক্ষণে অনেকটা ক্লেশ সহ্য হইয়া গিয়াছিল। অভ্যাসই সকলের মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের রওনা হইতে বিলম্ব হইলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইল না, কেন না অদ্য অধিকাংশই উতরাই ও সে উতরাই তেমন ভয়াবহ নহে। বিশেষতঃ কয়েক মাইল আসার পর কতকগুলি রমণীয় দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় পথক্লেশ অনেকটা কম অনুভব করিতে পারিলাম। পর্ব্বতের উদ্ধত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কয়েক স্থানে কেমন হেলান সুন্দর মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল! যেন বালকেরা সেইগুলির উপর স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে—উঠিতে-নামিতে পারে। কোথাও টোল-টাল নাই, যেন করাত দিয়া পরিষ্কার করিয়া চেরা পর্ব্বতের ঠিক সমতল আধখান সুন্দর হেলান রহিয়াছে! তারপর সেইরূপ পর্ব্বতশ্রেণীর ক্রোড়ে সর্ব্বাঙ্গে দূর্ব্বাদলে মণ্ডিত, উন্মুক্ত ছত্রাকার এমন এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল

যে তাহা অত্যন্ত রমণীয়! ইউরোপীয় জাতি, সুবিধাজনক না হইলেও, এমন সংস্থানের রমণীয় ভূমিখণ্ড পাইলে নিশ্চয়ই তাহার উপর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। আমার কথা শুনিয়া একটী হিন্দুস্থানী সাধু কহিলেন, আপনি এইরূপ একটী স্থান দেখিয়া এত বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন ও এত প্রশংসা করিতেছেন, অবশ্য স্থানটী অতি রমণীয় বটে, কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা অঞ্চলে এই আকারের পর্ব্বত অতি প্রচুর। হিমালয়ের শৃঙ্গমালা অত্যন্ত উন্নত ও সকলই ক্রম-সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছেন, কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যার পর্ব্বতসমূহের উচ্চ ভূমিগুলি সবই আপনার ঐ রমণীয় ভূমিখণ্ডের ন্যায়। আমি বহু ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ঐরূপ রমণীয় আকারের অসংখ্য পর্ব্বতশ্রেণী আর কুত্রাপি দর্শন করি নাই। আমি শুনিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে বিমোহিত হইলাম। সেই সকল প্রদেশ দেখিবার জন্য মনে মনে কতই কৌতুকান্বিত হইলাম। কৌতুকের সহিত কত প্রকার চিন্তাই মনে উদিত হইল! মনে হইল, নাম ও রূপের অনন্ত ভেদ লইয়া প্রকৃতি অনন্তস্থানে কি অনন্তলীলাই বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন! এ ব্রহ্মাণ্ড-বিকীর্ণ লীলার কিরূপে উপসংহার হইবে! কিরূপে ইহা একীকৃত হইয়া সাধকের চিত্তে লয়প্রাপ্ত হইবে! কি আশ্চর্য্য! অভেদে এত ভেদ! একে এত অনন্তরূপ! এই বিশ্বব্যাপিনী মায়া-কুহেলিকার সম্যক্ অন্তর্দ্ধান কতই দুষ্কর, কতই অসাধ্যসাধন! কথোপকথনে সাধুর সমীপে সকল কথাই ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সাধু কহিলেন, অসাধ্যসাধন নহে, তবে অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহাতে সন্দেহ কি? এই দেখুন, আমাদিগের যে চারি ধাম, সপ্ত পুরী, চৌরাশি স্থান ও মহাপীঠাদি পর্য্যটন, দর্শন, সেবন, সকলই সেই নির্গুণ, নিরুপাধি, অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবে উপনীত হইবার উপায়স্বরূপ। তাঁহার সর্ব্বব্যাপিতা, সর্ব্বময়তা, অথচ সর্ব্বনির্লিপ্ততা, অখণ্ড জ্ঞানরূপতা, অপার আনন্দরূপতা বোধ হইতেই তাঁহার পরিচয়ের আরম্ভ। কিন্তু এতদূর পর্য্যন্ত সগুণ ব্রহ্মোপাসনারই

ব্যাপার। আপনারা-আমরা এ সকল তাহাই করিতেছি। পরে গুরুকৃপা হইলে গুরু-বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস হইবে। তখন মনঃপূত, বিঘ্নরহিত স্থানে আসন স্থির করিয়া মহাবাক্য বিচার, বিচারলব্ধ তত্ত্বের ধ্যান, ধারণা ও অভ্যাসযোগে লক্ষ্যপথে অধিরূঢ় হইবার চেষ্টা। এজন্মে যতদূর অগ্রসর হইতে পারা যায়, চেষ্টা করা যাউক। কার্য্য ত কিছুই বৃথায় যাইবে না। জন্মান্তরে অবশ্য আমরা অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইব।

আমি কহিলাম, নিশ্চয়ই অভীষ্টফল প্রাপ্ত হইবেন ও আপনারাই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। আপনাদের পক্ষে অসাধ্যসাধন নহে। তবে অন্যের কথা ইহার মধ্যে কেন? কথাপ্রসঙ্গে আর আমাদিগকে আপনাদের মধ্যে টানিয়া লইয়া কথা কহিবেন না। আমাদের কি অধিকার আছে, কতটুকু শ্রদ্ধা আছে? শাস্ত্রবাক্য যদিও কখন কিছু শুনি, তাহার মর্ম্ম হৃদ্গত করি না। কখনও কিছু আবৃত্তি করি, তাহা শুকপক্ষীর ন্যায় অর্থশূন্য ভাবে আবৃত্তি করি, তদ্গত ভাবে কখনও নিমগ্ন হই না। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিন।

গড্ডু চটী।

সৎকথা প্রসঙ্গেও অনেকটা পথ অতিবাহন হইল। মোট আমাদের ৮।৯ মাইল পথ হাঁটা হইয়াছে, এইরূপ স্থানে একটী খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী পার হইয়া গুড্ডু নামক চটী পাইলাম। নদীপারেই উচ্চতটের উপর এই চটী। নদীটীর নাম ভৃগুনদী, ইহা বিলঙ্গনা নামেই অধিক বিখ্যাত। এই চটী ও ইহার ১ মাইল দূরে গঁওয়ানা-চটী প্রভৃতি স্থান-সকল বিলঙ্গ নামক পটীর অন্তর্গত বলিয়া ইহার প্রচলিত নাম বিলঙ্গনা হইয়াছে। নদীটী টিহরী পর্য্যন্ত গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। আমরা যে ধার হইতে কাঠের পুলে উঠিয়া নদীটী পার হইয়া গুড্ডু-চটীতে

উপস্থিত হইলাম, ঐ ধারেই এই নদীর ১টী প্রখর স্রোতঃশালিনী ধারা আনাইয়া সেই ধারাস্রোতের বেগদ্বারা অনবরত ১টা ময়দা পিষিবার জাঁতা ঘুরাইবার সুন্দর উপায় করা হইয়াছে। ঐ ঘূর্ণমান জাঁতায় গম হইতে ময়দা প্রস্তুতের কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে দেখিলাম। অধিকন্তু, নিম্নবর্ত্তী নদীগর্ভে নামিয়া জল লওয়া অধিক কষ্টকর হওয়ায় লোকে অনবরত পুল পার হইয়া আসিয়া ঐ ধারার জল ব্যবহার করিবারও উত্তম সুবিধা পাইয়াছে। ধারাটীর জল আবার ভৃগুনদীতেই পড়িতেছে। এই নদীর জলও অতি সুন্দর। চটীতে ২।৩ খানি দোকান থাকায় খাদ্যদ্রব্যাদি পাওয়ারও বেশ সুবিধা আছে। সদাব্রতেরও এখানে বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু কি জন্য জানি না, এবার এখানে ও আরও অনেক স্থানে সদাব্রত খুলিতে বিলম্ব হওয়ায় সাধুসন্ন্যাসী লোকের বিশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে আসিতেছি। শেঠ লোক দ্বারা এই সকল লোকের বিশেষ সাহায্য হয় বটে, কারণ তাঁহারা তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া যেখানে যখন ভোজন করেন, তৎকালে তথায় উপস্থিত যাবতীয় লোককেই ভোজন করাইয়া থাকেন, কিন্তু ঐরূপ শেঠ লোক-দিগের তীর্থ যাত্রাও কদাচিৎ হইয়া থাকে। আমাদের ন্যায় মধ্যবিত্ত গৃহস্থ তীর্থযাত্রী দ্বারা বিশেষ কিছু সাহায্য হয় না। যাহা হইয়া থাকে, তাহা ঐরূপ জনতার পক্ষে নগণ্য মাত্র।

আমরা দোকানঘরের পশ্চাদ্ভাগে ছোট ১খানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর পাইলাম। পুল পার হইয়া একে একে স্বেচ্ছামত স্নান করিয়া ও জল লইয়া আসিলাম। শুষ্ক জ্বালানি কাঠের প্রায় কোথাও অভাব হয় নাই। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যও এখানে সব রকম মিলিল। আমরা এই নদীতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র চটীতে অদ্য বেশ যেন একটু আরাম পাইলাম। বৈকালে একটু ঘুরিয়াও দেখিলাম। নদীতীরে সারি সারি কয়েকখানি ঘর আছে। রঘুনাথজীর একটী মন্দির আছে। দেবদর্শনও ভাগ্যে ঘটিল।

গঁওয়ান মাডার পথে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার।

প্রভাতে উঠিয়াই চলিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু অদ্যকার পথের প্রথম হইতেই চড়াই আরম্ভ। এই চড়াই বিষম চড়াই, ১২ মাইল ব্যাপী অতি দীর্ঘ চড়াই। ঐ চড়াইএর শেষে পঁওয়ালির ধর্ম্মশালা পাওয়া যাইবে। অদ্য ঐ দীর্ঘ ও বিকট চড়াই পথের প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই স্থিরতর করা হইয়াছে। সমস্ত পথটা চড়াই হওয়ায় পঁওয়ালির পথ বড়ই কঠিন বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আমরা অদ্য সেই চড়াই পথ অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রভাতে নূতন স্ফূর্ত্তিতে বেশি বেশি পথ অতিক্রম করা যায়, অধিকতর বেগেই পথ লঙ্ঘন করিতেছি। কিন্তু একে চড়াই, তাহাতে সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কটপূর্ণ পথ, কতই অতিক্রম করা যাইবে? চেষ্টা থাকিলেও অতি সাবধানে দুই চারি পা দ্রুতবেগে উঠিয়াই হাঁপাইতে হইতেছে, কখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উর্দ্ধশ্বাস কমাইতে হইতেছে, কোথাও বসিবার স্থান দেখিয়া বসিতে হইতেছে। আবার কোন কোন স্থানে এক-আধটা গাছের শিকড় ধরিয়া উঠিবার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। আহা, গাছগুলি যেন যাত্রীদিগের প্রতি করুণাবুদ্ধিতে পা ছড়াইয়া তথায় বসিয়া আছে! তাহাদের প্রসারিত পা'র ন্যায় সেই শিকড়গুলি ক্লান্ত পথিকের উঠিবার পক্ষে কতই অবলম্বন হইতেছে তাহাদের ছায়াই বা কত শ্রান্তিহারক হইয়াছে কিন্তু সর্ব্বত্র ত এ সকল নাই এরূপ চড়াই পথে গাছ বেশি থাকে না। অনেক স্থলে নি-ধরাণে বাঁকা হইয়া খাড়া উঁচু পথে উঠিতে হইতেছে। পথশ্রমে, রৌদ্রের উত্তাপে, মুহুর্ম্মুহুঃ পানীয় জলের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, কিন্তু এত উচ্চ পথে জল কোথায়? অর্দ্ধপথ না পঁহুছিলে ঝরণা মিলিবে না, আশ্রয়ও মিলিবে

না। অগত্যা নিজ সামর্থ্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ক্রমাগত চলিতে হইয়াছে। একস্থানে আমাদের চড়াই-পথবাহী উচ্চ পর্ব্বতের ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী আর একটী পর্ব্বতের মধ্যে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ক্রমনিম্ন ও রেখাঙ্কিত অসংখ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ক্ষেত্রগুলির ঐরূপ সংস্থানে ও তথাকার শস্যসমূহের হরিত সৌন্দর্য্যে এত কষ্টেও ক্ষণকালের জন্য চক্ষু আকৃষ্ট হইয়া রহিল। অমনি তৃতীয়া শ্রীমতীর সতর্কতার ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, "ভট্‌চায্যি মশাই; পথ চাহিয়া চলুন।" পথ চাহিতে কি আর ত্রুটি আছে? কিন্তু অনবরত এ ভাবে যে আর পারা যায় না! বহু কষ্টে অজ্ঞান-অচৈতন্যভাবে বহুদূর চড়াই অতিক্রম করিয়া আমরা যাত্রীদিগের উল্লাস-কলরবের সহিত শুনিতে পাইলাম, সম্মুখেই এই আমাদের আশ্রয়স্থান "গঁওয়ান-মাডা।"
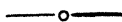
গঁওয়ান মাডা।

আশ্রয়স্থান বটে, বেশ নিবিড় গাছপালা আছে। কিন্তু চটী নহে, একটা মহিষের বাথান মাত্র। তবে একখানি ধাওড়া দো-চালা আছে এবং তাহারই সঙ্কীর্ণ প্রান্তভাগটীতে সামান্য একখানি দোকান আছে। দো-চালাটুকুও অনেক স্থানে ভগ্ন। যাহা হউক, আমরা ঐ ভগ্ন চালার মধ্যে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া একটু মাথা রাখিবার স্থান পাইয়া চরিতার্থ হইলাম। অনেকে তাহাও পাইলেন না। কিন্তু সেখানে গাছ-পালার অভাব ছিল না, অনেকে বৃক্ষমূলই আশ্রয় করিলেন। অনতিদূর নিম্নেই একটী ঝরণাও দেখা গেল। আর দুর্ভাবনার কারণ কি? এক্ষণে সকলেই স্নান-আহ্নিক পাক-ভোজনের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পাক-ভোজনের ব্যবস্থা বৃক্ষমূলেই হইল। যাঁহারা দো-চালার মধ্যেও কিছু স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও পাক-ভোজনের ব্যবস্থা ঐ

বৃক্ষমূলে হইল। আমরা কতক যাত্রীর আগে পঁহুছিলেও আমাদের ঐ ব্যবস্থা কিছু শেষেই হইল। আমি দেখিয়া আসিতেছি, অন্যদেশীয় হিন্দুর অপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দুর পূজাহ্নিক কিছু বিলম্বে হয়। অর্থাৎ বাঙ্গালীর পূজাহ্নিকে কিছু বিলম্ব হয়। তার পর আমাদের সঙ্গিনীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী পাক-ভোজনের স্থান নির্ব্বাচন করিতে করিতে একটী রৌদ্র-পূর্ণ বৃক্ষতলেই ঐ স্থান স্থির করিয়া তথায় পাক আরম্ভ করিয়া দিলেন। এত ছায়াময় বৃক্ষতল থাকিতে তিনি ঐ ঠিকা-রৌদ্রপূর্ণ বৃক্ষতলটাই মনোনীত করিলেন দেখিয়া আমি তাঁহাকে কিছু তিরস্কার করিলাম। তিরস্কার এইরূপ :—বহু বৃক্ষতল যখন সমান ভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে, প্রত্যক্ষ অশুচির কোথাও কোন বিশেষ নিদর্শন নাই, তখন তাহার মধ্যে এত সংশয় উদ্ভাবন করিয়া এই রৌদ্রময় স্থান নির্ব্বাচন করা কেন? এরূপ ঠিকা রৌদ্র ভোগ করিলে নিশ্চয়ই অসুখ হইবার সম্ভাবনা। এ পথে অসুখ হইলে কত বিপদ, তাহা কি বুঝিতে বাকি আছে? এখানে আশ্রয় স্থান পর্য্যন্ত অপ্রাপ্য। আর সকল তীর্থযাত্রীই যখন শুচি-অশুচি বিচার করিয়া কাজ করিতেছে,—তখন তাহাদের সকলের বিচারই কি ভুল হইবে ও আপনার বিচারই ঠিক হইবে? এইরূপ তিরস্কারে তিনি দুঃখিতা হইলেন। কিন্তু আমিও ক্ষণবিলম্বেই ততোধিক দুঃখিত ও লজ্জিত হইলাম। দুঃখ-লজ্জাদির কারণ এই যে, তিনি এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া আমাদের ভাল বৈ মন্দ ত কিছু করিতেছেন না, তবে আমি তিরস্কার করি কেন? তাঁহার মনঃপূতত্ব লইয়া আমারই বা এত অধিক বিচার কেন? তিনি আমাদের সকলের মাননীয়াই ত। বিশেষতঃ অপবিত্রতার অস্ফুট সংশয় অপেক্ষা পবিত্রতার জন্য খুঁটিনাটিও নিশ্চয়ই ভাল। মূল কথা, এ সম্বন্ধে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষেরা অনেকটা উদাসীন এবং সরল ও সহজব্যবহারী বলিয়া অনেক সময় এই সকল কথা উঠিয়া থাকে। যাহা হউক, ঐস্থানেই আমরা ক্রমে ক্রমে ভোজনাদি সম্পন্ন

করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি ছাতা মাথায় দিয়া ভোজন করিলাম, কিন্তু তাঁহারা আগা-গোড়া সে রৌদ্রে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না! করিবেন কেন? আমারই যে ভ্রম! তাঁহারা যে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি! আমাদের সহিত তুলনা হয় কি?

বলিয়াছি, ভোজনাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, কিন্তু নিশ্চিন্ত হইবার বিষয় কি? ক্রমে বেলা অবসানের সহিত যাত্রীর সমাগম এত অধিক হইল যে সাকল্যে যাত্রীর সংখ্যা ৭০ কি ৮০ হইয়া উঠিল। সে চালা খানিতে অতগুলি যাত্রীর সমাবেশের সম্ভাবনা কি? যতদুর সম্ভব, দোচালাখানি পূর্ণ হওয়ার পর অবশিষ্ট সাধু-সন্ন্যাসী সকল বৃক্ষমূল আশ্রয় করিয়া ধুনী জ্বালাইয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে আকাশ ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সর্ব্ব শরীর কম্পিত করিয়া শীতল বায়ু প্রবাহিত হইল। ক্রমে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। অবস্থা দেখিয়া আমরা বৃক্ষতলাশ্রয়ী সাধুগণের উত্তেজনা ও উপদ্রবের অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু দেখিলাম, তাঁহারা সে সকল বিষয়ে যেন দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া আনন্দের সহিত একযোগে ভজন আরম্ভ করিয়া দিলেন। কবীর, নানক, সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কত ভজনই চলিতে লাগিল! ঐ ভজন এমন আবেগ উন্মত্ততার সহিত, এমন অবিরামে গীত হইতে লাগিল, যে তাহাতে সেই স্বভাব-নির্জ্জন, বিশেষতঃ সেই নিশা-কালের একান্ত-নির্জ্জন সমগ্র অরণ্যপ্রদেশ সেই একমাত্র সঙ্গীত ধ্বনিতে যেন পরিপূরিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, আমরা শয্যা আশ্রয় করিয়া সেই স্বরতরঙ্গেই মনঃপ্রাণ নিমজ্জিত করিয়া রহিলাম। কতক্ষণ এরূপে নিমগ্ন ছিলাম বলিতে পারি না, তবে সেই সঙ্গীত-নিমগ্ন অবস্থাতেই যে নিদ্রা-নিমগ্ন হইয়াছিলাম, তাহাতে সন্দেহ নাই। যতক্ষণ জাগিয়া-ছিলাম, বৃষ্টিপাত শব্দ মধ্যে মধ্যে অনুভব হইয়াছে, কিন্তু সেই নিবিড় অরণ্যে দুর্য্যোগ রজনীতে নিরাশ্রয়ে বৃষ্টিসিক্ত উপবিষ্ট অবস্থায় সাধুদিগের

উদ্বেগ ও ক্লেশ ভোগের লক্ষণ আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই। ঠিক্ সেই সময়ে আনন্দ, বিস্ময় ও নিদ্রাবেশের অন্তরালে যে কবিতাটী মনে উদয় হইয়াছিল, সেই দিনের সেই ব্যাপার স্মরণ করিয়া এখন এই গ্রন্থ লিখিবার সময় সেই কবিতা—বিবেকী কবি শিহলনের সেই অমৃত-বর্ষিণী কবিতা মুহুর্মুহুঃ আমার হৃদয়ে উদিত হইতেছে। সেটী এই—

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া, গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ,
সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপনক্লেশা, ন তপ্তং তপঃ।
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং, নচ পুনর্বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতং;
তত্তৎ কর্ম্ম কৃতং যদেব মুনিভি, স্তৈস্তৈঃ ফলৈর্ব্বঞ্চিতম্॥

অর্থাৎ মুনিগণের ন্যায় আমরাও ক্ষান্তি বা সুখদুঃখ মানাপমানাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহারা যেমন ক্ষমাগুণবশতঃ উহা করিয়াছিলেন, আমরা সেরূপে তাহা করিতে পারি না। তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগকেও গৃহোচিত সুখ ত্যাগ করিতে হইতেছে, কিন্তু তাঁহারা যেমন সন্তোষ সহকারে উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমরা সেরূপে তাহা পারিয়া উঠিতেছি না। তাঁহাদের ন্যায় আমরাও দুঃসহ শীত, বাত ও রৌদ্রের ক্লেশ সহ্য করিতেছি, কিন্তু তাঁহারা যেমন ঐ সকল সহ্য করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, আমরা তাহা করি না। তাঁহাদিগের ন্যায় আমরাও অহোরাত্র ধ্যান করিতেছি; কিন্তু তাঁহাদিগের ধ্যানের বিষয় অক্ষয় বিষ্ণুপাদপদ্ম, আমাদিগের ধ্যানের বিষয় অনিত্য অর্থরাশি। এইরূপে, মুনিগণ যে যে কর্ম্ম করিয়াছেন, আমরাও সেই সেই কর্ম্মই করিতেছি, কিন্তু তাঁহারা কৃত কর্ম্মগুলির যে যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা সেই সেই ফলেই বঞ্চিত হইতেছি।

সুখের বিষয়, বৃষ্টির যেরূপ আড়ম্বর সহকারে কয়েকবার উপক্রম হইয়াছিল, বৃষ্টি একবারও সেরূপ হয় নাই। যাহাও হইয়াছিল, তাহাও স্থায়ী হয় নাই। জানি না, ইহা সাধুদিগের পরীক্ষা না অন্য কিছু!

পঁওয়ালির পথে।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।

পাখীর কলরবের সহিত যাত্রীর কোলাহলে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। অদ্য সঙ্কটময় পথের অবশিষ্ট অংশ লঙ্ঘন করিতে হইবে। কল্য মনে করিয়াছিলাম যে আমরা ঐ পথের অর্দ্ধেক আসিয়াছি; কিন্তু তৎপরে শুনিতে পাইলাম, অর্দ্ধেক নহে, ৪ মাইল আসিয়াছি, ৬ মাইল অবশিষ্ট থাকিল। অদ্য সেই ৬ মাইলের পালা! উত্তম, তাহাই হইবে। যাহাতে উপায়ান্তর নাই, তাহাতে কথাও কিছু নাই। বহুযাত্রী প্রভাতে একসঙ্গে রওনা হইলাম। কল্য যে চড়াই ছিল, অদ্যও সেই চড়াই; বিশেষ এই যে, কল্য যতদূর ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি, তাহারই ঊর্দ্ধভাগে ক্রমাগত উঠিতেছি। কিন্তু ঊর্দ্ধই আর কতদূর আছে, তাহাও ত বুঝিতে পারি না। ঊর্দ্ধও কিন্তু চরম বটে, গঙ্গোত্তরীর তুষারাচ্ছন্ন শৃঙ্গসকল এখান হইতে দেখা যাইতে লগিল। পার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় সকল ছোট হইয়া আসিল। ক্রমে সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত-শিখরে উঠিয়া আমরা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইলাম। এই শিখর হইতে যতদূর দৃষ্টি চলে, সকলই পর্ব্বতময় দেখা যাইতে লাগিল! এ-সকল পর্ব্বতেরই রাজ্য, তন্মধ্যে এটী একটী যেন পর্ব্বতের রাজধানী। এ রাজধানীতে পর্ব্বতই অট্টালিকা, পর্ব্বত-চূড়াই উপাসনা-মন্দির, চলন্ত মেঘখণ্ডগুলিই এখানকার যান-বাহন, ইচ্ছামত সেগুলি কখনও নিঃশব্দে চলে, কখনও বা সশব্দে চলে। ট্রামের ন্যায় মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। ভিন্নদেশের লোক আমরা এখানে আসিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। এই ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়া আর একটা শিশু-ক্রীড়া দেখিলাম। শিশুগণ যেমন ধুলা জড় করিয়া বা ইট কুড়াইয়া ক্ষণকালের জন্য খেলার বাড়ী তৈয়ার করে, এই পর্ব্বত-শৃঙ্গে তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া কাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর গাঁথিয়া রাখিয়া

গিয়াছে! কিজানি, এ রাজ্যের অধিবাসীই দেখিতে পাইনা, এ কাণ্ড আবার কাহারা করিয়া গেল, বোধ হয় যাত্রীদিগেরই বা ইহা খেলা হইবে। কিছু করিবার না থাকিলে শিশুর খেলা খেলিতেও মন যায়। বোধ হয় ইহা তাহারই একটা নিদর্শন। একটা কথা, এতদুর উর্দ্ধে উঠিয়াছি, কিন্তু মাথার উপর সেই মেঘগুলি সেই আকারেই দূর আকাশ-পথে তেমনি বিচরণ করিতেছে দেখিলাম। জন্মভূমি বঙ্গভূমির নিম্ন প্রদেশেও ত এই মেঘপুঞ্জকে এমনি উর্দ্ধেই চলিতে দেখিয়াছি; এত উর্দ্ধে উঠিয়াও ত তাহাদিগকে নিকটে পাইলাম না! কিন্তু চিরকালই যেন তাহারা কাছে এই-আসে এই-আসে হইতেছে, আর আমাদেরও তাহাদিগকে এই-ধরি এই-ধরি করিয়া লালসা জাগিয়াই আছে! কি জানি, বিশ্ববিধাতার কিরূপ বিধান-নৈপুণ্য, কেমনই বা রচনা-কৌশল! ধরি-ধরি করিয়া ধরিতে পারিনা, ধরা দেয় দেয় করিয়াও কেহ ধরা দেয় না, যে যেমন সে তেমনই থাকে! তবে এ দেশে আশে-পাশেও মেঘ থাকে। যেমন উর্দ্ধে, তেমনি নিম্নেও থাকে। কিন্তু সবই যেন দূরে দূরে। তবে নিকটে যে একবারেই আসে না, তাহাও নহে; শুনিয়াছি, কাছে কাছেও থাকে, কাছ দিয়াও চল-ফেরা করে। কিন্তু তখন বড়-একটা চেনা যায় না, যেন লুকো-চুরি খেলা করে। সুতরাং সে থাকা-না থাকা সমান। তা ছাড়া, দূরের মূর্ত্তিই দেখিতে বড় সুন্দর, অপ্রাপ্যতাও যেন তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে।

——o——

পঁওয়ালি।

এই স্থান হইতে কিছু কিছু করিয়া উতরাই আরম্ভ হইল। ক্রমে উতরাই পথে চলিতে চলিতে একস্থানে দূর্ব্বাদল-মণ্ডিত এক সুবিস্তৃত, সুরম্য ভূমিখণ্ডে উপনীত হইলাম। এই সমতল-প্রায় ভূমিভাগে পঁহুছিয়া

আমাদের মনে হইল না যে আমরা পর্ব্বতের উপর আছি, বা চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতে বেষ্টিত হইয়া আছি। এই প্রশস্ত ভূমিতে হরিত দূর্ব্বাদলের মধ্যে হরিদ্রাবর্ণের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ও তাহার মধ্যে মধ্যে বেগুনি রঙ্গের বড় বড় ভুঁইচাঁপা এবং মসিনার ফুলের মত আকারে ও মসিনা-ফুলের রঙের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া সমস্ত নিম্ন স্থানটীকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। ঠিক্ যেন বুটাদার উৎকৃষ্ট বেনারসী শাড়ী-কতকগুলি এখানে কেহ প্রসারিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে! বাস্তবিক, দেখিয়া ইচ্ছা হইল, আমাদের এক সরলা বালিকা আছে, তাহার জন্য এই সাড়ীগুলি তুলিয়া লইয়া যাই। যে বালিকার কথা বলিলাম, সে ঠিক্ বালিকা না হইলেও তাহার আচরণ দেখিয়া তাহাকে বালিকাই বলিতে হয়। কেননা, সে যতবার কাশীধামে আসিবে, নূতন নূতন প্যাটার্ণের উত্তম উত্তম বেনারসী সাড়ী কতকগুলি নিয়ত আনাইয়া পছন্দ করিবে ও যাইবার সময় কতকগুলি করিয়া লইয়া যাইবে। তাহার ঐ কাপড়ের খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য তাহার জ্ঞানবান্ ও গুণবান্ স্বামী, অধিকন্তু তাহার দেব-প্রকৃতি দেবর সদাই মুক্তহস্ত। তাইকি সে পাগলী সাড়ীগুলি নিজে ব্যবহার করিবার জন্য রাখিবে? একখানি হয়ত তাহার নিজের ব্যবহারে লাগিবে, আর সবগুলি তাহার ভগ্নী ভাগিনেয়ী প্রভৃতি আত্মীয়া ভালবাসাদিগের আদর ও উপহারের জন্য থাকিবে। মোটের উপর কথা, ঐরূপ ভাল সাড়ী দেখিলেই তাহার তাহা সংগ্রহ করা চাইই। তাই, প্রকৃতিদেবীর এই নবফুল্লকুসুমাস্তৃত বিচিত্র সাড়ীখানি দেখিয়া সত্য-সত্যই তাহা তাহার জন্য তুলিয়া লইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। একবারও বিবেচনা হয় নাই যে এখানি দেবীর নিজের ব্যবহারের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার আর ব্যবস্থান্তর নাই! তা না হউক, মানুষ অবশ্য ইহার অনুকরণ করিয়া সাধ মিটাইতে বাকি রাখে নাই, লোকালয়ে সকলই আছে। কিন্তু আমি সে সকল

কিছু বলিতে চাহিনা, আমি এইমাত্র বলি যে এইরূপ শৈল-সঙ্কট স্থানে এ কি নয়ন-রঞ্জন বিচিত্র ব্যপার! নিতান্ত কঠোর স্থান বলিয়াই কি তাহার মধ্যে এই নিতান্ত-রমণীয়তার সমাবেশ?

এই রমণীয় স্থানের সন্নিকটেই পঁওয়ালি ধর্ম্মশালা। এখানে যাত্রী-দিগের জন্য স্থান যথেষ্ট, ঘর প্রচুর, দোকান অনেকগুলি। এখানে দধি দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী সকলই মিলে, মূল্যও অপেক্ষাকৃত সুলভ।

এইস্থান হইতে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণীর দৃশ্য বড় সুন্দর। সম্মুখস্থ পর্ব্বত বরফে আবৃত। অনেকস্থলে শাদা মেঘের সহিত তুষারাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গ এক হইয়া গিয়াছে, ভেদ উপলব্ধি করা অসাধ্য। যেখানে বরফ গলিয়া গিয়াছে, তথায় পর্ব্বতগাত্রের শ্যামরেখা স্থানে স্থানে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, আকাশপটে সে রেখাগুলিও অতি সুন্দর দৃশ্য। মেঘের রেখা সচরাচর সেরূপ হয় না বলিয়া ঐ গুলি পর্ব্বতেরই শ্যাম অঙ্গ বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে হইতেছে। অনন্ত আকাশ-মধ্যে বহুস্থানব্যাপী মেঘ ও পর্ব্বতের ভেদসূচক সীমা স্থানে স্থানে ঈষৎ নীলাভ সামান্য রেখামাত্রে অবধারণ করিয়া লইতে হইতেছে। আবার মেঘও যথায় নীলবর্ণ, তথায় সেরূপ অবধারণ করিবারও উপায় নাই। সেখানে মেঘে ও পর্ব্বতে আকারে প্রকারে, রঙ্গে ও রূপে, মাখামাখি অভেদ ভাব! উচ্চে উচ্চে, মহতে মহতে, পবিত্রে পবিত্রে, অনিন্দ্য সুন্দর দুই দিব্য পদার্থে এমন অভেদ ভাব, আর এমন একাত্মতা কি সুন্দর দৃশ্য! এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত দিব্য দৃশ্যে আমার অন্তরাত্মা আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া যেন স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

আমাদের ভারবাহী ব্রাহ্মণ বালার মুখে শুনিলাম, এই পঁওয়ালি পর্ব্বতের কাননভাগে কস্তূরীমৃগ সকল বিচরণ করে। টিহরী মহারাজের শাসনে সাধারণ লোকের ঐ সকল মৃগ শিকারে অধিকার নাই। এই পর্ব্বতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত সুদুর্লভ তরু, গুল্ম, লতা সকল পাওয়া যায়। বর্ষাকালে

এখানকার বিশাল অরণ্যে এত অপরিমিত ও অসংখ্য প্রকার পুষ্পরাশি বিকসিত হয় যে তাহার সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে এই প্রদেশ চিত্তোন্মাদকর হইয়া উঠে। আমরা তাহার কথা সকলই সম্ভবপর মনে করিলাম।

---o---

মঙ্গুকা মাড়া।

৯ই জ্যৈষ্ঠ।

পওয়ালির ন্যায় উৎকৃষ্ট চটী ত্যাগ করিয়া অদ্য ১০ মাইল দুরবর্ত্তী মঙ্গুকা মাড়া নামক ক্ষুদ্র এক চটীতে উপনীত হইলাম। এই ১০ মাইল আসিতে যত যত উচ্চ পাহাড় লঙ্ঘন করিতে হইল, সকলই পওয়ালির পাহাড় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পর্ব্বতগুলির শিখর-দেশ দিয়া ক্রমাগত আসিতে হইল। ইহার অনেক স্থানে বরফের উপর দিয়া অতি সাবধানে আসিতে হইয়াছে। এত দিন দূর হইতে পর্ব্বত-শিখরেই রাশীকৃত বরফ দেখিয়া আসিতে ছিলাম। আজি পথের মধ্যেই অনেক স্থানে তুষার-স্তূপের সাক্ষাৎ পাইলাম। ঐ সকল স্থানে যেন কেহ ধূনিত তুলার রাশি ছড়াইয়া রাখিয়াছে, যেন লিভারপুলের লবণরাশি গাদা করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। প্রথমদর্শনে বড় আহ্লাদে অল্প অল্প বরফ-চূর্ণ তুলিয়া লইয়া সেবন করিলাম। ক্রমে পুঞ্জীকৃত বরফরাশি আমাদের গতি-পথ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম ও উতরাইএর পথে ঐরূপ বরফ-রাশির উপর দিয়া চলিতে আমরা প্রমাদ গণিলাম। যাত্রীরা যে যাহার আত্মীয়, নিরন্তর সাবধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহস্র সাবধানেও নিস্তার নাই। যদিও বরফের গাদায় লাঠি পুঁতিয়া পুঁতিয়া ভর দেওয়া যায়, তথাপি পদদ্বয় নিয়তই পিছলাইয়া পড়িতে লাগিল। অনেক যাত্রীই ঐ অবস্থায় বরফ-রাশির উপর বিলুণ্ঠিত হইলেন, স্থূলকায়-দিগের একটু বেশি দুরবস্থা দেখিয়া হাস্য অসম্বরণীয় হইল। বহুপ্রয়াসে

আমরা সেরূপ অপ্রতিভ হই নাই। যাহাহউক, অনেক কষ্টে আমরা উপরি-লিখিত ক্ষুদ্র চটীটা প্রাপ্ত হইলাম। এ চটীতে ১খানি মাত্র দোকান ও ১খানি লম্বা চালা আছে। ঐ চালাখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোঁপে বিভক্ত। চটির ঝরণাটী অতি সামান্য। ঝরণায় যাইবার পথ এরূপ খাড়া-নিম্ন ও সে স্থান এমন অপরিষ্কার যে জলের জন্য ঐস্থানে যাতায়াত করিতে যাত্রীদের কষ্টের একশেষ হইল। অতিক্ষুদ্র, জঙ্গলাবৃত ও অপরিষ্কৃত স্থানে এই ক্ষুদ্র চটী। লোকে যে গাছতলায় বিশ্রাম করিবে, তেমন গাছের ও স্থানেরও এখানে অভাব। অনেক যাত্রী স্থানাভাবে অসময়েই এখান হইতে চলিয়া গেল। এই অসময়ে যাওয়ার জন্য তাহাদের যে বিপদ্ হইয়াছিল যদিও আমরা তাহা জানিতে পারি নাই, কিন্তু তাহা মনে করিয়া আমাদের কষ্ট ও আতঙ্ক হইতে লাগিল। এরূপ হইবার কারণ, ক্ষণকাল পরেই অকস্মাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল এবং প্রবল বৃষ্টি ও তাহার সহিত শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। সে বৃষ্টির বেগে আশ্রয়মধ্যে থাকিয়াও আমাদের কষ্টবোধ হইতে লাগিল, যাহারা নিরাশ্রয় পথের মধ্যে ঐ বিপদে পড়িয়াছে, তাহাদের অবস্থা যে কি শোচনীয় হইয়াছে, সহৃদয় পাঠক অনায়াসে তাহা অনুভব করিতে পারিবেন।

নিশা না আসিতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, বৃষ্টির বেগ সে চালা-ঘরও ভেদ করিয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিল, বৃষ্টির জ্বালায় একজন ছাতা খুলিলে ছাতার জল অন্যের গায় পড়ে তাহা সহ্য হইবে কেন? সকলকেই একভাবে থাকিতে হইল। কতক শয়নে, কতক উপবেশনে সেই সঙ্কীর্ণস্থানে বহুযাত্রী মিলিয়া সেই কষ্টের রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

——০——

ত্রিযুগীনারায়ণ।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

অদ্য আমরা ৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিযুগীনারায়ণ পহুঁছিলাম। ১ মাইল পথ থাকিতে নিম্নপথে অবতরণ করিতে করিতেই মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। এই পথের দুইধারে সুন্দর শস্যক্ষেত্র, তন্মধ্যে আলুর ভূমি অনেক দেখিলাম। আলুর লতাগুলি কেমন সতেজ হইয়া উঠিয়াছে। একত্র এত শস্যক্ষেত্র আমাদের বাঙ্গলাদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে একস্থানে ঘন ঘন অনেক গুলি বসতি, দেখিতে অতি রমণীয় বোধ হইল। চতুর্দ্দিকে বিষম উচ্চ পর্ব্বত, তাহার ক্রোড়ে এমন সুখশান্তিময় সমৃদ্ধ লোকালয়! কি আশ্চর্য্য, উপযুক্ত স্থান পাইলে এ পর্ব্বতময় দেশেও উত্তম বসতি হইতে পারে ও সেরূপ বসতি বিস্তার করিতে কেহ ছাড়ে না, ইহা দেখা গেল। রাস্তার দুই ধারে বিস্তর দোকান। দোকানের উপরে ও পার্শ্বে যাত্রীদিগের থাকিবার স্থান। মন্দিরের অপর পার্শ্বে একটু নির্জন ও উচ্চ ভূমিখণ্ডে উত্তম ধর্ম্মশালাও আছে। আমরা দোকানের উপর ১টী দ্বিতল ঘরেই স্থান পাইয়াছিলাম। অদূরে একটু নিম্নে নামিয়াই মন্দিরের প্রাঙ্গণ পাওয়া যায়। ঐ প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে ৩টী কুণ্ড আছে। একটী ব্রহ্মকুণ্ড, দ্বিতীয়টী রুদ্রকুণ্ড, অবশিষ্টটী মন্দির-সংলগ্ন-পানীয় জলের ক্ষুদ্র কুণ্ড। প্রথম ও দ্বিতীয় কুণ্ডে লোকে স্নান করিয়া থাকে, অপরটী হইতে সর্ব্বসাধারণে সর্ব্বদাই জল লইয়া যায় দেখা গেল। মন্দিরটী প্রাচীন ও পাষাণময়, তন্মধ্যে রৌপ্য-নির্ম্মিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও দক্ষিণে লক্ষ্মীমূর্ত্তি এবং অপর কতকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে। দেখিয়া আমাদিগের বড়ই ভক্তি ও তৃপ্তি হইল। ঐ মূল মন্দিরের দ্বারের সম্মুখ-সংলগ্ন মন্দিরটীতে অগ্নিকুণ্ড আছে।

প্রবাদ এই, জগৎপিতা ও জগন্মাতা হর-পার্ব্বতীর বিবাহকার্য্য এই খানেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ঐ বিবাহকালে যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তদবধি ঐ অগ্নি এই কুণ্ডে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যাত্রিগণ প্রত্যেকেই ঐ পবিত্র অগ্নিতে হোমার্থ কিছু কাষ্ঠ ও ঘৃতাদি দিয়া আসিয়া থাকেন। কি আশ্চর্য্য যুগত্রয়ব্যাপী ঐ দৈব পুণ্যক্রিয়া এ পাপযুগেও কোনরূপে এখানে রক্ষিত ও নিত্য-অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে! ইহা অপেক্ষা আনন্দ ও বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই যজ্ঞকুণ্ড হইতে সকলেই আগ্রহ-সহকারে বিভূতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরাও উহা কিছু সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পবিত্র ও চরিতার্থ বোধ করিলাম। অন্যান্য তীর্থকৃত্যও সম্পন্ন করিলাম। সায়াহ্নে সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর এই ত্রিযুগীনারায়ণের পবিত্র আরতি দর্শন করিলাম।

রাস্তার ধারে দোকানের উপর বাসা লওয়া বড় মুস্কিল। সর্ব্বদা লোকের নীচের দোকানে গতিবিধি থাকে, বাসার যাত্রীরা সর্ব্বদা নীচে নামিয়া দোকানে যাইতেছে, স্থানীয় নীচের লোকেরাও দোকানে যাতায়াত করিতেছে। আমাদের নানা ব্যবহারের জল আমরা অন্যমনস্কে রাস্তার উপরই ফেলিয়া দিতেছি, অন্য দিকে ফেলিবার উপায় নাই। ইহাতে কত লোকের ক্ষতি ও অসন্তোষ হইতে পারে ও তাহা কতবার আমাদের দ্বারা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। অথচ প্রত্যেকবার নীচে নামিয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফেলিয়া আসা বড়ই অনভ্যস্ত ও তেমনি কষ্টকর।

আমার বেশ মনে আছে, আমাদের এক নূতন সহযাত্রী এখানে রাত্রিতে আমাকে নূতন এক রকম হালুয়া তৈয়ারি করিয়া খাওয়াইলেন। ইঁহার নিবাস কাশ্মীরের জম্মুতে। ইঁহার বিষয় একটু বিশেষ করিয়া উল্লেখ না করিলে ভাল দেখায় না। কত কাল এই হিমালয়ের বক্ষে একই উদ্দেশ্যে একই কার্য্যে তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, তাঁহার দেশের সমীপবর্ত্তী তীর্থ জ্বালামুখী, অমরনাথ প্রভৃতিতে তাঁহার সহিত যাইবার

কত কল্পনা করিয়াছি, করিয়া উৎসাহপূর্ণ দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছি, অথচ তাঁহার নামমাত্রও আমার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্তে না থাকিলে একটা যেন নিতান্ত অসঙ্গত কার্য্য করা হয়। কিন্তু তাঁহার নামই আমার স্মরণে নাই, আমার দৈনিক-লিপিতেও লিখিত নাই, কি করিব? ইহার ২।৩ চটী পূর্ব্ব হইতেই তিনি আমাদের সঙ্গী হইয়াছেন বা আমরা তাঁহার সঙ্গী হইয়াছি। এই ব্রাহ্মণ প্রৌঢ়-বয়স্ক, কিন্তু যুবার ন্যায় প্রত্যেক কার্য্যে উৎসাহশীল। খুব স্বাবলম্বীও বটে, একাকী তাঁহার এই সকল উৎকট তীর্থে ভ্রমণ করাই তাহার প্রমাণ। যৌবনে কাশ্মীর-রাজসরকারে কাজকর্ম্ম করিয়াছেন, এক্ষণে সে সব ছাড়িয়া দিয়া তীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। স্ত্রী-পুত্রাদি নাই, মুখেও বৈরাগ্যের পরিচয় দেন ও অবশিষ্ট জীবন তীর্থ-ভ্রমণেই কাটাইবেন, প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার মন ঠিক্ তাহার উপযুক্ত হয় নাই। লোকের নিকট সব কাজে তিনি ঠিক্ ষোল আনা বুঝিয়া লইতে আজিও খুব অভ্যস্ত, এক কড়া কম হইলে তিনি তাহার প্রতিকার করিতে প্রস্তুত। তিনি যে কাজে হাত দিবেন, লোকে ভাল বলুক বা মন্দ বলুক, সেই কাজই তিনি সম্পন্ন করিবেন ও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহা ভাল বলিয়া সমর্থন করিবেন। এই জন্য তাঁহার সহিত কাহারও বাধ্যবাধকতা স্থায়ী হয় না। এই তীর্থযাত্রাতেই তিনি একদল ছাড়িয়া আর এক দলে প্রবেশ করিলেন, ইহা ২।৩ বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই জন্য আমরা তাঁহার সহিত বড় মাখামাখি করিতাম না ও তাঁহার ধার এক পয়সাও গায়ে রাখিতাম না। কিন্তু তিনি খুব আনুগত্য করিতেন। এমন কি তাহার জন্য, তাঁহার অযোগ্য কাজও তিনি আমার সম্বন্ধে করিয়াছেন। যেমন,—আমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পথে এক জায়গায় বসিয়া পড়িয়াছি, তিনিও তথায় বসিলেন ও তাড়াতাড়ি আমার পা-দুখানা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া রীতিমত টিপিতে লাগিলেন। বলিতে নাই, তাহাতে আমি সুস্থ বোধ করিয়া আবার দু-পা বেশ হাঁটিতে পারিতাম। পথে

যাইতে যাইতে খরিদ করিবার যোগ্য কোন দ্রব্য সম্মুখে উপস্থিত পাওয়া গেল, জানিতে পারিলেই তিনি আপন পয়সা দিয়া আমাদের জন্য তাহা খরিদ করিবেন। আমরা কোন্‌কালে চটীতে পঁহুছিয়া অষ্টবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ ব্যাগটী খুলিয়া পয়সা দিতে গেলে তাহা অবশ্য কেনা হইত না। কিন্তু এইরূপ আনুগত্যের জন্য আমাদিগকে কিছু সহ্যও করিতে হইয়াছে। হয়ত ব্রাহ্মণ পাকের সময় কিছু চাউল কিনিয়া আনিয়া বলিলেন, এ কটা আপনাদের ঐ চা'লের সঙ্গে হাঁড়িতে ফেলিয়া দেন। আমাদের ৪ জনের পাকের উপযুক্ত পিতলের হাঁড়ীটীতে না ধরিলেও আমাদিগকে তাহা করিতে হইত। আবার কোন দিন পূর্ব্বাহ্নে না বলিয়া ভোজনকালে একত্র বসিয়া বলিলেন, আমাকে অন্ন করিয়া চাট্টি দিন দেখি। তিনি অন্ন চাহিলেও অবশ্য আমরা অন্ন দিতে পারিতাম না। সময়ে সদাব্রত খোলে নাই বলিয়া কোথাও কতকগুলি সাধু অনাহারী আছেন দেখিয়া তিনি তাঁহাদের জন্য পয়সা সংগ্রহ করিতেছেন, আমাদিগের নিকটেও ঐ পয়সা সংগ্রহ করিয়া লইলেন, উত্তম; কিন্তু কোন দিন ঐরূপ করিবার সময় অন্যে ঐ পয়সা দিতে স্বীকার করিতেছে না, তিনি সাধুদিগকে আমাদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই দেখাইয়া দিলেন। কখনও বা, অন্য দলের দেখাদেখি, গরুড়-ভগবানের সিন্নি দিবার জন্য আমাদের সকলের নিকট কিছু কিছু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, ও সেই পয়সায় ক্রীত মিষ্টান্ন ভোগ দিয়া তাহা দলে দলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিলি করিয়া আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। এরূপ ব্যাপার অনেক সময়েই হইত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐরূপ হইতে থাকিলে অনেক সময় তাহা অসাধ্য হয় ও সেজন্য অপ্রতিভ হইতে হয়। তাহার ফলে শেষে উভয় পক্ষেরই অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠে। তাহা তিনি বুঝিতেন না এবং ঐরূপস্থলে নিজের একটু অভিমতির ভঙ্গ হইলেই, অন্য এক যাত্রীর দলে প্রবেশের জন্য তথায় বেশি আনুগত্য আরম্ভ করিতেন। যাহাহউক,

আমাদিগেরই সহিত তাঁহার বেশি দিন, এমন কি শেষ ছাড়াছাড়ি পর্য্যন্ত, মোটের উপর বেশি সদ্ভাব ছিল। এখনও আমার বেশ মনে পড়িতেছে, তিনি দুই পায়ে পট্টি জড়াইয়া এক সঙ্গে বাহির হইয়া ক্ষণ-মধ্যে আমাদিগকে পশ্চাৎ ফেলিয়া সবেগে অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন, যাইতে যাইতে হাঁপাইয়া একস্থানে লাঠীর উপর ভর দিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আবার আমরা নিকটবর্ত্তী হইয়াছি-কি-তিনি অগ্রসর হইয়া বেগে চলিয়াছেন। আমি যদি একটু গুন গুন করিয়া গান ধরিয়াছি ত তিনি এমনি উচ্চৈঃস্বরে তান ছাড়িতে থাকিবেন, যে আমার কি অন্যের গান করা সেই পর্য্যন্তই বন্ধ, আর অবসর পাইবার যো নাই। সকলে এক সঙ্গে বাহির হইয়াছি, কিন্তু তিনি সর্ব্বাগ্রে চটীতে উপস্থিত হইয়া তথায় আপন ইচ্ছামত আমাদের জন্য স্থান পছন্দ করিয়া বহুদূর কম্বল বিছাইয়া জায়গা অধিকার করিয়া আছেন। পাণ্ডাজীর আসিয়া হয়ত সে জায়গা পছন্দ হয় নাই, তাহা লইয়া উভয়ে তর্কবিতর্ক, বকাবকি, ও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। এস্থলে তাঁহার মন রক্ষা করিতে না পারিলেই আমাদের সর্ব্বনাশ! অনেক সময় দো-টানায় পড়িয়া বিব্রত হইতে হইত। ফলতঃ তিনি তাঁহার স্বভাবানুযায়ী কাজ বরাবর করিয়া গিয়াছেন, অনেক সময় তাঁহার জন্য আমাদের ঐরূপ কিছু কিছু কষ্টও হইয়াছে। তা হউক, সকল দিক্ বুঝিয়া চলিতে পারে, এমন চৌকোস্ সঙ্গী ক-জন পাওয়া যায়? তাই সে প্রবাস-সঙ্গীর আজিও স্মরণ করিতেছি। অনেক কাল তিনি আমাদের মনে প্রিয় অপ্রিয় নানাভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া নিজ দৃঢ়তায় নিজে বিরাজ করিয়াছেন। বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিবার পথে বোধ হয় শ্রীনগরে তাঁহার সহিত আমাদের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল।

———o———
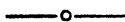
১১ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার।

হৃষীকেশ হইতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত সিধা-সড়ক,

যাহা ত্রিযুগীনারায়ণে আসিয়া মিলিয়াছে, আমরা অদ্য প্রভাতে সেই সড়ক ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের পূর্ব্ব রাস্তা অপেক্ষা এ রাস্তা প্রশস্ত, কিন্তু কেদারনাথের রাস্তা বরাবর চড়াই, তাহার আর উপায় কি আছে? কিছুদূর আসিয়া আমরা এক চটী প্রাপ্ত হইলাম। এই চটীর নিম্নে বাসুকী গঙ্গা মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানের নাম সোণপ্রয়াগ বা সুবর্ণপ্রয়াগ। এই স্থানে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নির্ম্মিত এক উচ্চ পুল ছিল। গিরিনদীর প্রচণ্ড প্রবাহে ঐ পুল সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। দুই তীরের ঊর্দ্ধভাগে তাহার ভগ্নাবশেষ চিহ্ন যৎকিঞ্চিন্মাত্র বিদ্যমান আছে। আমরা নিম্নে নামিয়া নিম্নবর্ত্তী কাঠের পুল দিয়া বাসুকী গঙ্গা পার হইয়া উচ্চ তটে উঠিলাম। এবং মন্দাকিনীর ধারে ধারে চড়াই পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে ৫ মাইল আসার পর মধ্যাহ্নে আমরা গৌরীকুণ্ড প্রাপ্ত হইলাম।

—o—

গৌরীকুণ্ড।

এ স্থানটী ঠিক্ মন্দাকিনীর উপর। মন্দাকিনীও গৌরীকুণ্ডের বহুনিম্নে নহে, যেন সমতলে অবস্থিত ও ঠিক্ পার্শ্বদেশ দিয়া গভীর কল্লোল-কোলাহলে প্রবাহিত। * এই গৌরীকুণ্ড হইতেই কেদারনাথের পুরীর আরম্ভ

* ত্রিপথ্যাস্তৌ মম স্থানাদ্দক্ষিণে শৃণু তীর্থকং। গৌরীতীর্থমিদং খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কং। যত্র ত্বয়া মহেশানি মন্দাকিন্যাস্তটে পুরা। ঋতুস্নানং কৃতং তস্মৈ গৌরীতীর্থমিতি স্মৃতং। মহাসেনস্য উৎপত্ত্যৈ বিস্মৃতং কিং সুমানঘে। তস্মাচ্চিহ্নং প্রবক্ষ্যামি যেন তজ্জায়তে শুভং। কটক্ষং তু জলং তত্র সিন্দূরাভা চ মৃত্তিকা। এতৎস্থানং দেবদেবেশি ন ত্যজামি কদাচন। তত্র গৌরীশ্বরস্ত্বেন খ্যাতোঽহং শিবলোকদঃ। স্নানং করোতি যস্তত্র মৃত্তিকাং শিরসা বহেৎ। স বৈ মম প্রিয়তরো যথা ত্বং মম বল্লভা। স্কন্দপুরাণ, কেদারখণ্ড।

বলিয়া গণনা করা হয়। এখানে যাত্রীদিগের জন্ম আশ্রয় স্থান যথেষ্ট, তদ্‌ভিন্ন ধর্ম্মশালাও আছে। দোকান অনেকগুলি। তাহাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদির কোন অভাব নাই। শ্রেণীবদ্ধ ঘরগুলি প্রায়ই দো-তলা। কিন্তু সবই যাত্রীতে পরিপূর্ণ দেখিলাম। কেদারনাথ গমনকালে ও তথা হইতে আগমন কালে যাত্রীরা এখানে আশ্রয় লয় বলিয়া এখানে প্রায়ই যাত্রীর ভিড় থাকে। আমরা নীচের তলায় সামান্য একটু স্থান প্রাপ্ত হইলাম। সে দিন তীর্থযাত্রী এক শেঠের সেখানে সমাগম হইয়াছে। তাহাতে ভিক্ষার্থী বিস্তর লোকের ভিড় হইয়াছে দেখিলাম। আবার কমিশনার সাহেব, কি পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এইরূপ শাসনবিভাগের পদস্থ কোন রাজপুরুষও নিজ দলবলসহ অশ্বারোহণে পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে অদ্য এই চটীতে উপস্থিতপ্রায় বলিয়া আরও জনতাবৃদ্ধি এবং জনমণ্ডলীতে একটা সম্ভ্রম-সতর্কতার ভাব দেখা গেল। ভিড় ঠেলিয়া আমরা দেবস্থান দর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, প্রশস্ত অঙ্গনের মধ্যে মন্দির এবং মন্দির-মধ্যে গৌরী ও শঙ্করের মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। নিকটেই গৌরীকুণ্ড, তাহার জল সুশীতল। তৎপরেই তপ্তকুণ্ড, তাহার জল বেশ উত্তপ্ত। তপ্তকুণ্ডের ঝরণার মুখ পিতলের গোমুখী দ্বারা বাঁধান। বেশ জোরে গরম জল ঐ মুখ দিয়া পড়িতেছে। যাত্রীরা সঙ্কল্পপূর্ব্বক উভয় কুণ্ডেই স্নান করিতেছে। কুণ্ডদ্বয়ের নিম্নেই প্রখর ও শীতল প্রবাহে মন্দাকিনী প্রবহমাণা। অতঃপর আমরাও আর বিলম্ব করিলাম না, উভয়কুণ্ডে স্নান করিয়া মন্দাকিনী হইতে জল আহরণপূর্ব্বক নিত্য পূজাদি সম্পন্ন করিলাম ও গৌরী-শঙ্করের অর্চ্চনা করিলাম। ইহার পরই তাঁহাদের নিত্যপূজা ও ভোগাদি সম্পন্ন হইতে দেখিলাম। অতঃপর নিজেদের আর্দ্রবস্ত্রাদি মন্দিরের প্রাঙ্গণেই শুকাইয়া লইলাম। আমাদের গাত্রবস্ত্রাদি তপ্তকুণ্ডে কাচিয়া পরিষ্কার করাতেই আর্দ্রবস্ত্র অনেকগুলি হইয়াছিল। এখানে গাত্রবস্ত্রাদি পরিষ্কার করার

বিশেষ কারণ এই যে, পার্ব্বত্য দেশে গাত্রে ও গাত্রবস্ত্রে একরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কীট জন্মিয়া থাকে। তাহাতে গাত্রে চুলকানি ও ক্ষত উপস্থিত হইয়া বিশেষ কষ্টদায়ক হয়। গরম জলে পরিষ্কার করিলে বোধ হয় ঐ কীট ও কীটক্ষত উপশম প্রাপ্ত হয়। যাহাহউক, যাত্রীরা সকলেই তপ্তকুণ্ডের উত্তপ্ত জলে পিরাণ প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে লাগিলেন দেখিয়া আমরাও স্নানান্তে ঐ সকল বস্ত্র তথায় পরিষ্কার করিয়া লইলাম।

—o—
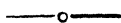
রামবাড়ী চটী।

এখানে সবই ভাল, কিন্তু শৌচাদির জন্য ময়দানের বড় অভাব। মন্দাকিনীর উপর সামান্য একটা পুল আছে, তদ্দ্বারা যাত্রীরা অনেকে অপর পারে যাইতেছেন দেখিলাম। কিন্তু সে পারেও পর্ব্বত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, গড়ান স্থান না থাকারই মধ্যে। যেটুকু আছে, তাহা বহু লোকসমাগমে অগম্য হইয়া আছে।

মধ্যাহ্নের ব্যাপার সম্পন্ন হওয়ার কিছুকাল পরেই যাত্রীদিগের কলকল শুনিতে পাইয়া পাণ্ডাজীকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলাম। পাণ্ডাজী কহিলেন, সকলেই এ চটী হইতে রওনা হইয়া ৪ মাইল অগ্রবর্ত্তী রামবাড়ী চটীতে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে। কেন না, অগ্রবর্ত্তী ঐ চটীতে অদ্য পঁহুছিয়া থাকিতে পারিলে, কল্য তথা হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী কেদারনাথে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই পঁহুছিয়া দেবদেবের দর্শন-পূজাদি সমস্ত কার্য্যই করা যাইতে পারিবে।

আমরা দেখিলাম, উহাদিগের যুক্তি মন্দ নয়। বিশেষতঃ অভীষ্ট পথে যতদূর অগ্রসর হইয়া থাকা যায়, ততই ভাল। সুতরাং আমাদেরও আর এখানে বিলম্ব করা হইবে না। এই স্থির করিয়া অন্যান্য যাত্রীর সহিত আমরাও অগ্রবর্ত্তী চটীর উদ্দেশে রওনা হইলাম।

রওনা হইলাম বটে, কিন্তু এ পথটা অত্যন্ত খারাপ। চড়াই ত বটেই, অধিকন্তু স্থানে স্থানে অতি দুর্গম। বৃষ্টিপাতে বা ঝরণার উৎপাতে পথের ঐ সকল স্থান ধ্বসিয়া গিয়াছে। সেই স্থানগুলিতে সামান্য বৃক্ষ-শাখাদির ছাউনি করিয়া দিয়া পাহাড়ী মুলুকের উপযুক্ত দুঃসাহসের কাজ করিয়া রাখা হইয়াছে। মনে করিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু তাহাই চক্ষে দেখিয়া তাহার উপর সাবধানে পা ফেলিয়া যাইতে হইতেছে। কথায় বলে, দৈবের কিছু একটা হাত-পা নাই। সেই দুর্দ্দৈব যে কখন কাহার উপর দিয়া ফলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আবার স্থানে স্থানে পথের পরিসরও তেমনি অল্প। সেই পথ বহিয়াই সকলে চলিতেছে, আমরাও চলিলাম। অপরাহ্ণে রামবাড়ী নামক চটী প্রাপ্ত হইলাম।

এ চটীতেও দোকান যথেষ্ট, যাত্রীদিগের জন্য স্থানও যথেষ্ট। কিন্তু গৌরীকুণ্ডে যেমন প্রায়ই দো-তলা মোকান, এখানে তাহা নাই। তবে দোকানগুলিতে যাত্রী তেমনি পরিপূর্ণ বটে। সম্মুখবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে একটা ঝরণা নামিয়া আসিয়া চটীর মধ্য দিয়া স্থূলধারায় বহিয়া যাইতেছে। তাহারই উভয় পার্শ্বে দোকানের শ্রেণী। দোকানগুলির সমাপ্তি স্থলেই মন্দাকিনী প্রবাহিত। তাহাও প্রায় সমতলে, ঘাটে নামিতে কষ্ট নাই। আমরা সম্মুখবর্ত্তী যাত্রিপূর্ণ দোকানগুলি ত্যাগ করিয়া ঝরণার পারে ১খানি দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

আমাদের দোকানে আশ্রয় লওয়ার পরই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঝম ঝম শব্দে বিলক্ষণ বৃষ্টি, বৃষ্টির বিরাম নাই। মেঘাচ্ছন্ন দিনের দুর্য্যোগের অন্ধকারসহ সায়াহ্নের অন্ধকার দেখিতে-দেখিতেই ঘনীভূত হইয়া গেল। দোকানের পশ্চাদ্‌ভাগেই প্রবহমাণা মন্দাকিনীর গভীর গর্জ্জন যেন আরও গভীরতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য আমরা যেন বিব্রত ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। আমাদের সম্মুখেই বহু সংখ্যক ভারবাহী ছাগলের পাল সেই খাড়া বৃষ্টিতে ভিজিতে দেখা গেল।

বেচারাদের পিঠ হইতে তাড়াতাড়ি করিয়া ভারগুলি নামাইয়া লইতে ও সেগুলি সামলাইতেই তাহাদের প্রভুর বহু বিলম্ব হইল। কিন্তু ছাগলের পাল তাহা মানিবে কেন? বিশেষতঃ ছাগজাতি বড় বৃষ্টিভীত, স্থান না পাইয়া তাহারা বড়ই ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তখন বহু কষ্টে তাহাদের প্রভু একটা দোকানে তাহাদের স্থান সমাবেশ করিয়া দিল।

বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তেমনি শীত। আমরা গাত্রবস্ত্রে গা ঢাকিয়া জড়-সড় হইয়া বসিলাম। সন্ন্যাসীরা ধূনী জ্বালিলেন। আমাদের যতক্ষণে এতগুলি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল, ততক্ষণ আমাদের দোকানদার চুপ করিয়া আমাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিতেছিল। এক্ষণে আর সহ্য না হওয়ায় দোকানপূর্ণ অসংখ্য যাত্রীর সম্মুখে উদ্ধতভাবে দাঁড়াইয়া রুক্ষস্বরে বলিতে লাগিল—যো কুছ্ সৌদা লেনা হো, জল্‌দি জল্‌দি লো। আগে লো, তব্ ঠহরো। কেহ কিছু কথা কহেন না। তখন কে কার কথা শুনে? সকলেই বিব্রত। আর দোকানদারের পুঁজির মধ্যে ত সেই আটা, ঘি ও গুড়? তা যে যাহা লইবেন, একটু সুস্থির হইয়াই লইবেন। এ দিকে বৃষ্টিও তেমনি মুষলধারে আরম্ভ হইল, আর তার সঙ্গে তেমনি প্রবল শিলাবৃষ্টি! মুহূর্ত্তমধ্যে দোকানের সম্মুখবর্ত্তী স্থান শিলাবর্ষণে শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল এবং মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ-ঝলসে ঐ পুঞ্জীভূত শ্বেত শিলাসকল বিভীষিকার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখন দোকানদার ঐ শিলাবর্ষণেরই মত কঠোর বাক্য বর্ষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, কুছ্ লেনা নহি হো, তো চলে যাও হিঁয়াসে। এবার যাত্রীরা বিবেচনা করিয়া কিছু উত্তর করিতে না করিতে আবার আরম্ভ করিয়া দিল—নিকৃলো হিঁয়াসে, অভী নিকৃলো। অপ্‌নে ঘর্‌কে ঐসা বিছোনা বিছাকর্ সো গয়ে! বাঃ ক্যা তামাশেকী বাত হ্যায়! কিস্‌কে হুকুম্‌সে হিঁয়া ঘুসে হো? যিনি ধূনী জ্বালাইয়াছিলেন, তাঁহার দিকে ছুটিয়া গিয়া কহিল—অ্যায়্ সাধু, ধূনী জলাকর্ মেরি দুকান ময়লী মৎ করো।

হয়ে ঢুকান, ধরমশালা নহী! সাধু ধূনী নির্ব্বাণ করিলেন। যাত্রীরা কেহ গুড়, কেহ আটা লইতে চাহিলেন। কিন্তু শুদ্ধ গুড় বা শুদ্ধ আটা কাহাকেও দিবে না, প্রত্যেককে উভয় জিনিষই কিছু কিছু করিয়া লইতে হইল। আমরা ভাবিলাম, এ রামবাড়ী নয় বাবা, এ যমের বাড়ী আসিয়াছি! এখন উপায়? খাবার প্রয়োজন না থাকিলেও থাকিবার প্রয়োজন ত আছেই। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্মণাদির বিধবাগণ যে দিনে দুইবার করিয়া পাক করিয়া খান না, তাহা ত এ লোক কিছুতেই বুঝিবে না। অগত্যা আমরা প্রত্যেকে কিছু কিছু করিয়া ঘর-ভাড়া দিতে চাহিলাম। তাহাতে সে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, ক্যা, মেঁই মুসলমীন লোগ হ্যায়? আচ্ছা দে'কে কেরেয়া লেঙ্গে? আমি মনে মনে কহিলাম, আহা কি ধার্ম্মিক লোক, আর কি আশ্রয় দেওয়া! যাহা হউক, এই সময়ে আমাদের পাণ্ডাজী ভিজিতে ভিজিতে অন্য দোকান হইতে এই অভিপ্রায়ে আমাদের দোকানে আসিয়া উপস্থিত, যে আমরা সেই ভয়ানক দুর্য্যোগে কোথায় গিয়া কিরূপ আশ্রয় পাইলাম। আমরা তাঁহাকে আমাদের শোচনীয় অবস্থার কথা জানাইলাম। পাণ্ডাজী দোকানদারকে নানা কথায় বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলেন, অথবা আমাদের সমস্ত ত্রুটির ভার তিনি নিজস্কন্ধে লইলেন। কেননা সেই অবধি দোকান-দার আমাদিগকে আর কিছু বলিল না। পাণ্ডাজী তাহার ক্রোধাগ্নি কোনরূপে নির্ব্বাণ করিয়া পুনর্ব্বার ভিজিতে ভিজিতে অন্য দোকান হইতে আমাদের জন্য দুধ ও পেড়া আনিয়া দিলেন। আহা, বেচারার এই অত্যাচারেই পরদিন জ্বর হইয়াছিল। আপাততঃ আমাদের দোকান-দারের ভয় গেল, কিন্তু পথে বরফ পড়ার ভয় মনে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কেননা, এখানে এইরূপ বৃষ্টি উপর্য্যুপরি হইলেই চারিদিকে বরফ পড়ে ও পথ বন্ধ হইয়া যায়। আমরা ভীত-চিত্তে দেবদেবের চরণে অভয় প্রার্থনা করিতে করিতে নিদ্রার বশীভূত হইলাম।

১২ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, আকাশ পরিষ্কার, মেঘের লেশও নাই। সুতরাং পথও পরিষ্কার, শীঘ্র বরফ পড়িবার সম্ভাবনা নাই। দেবতার কৃপায় চিত্তে অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার হইল, দেবদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষাও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। আর অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমরা সকলে রওনা হইয়া পড়িলাম।

যদিও চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু উদ্দীপ্ত কৌতূহলে তেমন ক্লেশ আর বোধ হইতেছে না। অধিকন্তু স্থান-মাহাত্ম্যে অন্তঃকরণ কেমন যেন প্রসন্ন হইয়া আসিতেছে। আমরা প্রসন্ন-মনে চতুষ্পার্শবর্ত্তী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে দেখিতে মন্দাকিনীর উচ্চতীরের পথ দিয়া চলিয়াছি। স্থানে স্থানে মন্দাকিনীর প্রবাহ তুষার-স্তূপে একবারে ঢাকা পড়িয়াছে। কোথাও তিনি ঐ আচ্ছাদন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভার-মুক্তের ন্যায় যেন প্রবল প্রবাহে ছুটিয়াছেন। কোথাও আমাদের গতি-পথেও তুষাররাশি বহুদূর প্রসারিত হইয়া পড়িয়া আছে। আমরা তাহা বিদলিত করিয়া চলিয়াছি। যাইতে যাইতে সম্মুখে এক স্থূলধার নির্ঝর পাইলাম। উচ্চস্থান হইতে তাহা বহির্গত হইয়া প্রবলধারে মন্দাকিনীর অভিমুখে গড়াইয়া পড়িতেছে। আমরা তাহা পার হইয়া চলিলাম। প্রায় দুই মাইল দূর হইতে কেদারনাথের মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। যাত্রি-গণ একযোগে "কেদারনাথ মহারাজকী জয়" ধ্বনি মুহুর্মুহুঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রশস্ত প্রান্তর, পবিত্র মুক্ত বায়ুপ্রবাহ কৈলাসধাম আসন্ন বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। কৈলাস-পর্ব্বতের তুষার-শুভ্র স্বচ্ছ কান্তি-জ্যোতিঃ আমাদের নয়নের উপর প্রতিভাত হইতে লাগিল। আরও কিয়দ্দূরে আসিয়া আমরা মন্দাকিনীতীরে অবতীর্ণ হইলাম। সেতুর উপর দিয়া মন্দাকিনী পার হইলাম। সেতুর অদূরে সরস্বতীগঙ্গা আসিয়া মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। অর্থাৎ

কেদারনাথের অধিষ্ঠানভূমিকে মন্দাকিনী ও সরস্বতী * উভয়ে বেষ্টন করিয়া আছেন। কি পবিত্র স্থান! চতুর্দ্দিকে তুষার-শুভ্র পর্ব্বতে বেষ্টিত, স্নিগ্ধ পবিত্রধার দেবনদীযুগলে আলিঙ্গিত কি পবিত্র ক্ষেত্র! এ দিব্যধামের বর্ণনা আমি ক্ষুদ্র শক্তিতে ক্ষুদ্র লেখনীমুখে ব্যক্ত করিতে পারি না।

আমরা ঘাটে নামিয়া, ইতস্ততঃ আকীর্ণ বড় বড় পাষাণখণ্ডের মধ্য হইতে উচ্ছলিত মন্দাকিনীবারি স্পর্শ করিলাম। ঘাট হইতে উপরে উঠিয়া বাজারের দুইধারে ধর্ম্মশালা ও দোকানগুলির মধ্য দিয়া পথিমধ্যস্থ প্রথম মন্দির অতিক্রম পূর্ব্বক সুবিশাল দ্বিতীয় মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলাম ও ধূলিপায়ে যথাশক্তি ভক্তি উপহারে দেবদেব কেদারনাথের দর্শন করিলাম। দর্শন করিয়া আকাঙ্ক্ষা মিটে না। পাণ্ডাজী আমাদের নিরস্ত করিয়া কহিলেন, এখন এই পর্য্যন্ত। আসুন, মন্দাকিনী-স্নান করিয়া আসিয়া দেবদেবের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চনাদি করুন। পাণ্ডাজীর উপদেশ অনুসারে আমরা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় লইয়া প্রথমতঃ মন্দাকিনী-স্নানে চলিলাম। ঘাটে উপস্থিত হইয়া স্নান করা সঙ্কট হইল। কারণ, সে মধ্যাহ্নেও সূর্য্যদেব দর্শন দিতেছেন না। সুতরাং সে স্নান যিনি যে রকমে পারিলেন, সেইরূপেই সম্পন্ন করিয়া লইলেন। সে তুষার-শীতল প্রবাহে ৩ বার মস্তক নিমজ্জন করে, কাহার সাধ্য? একবার মজ্জনেই শরীর অসাড় হইয়া যায়। আর প্রবাহও তেমনি প্রখর। বহু ভাবাভাবনার মধ্যে একরূপে স্নানকার্য্য সম্পন্ন করা হইল।

স্নানান্তে যথাসাধ্য উপচার সংগ্রহ করিয়া আমরা পাণ্ডা সহ দিব্য সৌরভময় স্বর্ণচূড় মন্দির মধ্যে প্রবেশিয়া ভগবান্ কেদারনাথের অর্চ্চনা

* কেদারখণ্ডে ইহা ক্ষীরগঙ্গা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—ক্ষীরগঙ্গাতু যা ধারা মন্দাকিন্যাস্তু সঙ্গমে। শিবপ্রদং মহাতীর্থং শ্লোকহর্ত্তঃ প্রকীর্ত্তিতং। যত্র স্নাত্বা নরারোহে কৈলাস নিলয়ে বসেৎ।

করিলাম। পরে তাঁহার বিশাল পাষাণময় লিঙ্গমূর্ত্তি ঘৃতাভ্যঙ্গ করা হইলে আমরা বক্ষঃস্থল পাতিয়া প্রাণ ভরিয়া তাহা স্পর্শন ও আলিঙ্গন করিলাম। কি সৌভাগ্য, কি আনন্দ! আজ আমাদের কত কালের বাঞ্ছিত পূর্ণ হইল! আমাদের এতদিনের সমস্ত ক্লেশভোগ সার্থক হইল! সংসারের শত অভাব-আকাঙ্ক্ষা, বিপত্তি-বিড়ম্বনা আজ কিছুই আর মনে নাই! দেবদ্বারে দিব্যধামে কি আর অন্য চিন্তা থাকে? আমরা প্রণতি, প্রদক্ষিণ ও চরণামৃত পানপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নির্গত হইলাম।

ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, সাধু-সন্ন্যাসী নানা সম্প্রদায়ের যাত্রী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, সাধারণ ও বহুমূল্য বিবিধ উপচারে দেবদেবের অর্চ্চনা করিলেন, দান-ধ্যান করিলেন। দেবতার অবারিত দ্বারে শক্তি অনুসারে অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যই সার্থক হইতেছে। শুনিলাম শ্রাবণ মাসে সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতের তুষারাচ্ছন্ন উর্দ্ধভাগে ভূরি ভূরি কমল প্রস্ফুটিত হয়। পাণ্ডাগণ সবিশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক রাশি রাশি ঐ সকল প্রফুল্ল কমল আহরণ করেন। ধনবান্ যাত্রী বহুমূল্যে ক্রয় পূর্ব্বক ঐ দিব্য পুষ্প কেদারনাথের মস্তকে চড়াইয়া থাকেন। আমাদের সে ভাগ্য কোথায়? আমরা অনেক অগ্রেই এখানে পঁহুছিয়াছি। উপস্থিত ক্ষেত্রে যেরূপ যাহা সংযোগ হইল, তদনুরূপ কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলাম। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগ-স্থিত অমৃতকুণ্ড হইতে চরণামৃত লইয়া পান করিলাম। সমীপে হংসকুণ্ড ও রেতকুণ্ড নামে দুইটী কুণ্ড আছে, পাণ্ডার উপদেশানুসারে তাহার জলে আচমন করিলাম। অগ্রে উদককুণ্ড নামে আর এক কুণ্ড আছে। তাহারও প্রচুর মাহাত্ম্যের কথা শুনিলাম।

কেদারনাথের মন্দির পাষাণময়। মন্দিরটী বৃহৎ ও অতি প্রাচীন। মন্দিরের বাহিরে মন্দিরের সংলগ্ন অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কেদারনাথের মোহান্ত রাওলসাহেব ঐ ভগ্ন স্থানগুলির সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। মন্দিরের সম্মুখভাগে ইতস্ততঃ অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী,

ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি মূর্ত্তি অনেক আছেন। মন্দিরের সম্মুখে একটী পাষাণময় বৃহৎ বৃষ আছে।

কেদারনাথের স্নপন, পূজন, স্পর্শন, মার্জ্জন, আলিঙ্গন সকল কার্য্যেই যাত্রীদিগের সম্পূর্ণ অধিকার। মহাদেবের অর্চ্চনায় সর্ব্বত্রই ঐরূপ রীতি দেখিতে পাই, কেবল পশুপতিনাথ ও সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

কেদারনাথ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গ। যথা—

'সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনং।
উজ্জয়িন্যাং মহাকাল মোঙ্কার মমরেশ্বরে।
কেদারং হিমবৎ-পৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করং।
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে।
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে।
সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘুস্মেশং শিবালয়ে॥ শিবপুরাণ।

কেদারেশ্বরের পুরীতে শীত অত্যন্ত অধিক। শীতকালে সমগ্র পুরী বরফে আবৃত হইয়া যায়। ঊর্দ্ধ, অধঃ, চতুষ্পার্শ্ব সমস্তই যেন ক্ষীরসমুদ্রের ধবল প্রবাহে পরিপ্লুত হয়! পথ, ঘাট, মন্দির, প্রান্তর, পর্ব্বত, জল, স্থল কিছুই আর লক্ষিত হয় না। দশদিকে একমাত্র ঐ বিশদ প্রভাপুঞ্জ স্ফুরিত ও উদ্ভাসিত হইতে থাকে! নিষ্কলঙ্ক, নিত্যশুদ্ধ দেবদেবের পূর্ণ বিভূতি যেন দেশ-কাল-পাত্র বিলুপ্ত করিয়া বিদ্যোতিত হয়! কিন্তু কে সেই দিব্য শোভার দর্শক? তিনি আপনিই তখন দৃশ্য, আপনিই তখন দর্শক! কেদারনাথের উত্তর ও পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী পর্ব্বতের সমগ্র ঊর্দ্ধভাগ এখন এ জ্যৈষ্ঠমাসেও তুষার স্তূপে সমাবৃত হইয়া কি অপূর্ব্ব ধবল-নির্ম্মল কান্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে! দেবদেবের পূর্ণ অধিষ্ঠানভূমি বুঝি এমনি ধবল-নির্ম্মলই হইতে হয়! এই অমলোজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জ চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইয়া যেন সদানন্দের উন্মুক্ত অট্টহাস্যের অপূর্ব্ব

শোভাসম্ভার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছে! আরও একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করুন, উদ্ধবর্ত্তী ঐ তুষারসাম্রাজ্যে কত সূক্ষ্ম সুনিপুণ কারুকার্য্যময়, কত কোণবিশিষ্ট, কত উচ্চচূড়, উৎকৃষ্ট মন্দিরসকল সারি সারি সুসন্নিবিষ্ট দেখিতে পাইবেন! কৈলাসের আভাস সুস্পষ্টরূপে আপনার নয়নপথে পতিত হইবে! আরও একটু ধ্যানমগ্ন হউন, তখন দর্শক, আরও কি সুকৃতিগম্য পরমরম্য দৃশ্য বিস্ময়ের সহিত আপনার চিত্তের বিষয় হইবে, অসমর্থ লেখনীমুখে অসমর্থ আমি তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিব? ফলতঃ যিনি যেমন অধিকারী, তিনি তেমনি দর্শন করিবেন। সকল বস্তুই স্থূলসূক্ষ্মভাবে বিশ্বসংসারের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, সকলেই কি সে সকল সম-সূক্ষ্মভাবে দেখিতে পায়? যাঁহার যেমন জ্ঞানশক্তি, যেমন ধ্যানশক্তি, যেমন ভাবস্ফূর্ত্তি, তিনি তেমনিই দেখিবেন। কিন্তু কিছুতেই কাহার অতৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম্মোদ্দেশে সুদূর সঙ্কট পথে প্রধাবিত তীর্থযাত্রিগণগুলি, আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনাদিগের যাঁহার লালসা হইবে, তিনি যেন পথক্লেশভয়ে এ পথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত না হন। এ স্থানে পঁহুছিলে পথের কষ্টে তাঁহাদের কষ্টবোধ বা কোন ক্ষতিবোধ নিশ্চয়ই হইবে না, প্রত্যুত তিনি আপনাকে পরম লাভবান্ বলিয়াই বিবেচনা করিবেন।

তুষারপাতের ছয়মাস এখানকার যাত্রা বন্ধ থাকে। দূরবর্ত্তী উখীমঠে ঐ ছয়মাস কেদারনাথের পূজা সম্পন্ন হয়। বৈশাখের অক্ষয়তৃতীয়ায় এবং অবস্থা বুঝিয়া তাহার পূর্ব্বেও দেব-দেবের মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত করা হয়।

এখানকার শীত হাড়-ভাঙ্গা শীত, গঙ্গোত্তরী অপেক্ষাও অধিক। পাণ্ডাজী আমাদের জন্য কয়েকখানি কম্বল সংগ্রহ করিয়া দিলেন। তথাপি ঘরে আগুন না জ্বালিয়া আরাম পাওয়া গেল না। কিন্তু কাষ্ঠ

এখানে অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। এজন্য এখানে অনেকে ত্রিরাত্রি বাস করেন না, অনেকে পাক করিয়াও খান না। অধিকাংশ লোকে পাক না করার জন্য বোধ হয় হালুইকরের দোকানও এখানে অধিক। ঐ সকল দোকানে পুরী, তরকারী, সন্দেশ প্রভৃতি সকলই মিলে। অধিক শীতের জন্য, পাহাড় অঞ্চলের অসাধারণ উপদ্রব যে মাছি, তাহা এখানে আদপেই নাই।

এখানে আমাদের পথের সঙ্গী পাণ্ডাজীকে আমরা বাধ্য হইয়াই পাণ্ডা স্বীকার করিয়া বিদায় করিলাম। হরিদ্বারে প্রথম-পরিচিত পাণ্ডাজী যদিও এই সময়ে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমরা তাঁহাকে বুঝাইলাম যে আমাদের সঙ্গী এই পাণ্ডাজী এখানকার সঙ্কটপূর্ণ পথে আমাদের নিত্য-সঙ্গী হইয়া আসিয়া বড়ই উপকৃত করিয়াছেন, এখন সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমরা ইহাঁকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিলাম না, পূর্ব্বসঙ্কল্পই আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইল। আপনার সহিত হরিদ্বারে যদিও আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, কিন্তু সে সাক্ষাৎ সেই পর্য্যন্তই; তাহার পর হইতে সমস্ত পথ ইহাঁর সহিত নিত্যসাক্ষাৎ ও নিত্যসাহচর্য্য, ইনিই বা আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন কেন? আমরাই বা কি করিয়া এতকাল আপনার ভরসায় থাকিতে পারি? ভরসা করি, এরূপ স্থলে আপনি ইহাতে দুঃখিত হইবেন না। পাণ্ডাজী অবশ্য বুঝিলেন, কিন্তু দুঃখিতও হইলেন। উপায় কি?

পাণ্ডা বিদায়ের ব্যাপার অবশ্য সর্ব্বত্রই পরস্পর কিছু অসন্তোষ-জনক হইয়া থাকে। পাণ্ডারা যাত্রীর সহিত প্রথম যেরূপ ব্যবহার করেন, শেষ ব্যবহারের সহিত তাহার ঐক্য রাখিতে পারেন না। উপায় কি আছে? আমরা একরূপে নিষ্কৃতি পাইলাম।

——০——

রামপুর চটী।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

কেদারনাথ হইতে বরাবর উতরাই থাকায় আমরা প্রাতঃকালে রওনা হইয়া রামবাড়ী চটীতে দৃক্‌পাতও না করিয়া ক্রমাগত ৯ মাইল অতিক্রম পূর্ব্বক গৌরীকুণ্ডে আসিয়া পাক-ভোজনাদি করিলাম। তৎপরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্ষতি নাই, আমাদেরও শরীর ক্লান্ত। গৌরীকুণ্ডেই সে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

১৪ই তারিখে প্রভাতে গৌরীকুণ্ড হইতে রওনা হইয়া ৩ মাইল আসিয়াই সুবর্ণপ্রয়াগ বা সোনপ্রয়াগ নামক স্থানে বাসুকীগঙ্গা পার হইলাম। পার হইয়া দেখিলাম, এক রাস্তা উপর দিয়া ত্রিযুগীনারায়ণে গিয়াছে। নিম্নের রাস্তা বদরীনারায়ণ অভিমুখে চলিয়াছে। আমরা এই নিম্নের রাস্তা ধরিয়া ২ মাইল পথ রামপুর চটী পাইলাম। এই চটীতে আসিয়া একটী অতি শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলাম। ঐ দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আমাদের ভারবাহক বালার মুখে ঘটনাটী যে রকম শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। ব্যাপার এই—

গুজরাট-নিবাসী প্রৌঢ়বয়স্ক এক পতি-পত্নী এবার এই উত্তরাখণ্ডের তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদার প্রভৃতি কয়েক স্থানে ঐ দম্পতির সহিত আমরা এক বাসায় বাস করিয়াছি ও পরস্পর পরিচিত হইয়াছি। উঁহাদের মধ্যে স্বামীর মূর্চ্ছা রোগ ছিল। কিন্তু বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট উত্তরাখণ্ড-পরিক্রমে তাঁহার একান্ত আগ্রহ থাকায় পত্নী তাঁহাকে লইয়া এই উৎকট যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন। সর্ব্বদা তিনি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন ও প্রায়ই হাত ধরাধরি করিয়া চলিতেন। অদ্যও গৌরীকুণ্ড হইতে উভয়ে পূর্ব্ববৎ সাবধানে রওনা হইয়াছেন, কিন্তু নিয়তি কে অতিক্রম করিতে পারে?

কিয়দ্দূর আসিয়া মন্দাকিনীর অতি উচ্চ চড়াই পথে স্বামীর মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। এই সময়ে কি গতিকে জানি না, নিমিষের জন্য স্ত্রীটী তাঁহার সঙ্গ-ছাড়া হইয়াছেন। এদিকে স্বামী মূর্চ্ছাবশে পর্ব্বতের দিকে হেলিয়া পর্ব্বতে প্রতিহত হইয়া পুনর্ব্বার কিনারায় আসিয়া সুদূর গভীর খাদে পড়িয়া গেলেন। আর কি রক্ষা আছে? চক্ষুর নিমিষে প্রবলবেগে দুর্ভাগ্য স্বামী একবারে দুই মাইল আন্দাজ নীচে পতিত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ ও রুধিরাপ্লুত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। সেই মুহূর্ত্তেই পত্নী উপস্থিত হইয়া আমার স্বামী কৈ, আমার স্বামী কৈ বলিয়া উদভ্রান্তভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলে তৎকালে সেখানে একমাত্র উপস্থিত আমাদের ঐ ভারবাহক পাহাড়ী, তাহাকে কহিল, মায়ী, আর তোর স্বামী কোথায়? যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। এইস্থানেই তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল, আমি ধরিতে না ধরিতে তিনি পাহাড়ের দিক্ হইতে ছিট্‌কাইয়া এই স্থানের নীচে খাদে পড়িয়া গিয়াছেন। স্ত্রী আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সেইস্থানে নামিবার উপক্রম করিলে পাহাড়ী বালা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আট্‌কাইল ও যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া কহিল, তোমার স্বামীর ত যাহা হইবার হইয়াছে, এখন তুমি মরিলে তাহাতে আর কি লাভ হইবে? এখান হইতে নামিতে গেলেই মৃত্যু, বহুদুর পথে পথে গিয়া নামিবার পথ পাওয়া যাইবে। কিন্তু হতভাগিনী কিছুতেই বুঝে না, আকস্মিক বিপদে একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছে। বলে, ঘুরে গেলে আর তাঁর দেখা পাইব না। এখনি আমার দেখা পাইবার উপায় করিয়া দাও। পাহাড়ী বালা, তাহাকে লইয়া ও পিঠে গুরুতর বোঝা লইয়া মহা বিব্রত হইয়া পড়িল। এমন সময়ে দুইজন তীর্থযাত্রী সাধু সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বৃত্তান্ত শুনিয়া ঐ শোকার্ত্তাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া বলিলেন বাছা, দুঃসাহস করিও না। আত্মহত্যায় মহাপাপ, বরং তুমি জীবিত থাকিয়া স্বামীর শ্রাদ্ধশান্তি

করিলে তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইবে ও তোমারও যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা হইবে। আমাদের সঙ্গে চল, যেখানে নামিবার পথ পাওয়া যাইবে, সেইখানে নামিয়া যতদূরে তোমার স্বামী পড়িয়াছেন, ততদূরে গিয়া তোমার স্বামীকে আমরা দেখাইব। এই কথায় কতক আশ্বস্ত হইয়া স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সন্ধান পাইয়া পুলিশও সঙ্গ লইল। বহুকষ্টে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দুর্ভাগ্যের শোচনীয় মৃত্যু নিরীক্ষণ করিলেন। পুলিশ এ স্থলেও অন্ত্যেষ্টির কিছু ব্যাঘাত করিয়াছিল। অর্থাৎ অর্থলোভে স্ত্রী স্বামীকে ঐরূপে হত্যা করিয়াছে, এই সন্দেহ উদ্ভাবন করিয়া কিছু আদায়ের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বালার সাক্ষ্যে ও সাধু দুইজনের সাহায্যে বড় কিছু করিতে পারিল না। ঐ অকারণ-বন্ধু দুই মহাত্মা দেশালাই দ্বারা অগ্নির আয়োজন করিয়া কোনরূপে ঐ হতভাগিনী দ্বারা শবের মুখাগ্নি করাইয়া মন্দাকিনী-প্রবাহে ঐ শবদেহ ভাসাইয়া দিলেন। রামপুর চটীতে ঐ হতভাগিনী অচির-বৈধব্যদশায় কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলে, আমরা আমাদের পশ্চাৎ-পতিত ভারবাহক বালার মুখে উপরি লিখিত সকল ঘটনা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমদুঃখিত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু বহুদিন হইতে তিনি নিয়ত স্বামিসঙ্গিনী হইয়া পথে চলিয়াছেন, একদিনের একমুহূর্ত্তও সঙ্গ ছাড়েন নাই। আজি এজন্মের জন্য তাঁহার চিরসঙ্গত্যাগ মনে সহ্য হইবে কেন? তথাপি, এ শোকবিলাপের মধ্যে তাঁহার স্বামীর যে বদরীনারায়ণ দর্শন ঘটিল না, তাঁহার কি সে ফলপ্রাপ্তি হইবে? এ কথা পতিব্রতা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কথাগুলিতে আমার যেন হৃদয়-মর্ম্মভেদ হইয়া গেল ও হতভাগ্যের নারায়ণ দর্শন পিপাসার শোচনীয় পরিণাম পুনঃপুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। সহযাত্রীদিগের ব্যথিত চিত্তে সমবেদনার স্রোত নানারূপে প্রবাহিত হইলেও আমার

হৃদয়ে কিন্তু অন্য সুরে ঐ বেদনার প্রবাহ প্রবাহিত হইল। কেহ শুনিতে না পাইলেও আমার হৃদয়তট আহত করিয়া এই উন্মত্ত তরঙ্গ উঠিল—

কেন করুণার তব এ বিধান!
তোমায় যে ভজে যে মজে তার প্রাণ অবসান!
হরি, তুয়া বিরহানল- ব্যাকুল গোকুল,
পশু পাখী শাখী সবই ম্লান;
শেষে কুলবতী-কুল হত-মান গত প্রাণ!

নাথ, কি বলি' ছলিয়ে বলিরাজে রসাতলে
রাখিলে অখিল ল'য়ে দান;
সে যে "ভকত-বৎসল" ঘোষে নাম অবিরাম?

বিধবার স্বদেশীয় ২।১টী স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহারাও অবশ্য অনেক সান্ত্বনা দিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত সান্ত্বনাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হইল। তিনি বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে স্বামী যথায় যাইবার মানস করিয়া প্রাণপণে চলিতেছিলেন, সেই বদরীনারায়ণ ক্ষেত্রেই স্বামীর উদ্দেশে পিণ্ডদান ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করিবেন। অতএব অশৌচ মধ্যে এই কয়দিনে যেরূপে হউক, বদরীনারায়ণে পঁহুছিতেই হইবে। তখন তাঁহার শোক-শিথিল অঙ্গে কতই শক্তি সঞ্চার হইল!

হরি হরি, অভাগিনি, তোমরাই ধন্য! তোমাদের জন্যই আজিও আমরা হিন্দু বলিয়া গর্ব্ব করিতে পাই!

দুঃখের বিষয়, একটা তুচ্ছ কথা, একটা ইতিপূর্ব্বেরই সামান্য ঘটনা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে এখানকার দোকানদার-শ্রেণীর কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

এই রামপুর চটীতে পঁহুছিয়াই এক দোকানদারের দোচালায় বসিয়া

* ভৈরবী রাগিণী, কাওয়ালিতে এই গান গেয়।

বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় ঐ দোকানদার কহিল, কিছু লওয়া হয়, লইয়া বৈস, নচেৎ এখান হইতে উঠিয়া যাও। আমরা বলিলাম, লওয়া না লওয়ার কথা এখনও ত তোমার সহিত কিছু হয় নাই, আসিয়াই বিশ্রাম করিতেছি মাত্র। দোকানদার কহিল, দিন ভো'র বিশ্রাম করিতে হইবে না কি? বিশ্রাম করিতে হয়, আগে জিনিষপত্র লইয়া পরে বিশ্রাম কর। নচেৎ উঠিয়া যাও। আমরা কহিলাম, আচ্ছা, আমরা উঠিয়াই যাইতেছি। উঠিতে উঠিতে ভাবিলাম, মানুষের প্রকৃতি কি এতদূরই অধম হইতে পারে?

আবার দোকানদার হইলেই হয় না, তাহার মধ্যেও ভাল মন্দ আছে! তাহার পরিচয়ও এই সঙ্গেই শুনুন। ঐ দোকানের সম্মুখে রাস্তার অপর পারের দোকানদার আমাদিগকে ডাকিয়া কহিল, আপনারা আমার দোকানে আসিয়া বিশ্রাম করুন। আমরা সেই দোকানেই গিয়া বসিলাম। বসিয়া অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিতে হইল, কেন না বালা পঁহুছে নাই। বস্ত্রাদি ও বাসনপত্র সমস্তই বালার পিঠে বোঝাই থাকে। কিছুক্ষণ পরে আমাদের পরিচিত সহযাত্রী ১৫।১৬ জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমরা যে-দোকানদারের দোকানে আশ্রয় লইয়াছিলাম, আমাদের দেখা-দেখি তাঁহারা সকলে আসিয়াও ঐ দোকানেই আশ্রয় লইলেন। প্রথমোক্ত দোকানদার নিঃশব্দে নিজের দোকানে বসিয়া পা দোলাইতে লাগিল এবং নিজ রুক্ষব্যবহারের সদ্যঃ ফলাফল জুল জুল করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের পশ্চাৎ-পতিত বোঝাওয়ালা বালা আসিয়া আমাদের নিকট পঁহুছিল। তাহার মুখে উপস্থিত দুর্ঘটনার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলাম। শুনিতে শুনিতে পাক-ভোজনে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। আহ্নিক করিতে বসিয়া কেবলই ঐ দুর্ঘটনার কথা মনে হইতে লাগিল, বিলাপের করুণস্বরে ভোজনেও তৃপ্তি হইল না।

রামপুর হইতে রওনা হওয়ার পরই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মনেও সেদিন সুখ নাই, দেবতাও তেমনি দুর্য্যোগ উপস্থিত করিলেন। ভিজিতে

ভিজিতে দুইটী চটী অতিক্রম করিলাম। যদিও নিকটে নিকটে চটী, কিন্তু সবই যাত্রীতে পরিপূর্ণ। বদল চটী অতিক্রম করার পর আরও ২ মাইল অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ রামপুর হইতে মোট ৫ মাইল পথ হাঁটিয়া আমরা ফাটা চটী নামক এক সুন্দর ও সুপরিসর চটী প্রাপ্ত হইলাম। এই শেষ ২ মাইল পথ চড়াই হওয়ায় তাহা অতিক্রম্ করিয়া আসিতে বিলক্ষণ কষ্ট বোধ হইয়াছে। সে যাহা হউক, উপস্থিত চটীটী রীতিমত প্রশস্ত হইলেও তাহাও যাত্রীতে পরিপূর্ণ।

চটীতে আমরা বহু চেষ্টা করিয়া একটা ভাল স্থান বাছিয়া লইলাম। এই চটীর একটু উপরে ও পার্শ্বে সমতলে কয়েকটী ঝরণা আছে। মল-মূত্র ত্যাগের প্রান্তরও যথেষ্ট। রাস্তার দুই পার্শ্বে দুই সারিতে অনেক-গুলি দোকান। তন্মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের দোকান বিস্তর, মনোহারী দোকানও আছে। দোকানদার তাহার দোকানের নিকটবর্ত্তী জায়গাটী আমা-দিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিল অর্থাৎ তাহার উনানগুলির সংলগ্ন গরম জায়গাটী আমরা পাইয়াছিলাম। বোধ হয় এই স্থানেই আমরা প্রথম হেলির ধূমকেতু দেখি ও আমাদের সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের লোকান্তর প্রাপ্তির কুসংবাদ প্রথম শুনিতে পাই। নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে অনেকগুলি মহিষ চরিতে দেখিলাম। তাহাদেরই দধিদুগ্ধে এখানকার দোকানগুলির গৌরব, সন্দেহ নাই।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ। প্রভাতে আমরা রওনা হইলাম, বৃষ্টিও আরম্ভ হইল। পর্ব্বতের ক্রোড় হইতে ধূমাকার এমন বিশাল বাষ্পরাশির উদ্গম হইতে লাগিল যে তাহা শাদা মেঘ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল। কালিদাস একস্থানে কামচারী মেঘের বর্ণনাবসরে লিখিয়াছেন "ধূমোদ্গারানুকৃতি-নিপুণা জর্জ্জরা নিষ্পতন্তি"। আমরা মহাকবির অতুল্য বর্ণনা আজি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। এই বাষ্পসম্ভার বা মেঘের অপরিচিত, অন্তুতর আকার ক্রমে আমাদের দেশের ভয়ানক কুজ্ঝটিকার ন্যায় আকার ধরিয়া

দিগন্ত ছাইয়া ফেলিল। দিগ্‌ব্যাপী পর্ব্বতাবলী আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সব এক হইয়া গিয়াছে! এক অপূর্ব্ব অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমরা চলিলাম। কতক্ষণ কতদূর এমন যাইতে হইল। অদ্য আমাদিগকে সড়ক রাস্তা ত্যাগ করিয়া সড়ক হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী গুপ্তকাশী যাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সড়ক রাস্তা ত্যাগ করিয়া উপর রাস্তা যাহা গুপ্তকাশী অভিমুখে গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিলাম। কিন্তু ভয় হইতে লাগিল, সে পথে জনমানব সমাগম নাই। থাকিলেও দেখিতে পাই না। কি উপায়, চলিতেই হইবে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া বহুদূর চলিয়া আসিতে আসিতে দিক্ সুপ্রকাশ হইল, গুপ্তকাশীও প্রাপ্ত হইলাম। কাটাচটী হইতে অদ্য আমাদের ৭ মাইল রাস্তা হাঁটা হইল।

—o—

গুপ্তকাশী।

গুপ্তকাশী স্থানটী সুন্দর। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চতুর্দ্ধারে উপর ও নীচের তলে যাত্রীদের থাকিবার যথেষ্ট ঘর আছে। বাহিরেও দোকানগুলিতে যাত্রীরা বাসা পাইয়া থাকে। প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরের সম্মুখে একটী কুণ্ড আছে। ইহার নাম মণিকর্ণিকা। ঐ কুণ্ডে নির্ঝরের ২টী ধারা পড়িতেছে। দুইটী ধারার মুখই পিতল দিয়া বাঁধান। একটী হস্তিমুখী, দ্বিতীয়টী গোমুখী। প্রথম ধারার নাম যমুনা, দ্বিতীয়টীর নাম গঙ্গা। যাত্রীরা সঙ্কল্পপূর্ব্বক ঐ কুণ্ডে স্নান করিতেছে ও গুপ্তদান করিতেছে। নারিকেলের ভিতর স্বর্ণ-রৌপ্যখণ্ড পুরিয়া উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়। উহা পাণ্ডা প্রাপ্ত হন। ঐরূপ গুপ্তদানের এখানে বড় মাহাত্ম্য। এই গুপ্তদাতাদিগের মধ্যে পঞ্জাবী, মাড়োয়ারী লোকই বেশি। ঐ দেশীয় স্ত্রীজাতির কুণ্ডে স্নানের সময় দেখিলাম, তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া গান করিতে করিতে, নৃত্যের আকারে জলে পুনঃ পুনঃ গা ডুবাইতেছে, মাথা

ডুবাইতে কাহাকেও দেখিলাম না। মাথা ডুবাইতে মজবুত আমাদের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা। কথায় কথায় তাঁহাদের অবগাহন।

মন্দির দুইটী। একটীতে বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান, দ্বিতীয়টাতে বৃষারূঢ় শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বিরাজমান। বিশ্বনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি রৌপ্যনির্ম্মিত পিনেট দ্বারা শোভিত। তাহার এক পার্শ্বে রৌপ্যনির্ম্মিত চক্র, তাহাতে মহামায়ার মুখ। অন্যপার্শ্বে চতুর্ভুজা রজতনির্ম্মিতা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি। দ্বিতীয় মন্দিরে অর্দ্ধনারীশ্বরের একপার্শ্বে পিত্তলময়ী অন্নপূর্ণামূর্ত্তি। অপর পার্শ্বে পিত্তলময় নারায়ণমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি সকলই সুন্দর। দেখিয়া আমাদের সমস্ত শ্রম ও ক্লেশস্বীকার সার্থক বোধ হইল।

দেবালয়ের বাহিরে অনেকগুলি দোকান। খাদ্যদ্রব্য সমস্তই মিলে। তীর্থযাত্রার পুস্তক, উত্তরাখণ্ডের মানচিত্র প্রভৃতিও এখানে পাওয়া যায়। দোকানগুলির সম্মুখে পরিসর রাস্তা। তৎপরেই ঢালু প্রশস্ত প্রান্তর। রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া উহা দেখিতে বড় সুন্দর বোধ হইল। ফলতঃ গুপ্ত কাশীটী বেশ একটু জাঁকজমকসম্পন্ন। ডাকঘরও এখানে একটী আছে।

আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর এখান হইতে ২॥০ মাইল দূরবর্ত্তী উখীমঠে যাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ঢালু প্রান্তরে অবতরণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু নামিবার পথ কোথাও দেখি না, পথের চিহ্নমাত্রও নাই, কোন রকমে নামিতে হইতেছে। তাহার উপর এই সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এতক্ষণে কষ্টেসৃষ্টে ১ মাইল পথ আমরা নামিয়া আসিয়াছি, এখন আবার ফিরিয়া যাওয়া কিরূপে হয়। বিশেষতঃ ঐ পথে উঠিতে যাওয়া অসাধ্যসাধন। অগত্যা নামাই শেষ করিতে হইল। নামা শেষ হইলে বিশাল কল্লোল-কোলাহলে প্রবাহিতা মন্দাকিনী ও তাহার উপরিস্থিত পুল দেখিতে পাইলাম। মন্দাকিনী এই পর্ব্বতাকার অত্যুচ্চ দুই তটের নিম্নে কোথায় যেন লুকাইয়াছিলেন, হঠাৎ আমাদের চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত হইলেন! হউন, তখন আর তাঁহাকে দেখার কিছুমাত্র

করিয়া দিতে হয়, তাহা এখানে পাওয়া যায়। বদরীনাথে চড়াইবার জন্য মেওয়া জিনিষ এখান হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। এখানে একটী ডাকঘরও আছে। ঝরণার সুবিধা ও ময়দানের সুবিধাও মন্দ নহে। কিন্তু এত বড় স্থানেও সকলের বাসার সম্যক্ সঙ্কুলান হয় না, এ সমস্ত পাকা দোতলা মোকামগুলি যাত্রীতে পরিপূর্ণ। আমরা বহু অন্বেষণে চকের মধ্যেই দোতালায় একটা কুঠুরি অধিকার করিলাম। স্নান, অর্চ্চনা, ভোজনাদি সমাপন হইলে অপরাহ্নে এখান হইতে রওনা হইলাম।

প্রথমেই তৃণলতা-বৃক্ষাদিশূন্য রথচূড়ার ন্যায় ক্রমসূক্ষ্মশৃঙ্গ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটী পর্ব্বত অবলোকন করিলাম। স্থানে স্থানে পথের নিম্নবর্ত্তী খাড়া গভীর খাদে অলকনন্দা কখন কিঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচর, কখন একবারে অদৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে পিপুলকুঠী হইতে প্রায় ৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা গরুড়গঙ্গা নামক চটীতে উপস্থিত হইলাম।

---o---
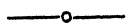
গরুড়গঙ্গা।

পক্ষিরাজ গরুড় ভগবানের বাহন হইবার জন্য এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এখানকার নদীর নাম গরুড়গঙ্গা হইয়াছে। এই দারুণ পার্ব্বত্য পথ লঙ্ঘন করিয়া দেবদর্শন করিতে হইলে গরুড়ের তুল্য বেগবলই প্রয়োজনীয়,তাই যাত্রীরা মধ্যে মধ্যে এই গরুড়-ভগবানের ভোগ লাগাইয়া থাকে। গরুড়গঙ্গা চটী অতি ক্ষুদ্র, অথচ যাত্রীর সমাগম বিস্তর। অতি কষ্টে আমাদের স্থান সমাবেশ হইল। এই কষ্টের উপর শেষ রাত্রিতে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। হাত পা জড় করিয়া কোনরূপে উন্নিদ্র অবস্থায় প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

২০শে জ্যৈষ্ঠ। প্রভাত হইল, তথাপি বৃষ্টির অনুবন্ধ ত্যাগ হয় না। ময়দানেরও তেমনি কষ্ট। প্রত্যেক চটীর অধিকার যতটুকু, তাহার দুই-

প্রান্তে লাল নিশান টাঙ্গান, অর্থাৎ তাহার মধ্যে যাত্রীরা মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারিবে না। কিন্তু নিয়মও যেখানে, নিয়মের ব্যতিক্রমও সেখানে তেমনি দেখিতে পাওয়া যায়। চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত, মধ্যে একটু নিম্ন স্থান দিয়া অতি ক্ষুদ্রকায়া গরুড়গঙ্গার ধারা আসিয়া অলকনন্দায় পড়িতেছে। সেই ধারার পার্শ্বে উচ্চে ও নীচে ২।৩ খানি মাত্র দোকান। ইহাতে অবশ্য সকল প্রকার কষ্টেরই সম্ভাবনা। যাহা হউক, আমরা এই স্রোতের ধারাতে বসিয়া বসিয়া গা ডুবাইয়া লইলাম। পদতল হইতে ২।১ খানা পাথরও তুলিয়া লইলাম। ইহাতে বিষভয় নিবারণ করে, এইরূপ প্রবাদ। অতঃপর ঘাটের উপরি প্রতিষ্ঠিত গরুড়ের মূর্ত্তি দর্শন করা হইল ও পাণ্ডাজীকে থালা সহিত পেড়া দান করা হইল। তারপর আহ্নিকের উদ্‌যোগ করিতেছি, অকস্মাৎ পাহাড় হইতে প্রবাহিত বৃষ্টির জলরাশি আমাদের গৃহের মধ্যে বেগে প্রবেশ করিয়া গৃহমধ্যস্থ সমস্ত যাত্রীকে এককালে আশ্রয়শূন্য, বিব্রত ও হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিল। তৎক্ষণাৎ দোকানদার ক্ষিপ্রহস্তে ঘরের মধ্যভাগে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের ঢালু পর্য্যন্ত এক নালা কাটিয়া দিয়া ঐ জলরাশি নালীর পথে বহাইয়া দিল। তাহাতে যাত্রীদিগের অনেকের বস্ত্র বিছানা আদি কোন রূপে রক্ষা পাইল। আমরাও সুস্থ হইয়া বসিয়া আহ্নিক করিতে একটু অবসর পাইলাম। অনতিবিলম্বেই বৃষ্টি ছাড়িয়া গেল। আমরাও গরুড়জীকে প্রণাম করিয়া কুটির হইতে বহির্গত হইলাম।

—০—
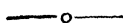
কুমার চটীর পথে।

ক্রমে ৪ মাইল পরে পাতালগঙ্গা এবং আরও ২ মাইল পরে গোলাপ চটী প্রাপ্ত হইলাম। এই চটীর নিকটে এক মন্দির আছে, মন্দির মধ্যে নারায়ণ আছেন। ইহার পর ক্রমেই চড়াই। এক স্থানে খাড়া চড়াইএর

উপর সড়ক এত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে যে সেই স্থান দিয়া যাইতে সকলেরই মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া পড়ে। তথা হইতে নীচের খাদের দিকে দৃষ্টি পড়িলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আবার এই অত্যুচ্চ পার্ব্বত্য পথের উপরেও পর্ব্বতের অনেক অংশ উর্দ্ধীকৃত আছে। এই সকল পর্ব্বত একবারে তৃণলতাগুল্মপাদপ-পরিশূন্য, ভীষণ উলঙ্গমূর্ত্তি। ঐ মূর্ত্তিতে পর্ব্বতের ভীষণতা যেন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ অত্যুচ্চ সড়ক-রাস্তার পার্শ্বেই রাস্তার জন্য পর্ব্বতের কর্ত্তিত অঙ্গে কি সুন্দর, রেখাঙ্কিত, প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হইল! শাদা পাথরের মধ্যে ৩।৪ অঙ্গুলি অন্তর নীলের সুদীর্ঘ ডোরা চলিয়া গিয়াছে, যেন ঐরূপ ১ খানি সুবিশাল সতরঞ্চ। প্রকৃতির কারুকার্য্য দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আরও অবাক্ হইলাম যে এই ভীষণ মূর্ত্তির মধ্যে এমন ললিত-সুকুমার শিল্পকার্য্য! কি জানি, যাঁহার এই কার্য্য, তিনিই বুঝি ইহার মর্ম্ম জানেন। ঐ শিল্প-সৌন্দর্য্য সাধনের জন্য না জানি তিনি কত যুগযুগান্তরই খাটিয়াছেন! খাটিয়া কি এই আমার মত অজ্ঞানীদের নিমিত্ত তিনি নিজ অস্তিত্বের একটু চিহ্ন রাখিয়া দিয়াছেন! হায় বিভো, কোথায় তুমি স্বপ্রকাশ নহ, যে তোমায় দেখিবার জন্য বিশেষ বিশেষ রমণীয় স্থান খুঁজিয়া বাহির করিব? যে ভীষণতা দেখিয়া আমরা ভয় পাইলাম, তাহা কি তোমার ভীষণতা, না বিভূতির উৎকর্ষ? হায় আমাদের মনের কি অপরিসীম ভ্রান্তি!

—o—

কুমার-চটী।

মোট অদ্য ৮ মাইল পথ হাঁটিয়া কুমার-চটী নামক ১টী সুন্দর চটী প্রাপ্ত হইলাম। চটীতে কতকগুলি কুম্ভকার থাকায় উহার ঐ নাম হইয়াছে। বাস্তবিক, উহার প্রকৃত নাম হেলঙ্গ্। এ চটীতে ঝরণা

নিকট, বাজার উত্তম, বাজারে যাত্রীদের থাকিবার স্থানও যথেষ্ট, ময়দানের অভাব নাই, একটী পোষ্টঅফিসও আছে।

কুমার-চটী হইতে একটা বাঁ-হাতি ফাঁড়ি রাস্তা নীচের দিকে গিয়া অলকনন্দার তীরে পঁহুছিয়াছে। ঐ স্থানে পারের জন্য এক ঝুলা আছে। ঝুলায় অলকনন্দা পার হইয়া ঐ পথে অন্য পর্ব্বতে উঠিতে হয়। তথায় নিবিড় দেবদারুবনমধ্যে পঞ্চম কেদার কল্পেশ্বর মহাদেব আছেন। আবার কুমার চটী হইতে ২॥০ মাইল যাইয়া যে পেনী বা খনোটী চটী পাওয়া যায়, তাহার নিকটবর্ত্তী ফাঁড়ি রাস্তা দিয়া চলিলে পঞ্চবদরীর অন্যতম বদরীতে উপস্থিত হওয়া যায়। পঞ্চ কেদারের ন্যায় বদরীনাথও ৫টী আছেন। স্বয়ং বদরীনাথ বা শুদ্ধবদরী প্রথম; দ্বিতীয়, পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদরী; তৃতীয় জোশীমঠে নৃসিংহবদরী। চতুর্থ বদরী কুমার চটীর নিকট দিয়া যাইতে হয়, তাহা এইমাত্র উক্ত হইল। পঞ্চম আদিবদরী, কেহ বলেন ভবিষ্যবদরী। আদিবদরী মেহেলচৌরীর পথে, কর্ণপ্রয়াগ হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ভবিষ্যবদরী জোশীমঠ হইতে নীতি-পাশের সড়কে ৮ মাইল যাইতে হয়। কলির প্রবলতায় যখন পাপের প্রবলতা চরম সীমায় উপস্থিত হইবে ও তন্নিমিত্ত নর ও নারায়ণ নামক অলকনন্দার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতদ্বয় পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যখন বর্ত্তমান বদরী-নারায়ণের পথ একবারে সংরুদ্ধ করিবে, তখন ঐ ভবিষ্যবদরীতেই বদরী নারায়ণের পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইবে।

আমরা কুমার-চটী হইতে সড়ক রাস্তায় ২॥০ মাইল খনোটী বা পেনী চটী হইয়া তথা হইতে ৪ মাইল শিবোধার চটী প্রাপ্ত হইলাম। এখান হইতে দুই রাস্তা বাহির হইয়াছে। একটী নীচের দিকে নামিয়া শ্যামা চটী হইয়া বিষ্ণুপ্রয়াগ গিয়াছে, অপরটী জোশীমঠ হইয়া ঐ বিষ্ণুপ্রয়াগেই পঁহুছিয়াছে। আমরা উপরের প্রশস্ত সড়ক রাস্তা ধরিয়া ১ মাইল পথ আসিয়া সুপ্রসিদ্ধ জোশীমঠ প্রাপ্ত হইলাম।

জোশীমঠ।

জোশীমঠের প্রসিদ্ধির প্রতি নানা কারণ। প্রথমতঃ এস্থান বদরী নারায়ণের মোহান্ত রাওল সাহেবের বাসস্থান। প্রতি বৎসর তিনি গ্রীষ্মারম্ভে এখান হইতে উক্ত নারায়ণ-ক্ষেত্রে গমন করেন। আবার শীতের পরাক্রমসহ তুষারপাতের প্রারম্ভে যখন উক্ত পুণ্যক্ষেত্রে লোক-জনের অবস্থিতি অসাধ্য হইয়া উঠে, নারায়ণের মন্দির দ্বার বন্ধ হইয়া যায়, তখন রাওল সাহেব নারায়ণের পূজক, পরিচারক ও কর্ম্মচারিবর্গসহ এই জোশীমঠে আগমন করেন। ঐ কয়েক মাস তাঁহারই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় অত্র মঠে অধিষ্ঠিত ৺ নৃসিংহদেবের উপরি বদরী নারায়ণের পূজা যথারীতি সম্পাদিত হইয়া থাকে।

টিহরী-নরপতির নিয়োগানুসারে রাওল সাহেবের উপর এই সমস্ত পূজাভোগাদি ব্যবস্থার ও দেবোত্তর সম্পত্তি তত্ত্বাবধারণের ভার আছে। এই নৃসিংহবদরী পঞ্চবদরীর অন্যতম, সুতরাং ইঁহার দর্শনার্থ সকল যাত্রীরই এখানে সমাগম হইয়া থাকে।

বদরিকাশ্রমে সমস্ত যাত্রীর গমনাগমন-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই দোকান-দার প্রভৃতি তথা হইতে নামিয়া আসে। যে সমস্ত পাহাড়ী ভূটিয়া, কি নেপালী লোক ব্যবসায় উপলক্ষে বদরীর পথে থাকে, তাহারাও এই সময়ে নামিয়া আসিয়া জোশীমঠে আশ্রয় লয়। কেন না, জোশীমঠের উত্তরে শীতত্রাণের নিমিত্ত ঐরূপ উত্তম স্থান আর দ্বিতীয় নাই। প্রবল-শীতের সময়টা তাহারা এই স্থানেই কাটাইয়া যায়। ফলতঃ কেদারের পথে উখীমঠের ন্যায় বদরীর পথে জোশীমঠ উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থান। এইরূপে এখানে সর্ব্বদা লোক-সমাগম থাকায় স্থানটী একটু সহরের মত। দোকান-

ততঃ ক্রোশদ্বয়ে পুণ্যং জ্যোতির্ধাম শুভপ্রদং।
নৃসিংহরূপী ভগবান্ যত্রাস্তে মুক্তিদায়কঃ।

পাট গুলজার, সকল দ্রব্যই মিলে, রোকড়ের কারবার চলে, রাস্তা ভাল, ঝরণা কয়েকটীই আছে এবং থানা, পোষ্টআপিস্, টেলিগ্রাফ্ আপিস্ ও হাঁসপাতাল প্রভৃতিও আছে। এ সকলই প্রসিদ্ধির পক্ষে কারণ বটে। কিন্তু জোশীমঠের প্রসিদ্ধির বিশেষ কারণ, বোধ হয় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এখানে মঠপ্রতিষ্ঠা। হিন্দুজাতীয় ধার্ম্মিক মহাত্মাদিগের সংখ্যার পরিমাণে কয়জন লোক এই অতিদুর্গম পার্ব্বত্য পথে আসিতে পারেন? কিন্তু না আসিলেও তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেই জানেন যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জোশীমঠ এই হিমালয়ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই উপলক্ষে আচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে দুই চারি কথা এ স্থলে উল্লেখ করিলে বোধ হয় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই মহাপুরুষ দক্ষিণাপথে দ্রবিড়দেশে অন্যূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে (ইয়ুরোপীয়দিগের মতে ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি যথাকালে উপনীত হইয়া গুরু-গৃহে ষড়ঙ্গ বেদ ও কর্ম্ম-ব্রহ্ম মীমাংসাদি অধ্যয়ন পূর্ব্বক গুরুসমীপে সন্ন্যাসদীক্ষা ও মহাবাক্যের মর্ম্ম শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অনন্তর ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও দশোপনিষদ্‌ভাষ্য প্রভৃতি প্রণয়ন পূর্ব্বক পরিব্রজ্যা উপলক্ষে সমগ্র ভারত ভ্রমণ ও ভারতব্যাপী বৌদ্ধমত খণ্ডন সহকারে অদ্বৈতবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হন। শাস্ত্রজ্ঞানের গাম্ভীর্য্যে ও সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম তর্কের প্রাখর্য্যে তিনি সমগ্র-ভারতবিজয়ী হইয়াছিলেন। উক্ত অদ্বৈতবাদ যাহাতে স্থায়িতা লাভ করে, তন্নিমিত্ত নিজের ঐ দীর্ঘ ভ্রমণাবসরে সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদিগকে স্বোদ্ভাবিত ভাষ্যমতবাদে পরিনিষ্ঠিত করেন। ভাষ্যগ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনক্রমে প্রতিষ্ঠিত উক্ত অদ্বৈত তত্ত্বোপদেশপরম্পরা যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যে, অবশেষে ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী মঠ-প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক উপযুক্ত শিষ্যদিগকে ঐ ঐ মঠে স্থাপন করেন। দক্ষিণে সেতুবন্ধসমীপে শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরি মঠ, পশ্চিম প্রান্তে দ্বারকাধামে সারদামঠ, পূর্ব্বপ্রান্তে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গোবর্দ্ধনমঠ

এবং উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ক্রোড়ে এই জ্যোতির্ম্মঠ বা জোশীমঠ তাঁহার অপূর্ব্ব-কীর্ত্তিস্তম্ভ চতুষ্টয়। প্রয়োজনীয় এই সমস্ত গুরুতর কার্য্যরাশি সমাধার পর দ্বাত্রিংশদ্‌বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি এই উত্তরাখণ্ডে মহাপ্রস্থান-পথে দেহত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করেন। বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানগুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে স্থানে ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি-নিমগ্ন হইয়া নিজের অমূল্য জীবনের কিয়ৎকাল যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্ম্মঠে আজি আমরা উপস্থিত হইয়াছি! এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া সেই পুণ্যাত্মার দেবমূর্ত্তিই আজি মুহুর্মুহুঃ মানস-চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, তাঁহার সকলই আছে, তিনি নাই, ইহা কি কখনও হইতে পারে? আমাদিগকে একবারে ছাড়িয়া অপুনরাবৃত্তির জন্ত বিদেহকৈবল্য-লাভে কি তিনি পরিতৃপ্তিলাভ করিতে পারেন? এই আমরা ভারতবাসী সমগ্র হিন্দুসন্তান তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে শত-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। আর্য্যবংশের বিলোপ না হইলে কি তাঁহার অস্তিত্ব এই মনুষ্যলোক হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে?

মহাপুরুষের স্মৃতি ও কীর্ত্তি কিছুই বিলুপ্ত হয় না সত্য; আচার্য্য নিজের স্বল্প জীবনকালের মধ্যে যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও গভীর-চিন্তাসাধ্য অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তৎকালে মুদ্রণ-প্রণালী না থাকিলেও আজি পর্য্যন্ত তাহার একখানিও বিলুপ্ত হয় নাই, সবগুলি সমান বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাও সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান জোশীমঠে তাঁহার কীর্ত্তিনিদর্শন কিছুই নাই বলিলেই হয়। বেদবেদাঙ্গপারগ সে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী বা পরিব্রাজক পরমহংস কেহই নাই; দলে দলে সে স্বাধ্যায়-ব্রত বিদ্যার্থী নাই, আচার্য্যের সে অদ্ভুত ভাষ্যগ্রন্থযোগে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা কেহই করে না, ফলতঃ অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ধ্বনি এখানে আর কর্ণে প্রবেশ করে না। তৎপরিবর্ত্তে বর্ত্তমান মঠস্বামী রাওল সাহেবের যে সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে সমবেত

শ্রমিক বালকদিগের কলকল রবই শুনিতে পাইলাম। আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত বাসুদেবের মন্দির কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিলাম। মন্দিরসংলগ্ন কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাতন প্রকোষ্ঠ সেই প্রাচীনকালের সাধুসন্ন্যাসিগণের আশ্রম-বসতির সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাও দেখিতে পাইলাম। তাহা ছাড়া আর কিছুই নাই, আর সমস্তই যেন নিশার স্বপ্ন হইয়াছে! তবে দণ্ডধারায় স্নানের সময় একটী সৌম্যমূর্ত্তি বালক সম্মুখস্থ উচ্চ বেদীর উপর বসিয়া যে স্নানের সঙ্কল্প-বাক্য পড়াইতেছিল, তাহার সঙ্কল্পবাক্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত পদসমূহ ও সেইগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম ও পরম ভাগ্য বলিয়া মনে করিলাম। কোন তীর্থে সঙ্কল্প-বাক্যটাও পরিশুদ্ধরূপে শুনিতে পাই না, আর এখানে যে, বালকের মুখে তাহা শুনিলাম, ইহা কি সেই নির্ব্বাণমুক্ত মহাপুরুষের ভুক্তাবশিষ্ট পুণ্যরাশিরই প্রভাব?

দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মঠের পরিচালন বা বদরিকাশ্রমের সেবাইত হওয়ার অধিকারও এক্ষণে তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদিগের কর্তৃত্বাধীন নাই। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রধান শিষ্যচতুষ্টয়ের অন্যতম ত্রোটকাচার্য্য গিরির হস্তে উক্ত অধিকার সমর্পণ করিয়া যান। দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত গিরির পর পর উত্তরাধিকারিবর্গ ক্রমে মঠের সঞ্চিত বিপুল অর্থের মহিমায় ভোগবিলাসে নিমগ্ন হইয়া নিজ অধিকার রক্ষা করিতে অসমর্থ হন। শেষে উক্ত অধিকার দক্ষিণাপথের রাওল উপাধি-ধারী ব্রাহ্মণের হস্তে পতিত হইয়াছে।

নৃসিংহদেবের মন্দিরে উক্ত দেব ভিন্ন সীতা-রাম, উদ্ধব-কুবের প্রভৃতি দেবতাও আছেন। পিত্তলের ১টী সুন্দর গরুড় মূর্ত্তি আছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত বাসুদেবের ১টী প্রাচীন মন্দির আছে। উহার প্রাঙ্গণের চারি ধারেও অনেকগুলি দেবতা আছেন। এখানকার দুর্গাদেবীও বিখ্যাত।

জ্যোতীশ্বর নামক মহাদেবের মন্দিরটী কিছু দূরে অবস্থিত। বোধ হয় তাঁহার নামেই জ্যোতির্মঠ নামকরণ হইয়া থাকিবে।

সড়ক রাস্তা হইতে বাঁ-হাতি এক সঙ্কীর্ণ পথে নিম্নে নামিয়া আমরা মঠে প্রবেশ করিলাম। ১টী বাঁধানো কুণ্ড আছে, তথায় গোমুখ দিয়া প্রস্রবণের ধারা পড়িতেছে, উহাকে দণ্ডধারা কহে। ঐ ধারায় আমরা সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইলাম ও ক্রমে ক্রমে কথিত দেবমূর্ত্তিগুলি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

বাজারের মধ্যে একটি প্রশস্ত ঝরণার পার্শ্ববর্ত্তী দোতলা ঘরে আমরা বাসা পাইয়াছিলাম। বাজারে কতটুকুই বা স্থান! পর্ব্বতের সঙ্কুচিত ক্রোড়ের মধ্যে সামান্য একটু স্থানে ঐ বাজারটি। মধ্যে রাস্তা, দুইপার্শ্বে সঙ্কীর্ণ দোতলা ঘরের সারি। এই ক্ষুদ্র ঘরগুলির মধ্যেই এখানকার প্রয়োজনীয় সবরকম দ্রব্যসামগ্রী। তদ্‌ভিন্ন বিশুদ্ধ শিলাজতু, মৃগনাভি প্রভৃতি পার্ব্বত্য ঔষধাদিও এখানে সুপ্রাপ্য। আমরা চাল, ডাল, আলু, ঘৃত, দুগ্ধ মিষ্টান্ন, সব এখানে পাইলাম। পাকভোজনান্তে একটু বিশ্রামপূর্ব্বক কয়েকখানি চিঠী লিখিয়া ডাকঘরে দিলাম। এখন আমাদের রওনা হইবার সময়।

এখান হইতে আমরা যে পথে বদরীনারায়ণ যাইব, তাহা ২০ মাইল হইবে। যদি কেহ মানসসরোবর-গমনার্থী থাকেন, তাঁহাকে এই জোশীমঠ হইতেই অন্য পথে যাইতে হইবে। এখান হইতে সেই সরকারি সুন্দর সড়ক-পথ নীতিপাসের দিকে গিয়াছে। উহা এখান হইতে ৪৫ মাইল বিস্তৃত। ঐপথে ৮।১০ মাইল অগ্রসর হইলেই ভবিষ্য-বদরী দর্শন হয়। ঐ নীতিপাসের পরই ভারতের শেষ সীমা ও তিব্বতের প্রারম্ভ। ঐস্থান হইতেই কৈলাসের গণনা। কৈলাস অন্তাংশে যতই সুন্দর হউক, ইহার পথ বড় ভয়ঙ্কর। আষাঢ়ের কিছুদিন থাকিতে আশ্বিনের কিছুদিন পর্য্যন্ত এই সামান্যকাল কোনরূপে ঐপথে মনুষ্যের গতায়াত

চলে। তাহাও তথায় জীবনধারণের জন্ম খাদ্যসামগ্রী, কি জ্বালানির জন্ম কাঠ, অথবা আশ্রয়ের জন্ম চটী প্রভৃতি কিছুই নাই। নিতান্ত কষ্টসহ, ধর্ম্মৈকপ্রাণ কদাচিৎ কোন সন্ন্যাসী প্রাণধারণোপযোগী খাদ্য বস্তুমাত্র সঙ্গে লইয়া ঐ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক আরও পক্ষাধিক কাল অগ্রসর হইতে পারিলে জন্মান্তরীণ প্রচুর পুণ্যবলে হয়ত মানস-সরোবর দর্শন করিতে পারেন। ফলতঃ সেস্থান সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে একেবারে অগম্য। প্রতিনিয়ত তুষার-সম্পাতে উত্তর-মেরুর ন্যায় উহা সর্ব্বকালের জন্ম একরূপ অপূর্ব্ব শ্বেত সাম্রাজ্যের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে ও একাকী আপনার রূপে আপনি উজ্জ্বল হইয়া মনুষ্য-চক্ষুর অলক্ষ্য কোন্ রাজা-ধিরাজের বিশাল রাজ-সিংহাসনরূপে বিরাজ করিতেছে!

জোশীমঠ পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বেই একটা পথ সড়করাস্তা হইতে নীচে নামিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে মিলিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ পথের যাত্রীদিগের যাইবার সময় জোশীমঠ দর্শন ঘটে না। তাঁহারা বদরীনারায়ণ দর্শন পূর্ব্বক ফিরিবার সময় জোশীমঠ দর্শন করেন। তাঁহারা পঞ্জাব, জম্বু প্রভৃতি অঞ্চলের যাত্রী। কেননা, অন্ম যাত্রীদিগের পক্ষে এ পথ দিয়া ফিরিবার সুবিধা নাই। কিন্তু যে অঞ্চলের যাত্রীই হউন, এত নিকট হইতে এরূপ পুণ্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কাহারই পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

—o—

বিষ্ণুপ্রয়াগ।

বৈকালে আমরা জোশীমঠ হইতে রওনা হইলাম। এখান হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রায় ১৷০ মাইল পথ খাড়া উতরাই। সে পথও ঠিক্ সমতল নহে, পথের সর্ব্বাঙ্গে উচ্চ নীচ প্রস্তরখণ্ড যেখানে সেখানে বিকীর্ণ। অতি

কষ্টে ও সতর্কতার সহিত উহা অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুগঙ্গা বা ধবলগঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলাম। তীর হইতে নিম্নবর্ত্তী পুলে যাইবার রাস্তাটুকু আরও ভয়ানক। উহা পথের চিহ্নবিবর্জ্জিত খাড়া গড়ান। সর্ব্বনিম্ন-ভাগটা ভঙ্গপ্রবণ, কোনরূপে সেইস্থান দিয়া প্রাণ হাতে করিয়া পুলে উঠিতে হয়। কাঠের সামান্য ২টী পুল। তন্মধ্যে ১টী ভগ্ন, অপরটী অসম্পূর্ণ। সেই পুলের নিম্ন দিয়া উন্মত্তনৃত্যে বিষ্ণুগঙ্গা আসিয়া অলকনন্দায় মিশিতেছেন, এই সঙ্গমস্থানকেই বিষ্ণুপ্রয়াগ বলে। বিষ্ণু গঙ্গার প্রবাহ-বেগ অতি ভয়ঙ্কর। উপলখণ্ডে তরঙ্গতাড়নায় জলকণা উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত প্রবাহের গভীর গর্জ্জন কর্ণদেশ বধির করিয়া দিতেছে। আমরা পার হইয়া আসিয়া উন্নত তীরে দাঁড়াইয়া ভয়চকিতনেত্রে ঐ প্রচণ্ড প্রবাহভঙ্গি ক্ষণকাল না দেখিয়া নিরস্ত হইতে পারিলাম না। কি তীক্ষ্ণবেগেই প্রবাহের প্রধাবিত জলরাশি এখানে ঢালিয়া পড়িতেছে! নিম্নমুখে সজোরে সটান-লম্বিত অবয়বে উহা যেন পাতালে প্রবেশ করিতেছে! আবার কোথাও মণ্ডলাকারে বেগে মাথা উঠাইয়া কত উচ্চ হইয়া দেখা দিতেছে! কোথাও উন্মগ্ন পাষাণখণ্ডের মস্তকে উঠিয়া ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে! কোথাও গর্ব্বোদ্ধত কোন পাষাণের পার্শ্বদেশ ঘেঁসিয়া ছুটিয়া যাইবার জন্য কত আকুলি-বিকুলি করিতেছে! কোথাও তলস্থ প্রস্তরখণ্ডকে উঠাইবার জন্য তাহার সহিত প্রাণপণে যুঝিবার পর তলোদ্ভূত ঘূর্ণাবর্ত্তে উঠিয়া পড়িয়া যেন অনবরত ফেনরাশি উদ্বমন করিতেছে! আর তালে বে-তালে কত নৃত্য, কত উল্লম্ফন, কত উল্লুণ্ঠন, কত বিলুণ্ঠন, কত আস্ফালন, কত বিস্ফুরণ, কত উন্মজ্জন, কত নিমজ্জন, কত আবর্ত্তন, কত উদ্ঘূর্ণন, আর তাহার সহিত ঘন-গভীর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে, তাহা বর্ণনা করিয়া কি বুঝাইব? বুঝাইবার শক্তিই বা আমার কি আছে? দুই পার্শ্বে দুইটী আকাশস্পর্শী পর্ব্বতের অভেদ্য প্রাচীরের

মধ্যে আপন আপন প্রবাহ-বিস্তার সংযমিত করিয়া বিষ্ণুগঙ্গা আর অলকনন্দা এইবার আপনাদের সমস্ত শক্তি ও বিক্রম যেন একস্থানস্থ করিয়া উভয়েই উচ্চ হইতে এস্থানে ঢলিয়া পড়িতেছেন, এ সঙ্গমস্থান কিরূপ ভয়াবহ ও ভয়াবহ হইলেও কৌতুকাবহ, পাঠক তাহা ইহাতেই অনুভব করিয়া লউন।

সময় অপরাহ্ন বলিয়া আমরা এ দৃশ্য দর্শন হইতে চক্ষু ফিরাইলাম। তটের দিকে আর একটু অগ্রসর হইয়াই একটী ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর দেব-মন্দির দেখিতে পাইলাম। উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশের গুণেই মন্দিরটী আরও ঐরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল। ঠিক্ সঙ্গমস্থানের খাড়া ঊর্দ্ধ তীর-প্রান্তেই এই মন্দির। মন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া যিনি নদীসঙ্গমের প্রবাহভঙ্গিতে প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্যলীলা দেখিতে ইচ্ছুক, তিনি তাহাই দেখিতে পারেন। যিনি পরমা প্রকৃতির উপাসক, তিনি তাঁহার এই প্রিয় সাধনার স্থানে মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে আসনস্থ হইয়া ধ্যেয়বস্তুতে চিত্ত লগ্ন করিতে পারেন। কোথাও কোন বিঘ্ন-ব্যাঘাত নাই, সকলই নিভৃত, নিষ্পন্দ; কেবল অবিরামোত্থিত প্রবাহ-কল্লোলের কলকলধ্বনি, সকল ধ্বনিই তাহাতে নিমগ্ন হইয়া স্বতঃই চিত্তকে একতান করিতেছে; তাহার সহিত ধ্যানপ্রবাহ মিলাইবার কি অপূর্ব্ব উপায় এখানে নিত্য-প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে! মন্দিরের সম্মুখস্থ চাতালের এক পার্শ্ব দিয়া সঙ্গমস্থানে অবতীর্ণ হইবার সোপান। পর্ব্বতের গাত্র খুদিয়া প্রবাহ পর্য্যন্ত ক্রমনিম্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐ সোপানপরম্পরা বহু প্রয়াসে প্রস্তুত করা হইয়াছে। নিম্নবর্ত্তী সিঁড়ির দুই পাশে পর্ব্বতের গায়ে লোহার শিকল লাগাইয়া প্রবাহ পর্য্যন্ত উহা ঝুলাইয়া দেওয়া আছে। যাত্রীরা ঐ স্রোতঃকম্পিত শৃঙ্খল অবলম্বনে স্নানের অনেকটা সুবিধা পায়। তাহা হইলেও এই সঙ্গমে স্নান করা অতি দুঃসাধ্য কাজ। একটু অসাবধানে প্রবাহবেগে পড়িয়া প্রাণনাশের সর্ব্বদা সম্ভাবনা।

অনেক সময় এরূপ দুর্ঘটনাও ঘটিয়াছে। সেইজন্য অধিকাংশ যাত্রীই লোটা ডুবাইয়া মাথায় জল দিয়া থাকে। আমরাও ঐরূপ ব্যবস্থায়ই এখানে স্নানের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম। *

মন্দির হইতে একটু উপরে উঠিয়াই চটী। চটী অতি ক্ষুদ্র, এখানে ৩৪ খানি মাত্র দোকান আছে। ধর্ম্মশালা যাহা আছে, তাহা দোকানদারের অধিকারে। যাত্রীদিগের তাহা ব্যবহারে বিশেষ স্বাধীনতা নাই। অথচ যাতায়াতের পথে চটী, যাত্রিসমাগমের বিরাম নাই। বিশেষতঃ ইহার অগ্রবর্ত্তী রাস্তা অত্যন্ত উচ্চ ও ভয়াবহ বলিয়া, অপরাহ্নে যে সকল যাত্রী এ পথে আসে, তাহারা এখানেই আশ্রয় লইয়া থাকে। আমরাও

* বিষ্ণুপ্রয়াগকে স্নাত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ।
কুণ্ডানি শৃণু বক্ষ্যেহস্মে প্রয়াগে বিষ্ণুসংজ্ঞকে।
ধবলায়াস্তু গঙ্গায়াং যতঃ স্নানমভীপ্সিতং।
ধবলায়াং মহাভাগে তীর্থান্যুক্তানি মৎপ্রিয়ে।
শৃণুষ্বালকনন্দায়াং কুণ্ডানি প্রবরাণি বৈ।
পুনশ্চ—ইদং বিষ্ণুপ্রয়াগাখ্যং দ্বারং বিষ্ণোঃ প্রকীর্ত্তিতং।
পুলিনে ধবলায়াং বৈ বদরী তত্র বিশ্রুতা।
ঘটোদ্ভবেন মুনিনা ভৃশমারাধিতঃ পুরা।
চকার তত্র সান্নিধ্যং বদরীনাথকো হরিঃ।
ধারাদ্বয়ং সমাখ্যাতং সদাঃ প্রত্যয়কারকং।

অর্থাৎ এই বিষ্ণুপ্রয়াগ বদরীনারায়ণ যাত্রার দ্বারস্বরূপ। অত্রত্য ধবলা গঙ্গার পুলিনে যে বিখ্যাত বদরীবন ছিল, মহর্ষি অগস্ত্য পূর্ব্বকালে তথায় প্রাণপণে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ভগবান্ বিষ্ণুর এখানে সান্নিধ্য হইয়াছে। এই প্রয়াগে স্নান করিলে মনুষ্য মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। ধবলা ও অলকনন্দার ধারাদ্বয় এই প্রয়াগের নিদর্শন স্বরূপ।

শাস্ত্রোক্ত এই ধবলাগঙ্গাই এক্ষণে বিষ্ণু গঙ্গা নামে খ্যাত।

সেই অবস্থার যাত্রী। সন্ধান করিয়া দেখিলাম, সকল ঘরই যাত্রিপূর্ণ। বহুকষ্টে ঐরূপ একটা যাত্রিপূর্ণ অন্ধকার ঘরের মধ্যেই একটু স্থান পাইলাম। আশ্রয় পাইতেই সন্ধ্যা হইল ও সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যিনি যেখানে স্থান পাইয়াছিলেন, অধিকার দৃঢ় করিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। স্থানের এই কষ্টের উপর আর এক উপসর্গ উপস্থিত—ঝর ঝর করিয়া ছাদের নানা স্থান দিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তখন অনেকেরই নিজ নিজ স্থান পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা। কিন্তু পরিবর্ত্তন করিবার উপযুক্ত স্থান নাই, ঘর এমনই যাত্রীতে পরিপূর্ণ। অগত্যা যাহার ভাগ্যে যে স্থান পড়িয়াছে, সেই স্থানেই তাহাকে থাকিতে হইল। আমার ভাগ্যে বৃষ্টিপাতের উত্তম সুবিধাজনক যে স্থানটী পড়িয়াছিল, আমি যতক্ষণ জাগিয়াছিলাম, গামছা পাতিয়া ছাতা খুলিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম। তাহাতে কেহ আপত্তি করিলেও আমি কর্ণপাত করিলাম না। দিনমান পথশ্রমের পর রাত্রিকালে রাত্রিবাসের এই কষ্টের তুল্য কষ্ট বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু নাই বলিলে আর কি হইবে? নিদ্রালস-চক্ষে, আর নিদারুণ শীতে থরহরি-কম্পিত-বক্ষে বিনা-বাক্যব্যয়ে এই কষ্ট সহিতে লাগিলাম। গঙ্গা-সঙ্গমের গভীর গর্জ্জন নিশার নিস্তব্ধতায় আরও গভীর হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। মুহুর্মুহুঃ হৃৎকম্প হইতে লাগিল। দুর্য্যোগের ঝঞ্ঝনায় ও মেঘ-গর্জ্জনে থাকিয়া থাকিয়া ঘর দ্বার যেন কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতে লাগিল, যে যাত্রীসহিত এই জীর্ণ গৃহ বুঝি প্রচণ্ড-রবে এই ভয়ঙ্কর প্রবাহ-সঙ্গমে ভাঙ্গিয়া পড়ে! কিন্তু তাহা হইল না। বহু কষ্টে বহুদীর্ঘবৎ অনুভূত এই দুঃখের রজনী কাটিয়া গেল।

প্রভাতের আলোক-সঞ্চারে সহযাত্রীদিগের পরস্পরে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হওয়ায় কষ্টের যেন অনেকটা উপশম বোধ হইল। শীঘ্রই আমরা এ কারাগৃহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলাম।

এ চটীর সকলই মন্দ, ঝরণারও তেমনি কষ্ট, ময়দানও তথৈবচ। ফলতঃ এ স্থানের সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া যেন আমাদের আরাম বোধ হইল।

কিন্তু এ পথও তেমনি বিকট চড়াই, যেন ক্রমাগত আকাশে উঠিতেছি; পার্শ্বে তেমনি গভীর, যেন পদে পদে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছি; পথের পরিসর তেমনি সামান্য, যেন দেখ্-না-দেখ্ পদস্খলন হইবার উপক্রম হইতেছে! অনেক স্থানই বে-মেরামত। কিছুদূর আসিয়া একটা পুল পার হইতে হইল। আরও কয়েক মাইল আসিয়া ঘাট চটী নামে একটা চটী পাওয়া গেল। উহা অতিক্রম করিয়া আরও ২ কি ২॥০ মাইল পরে পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাজারের মধ্যে এক দোকানে বাসা লওয়া গেল। বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে এ স্থান ৭ মাইল।

—o—
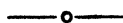
পাণ্ডুকেশ্বর।

পাণ্ডুকেশ্বর উত্তম স্থান। অনেকটা উগ্রমূর্ত্তি চড়াই ভাঙ্গার পর বলিয়া এই নিম্ন ও সমতলবর্ত্তী স্থানটী আরও মনোরম ও স্নিগ্ধদর্শন বলিয়া বোধ হইল। বাজার হইতে একটু ঢালু সমতলে শস্যক্ষেত্রও অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আছে। বসতি মন্দ নহে। বাজারে দোকান অনেকগুলি আছে। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের কোন অভাব নাই। কিন্তু মাছির অত্যন্ত উপদ্রব। অন্ন-ব্যঞ্জন বা দুগ্ধ-মিষ্টান্নাদি উদরস্থ করাই দুর্ঘট। পাহাড়ের সর্ব্বত্রই যদিও এ একটা অসাধারণ উপদ্রব আছে, তথাপি এই স্থানে ঐ উপদ্রবটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি বলিয়া আমার বোধ হইল।

রাস্তার অপর পার্শ্বে একটু নামিয়া গিয়া দুইটা প্রাচীন মন্দির দেখিলাম। মন্দির দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত; দেখিলেই বোধ হয়, দুইটিই

অত্যন্ত প্রাচীন। এমন কি, মন্দিরের নিম্নভাগ অনেকটা মাটির মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। একটী মন্দিরে ভগবান্ বিষ্ণুর যোগবদরী নামে ধাতুময় নারায়ণমূর্ত্তি ও অপরটীতেও ধাতুনির্ম্মিত বাসুদেব-মূর্ত্তি বর্ত্তমান। বিষ্ণু-মন্দির শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মন্দিরমধ্যে ৪ খানি তাম্র-ফলক রক্ষিত আছে। পঙ্ক্তিবদ্ধদেবনাগর অক্ষরে উহার আদ্যন্ত পূর্ণ। প্রচলিত দেবনাগর অক্ষর হইতে উহা অনেকাংশে বিভিন্ন, সহসা দেখিয়া কিছুই পড়িতে পারিলাম না। কিন্তু স্থিরচিত্তে নিয়ত অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিতে দেখিতে ঐ অক্ষরের পরিচয় করা যাইতে পারে এরূপ বোধ হইল। অক্ষরের কিঞ্চিৎ পরিচয়ে পদের অনুমান হয়, আবার পদের অনুমানেও কতকগুলি অক্ষরের অনুমান হয়। এক স্থানের পরিচয় অন্যস্থানে গিয়া কার্য্যকর হয়। এইরূপে কষ্ট স্বীকার করিয়া দেখিলে অনেকটা উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা। কেন না, অক্ষরগুলি অদ্যাপি লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের মত তীর্থযাত্রীর সে অবসর কোথায়? নিজের ঐরূপ অবস্থা ভাবিয়া বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। হায়, আমাদের এইরূপ ঔদাসীন্যে কতই ক্ষতি হইতেছে! না জানি এই প্রাচীন তাম্র-শাসনগুলি পড়িতে পারিলে কত প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই আবিষ্কৃত হইতে পারে! না জানি আমাদের কত বিষয়ে কত অন্ধকার এক মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া যায়! কিন্তু কোন্ অধ্যবসায়শীল মহাত্মা আমাদের চিরস্মরণীয় এমন মহোপকার সম্পাদন করিলেন? মন্দিরের পূজক দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ পাণ্ডুর সময়ের এই সকল তাম্রফলক, ইহাতে তাঁহারই রাজত্বের বা তাঁহার নিজেরই কোন বিশেষ ঘটনার কথা লিখিত আছে। আমরা ফলকগুলি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাই নাই। শ্রীযুত পদ্মনাভ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন, "বৃষমার্কা ফলকখানিই সব চেয়ে বড়, পরিমাণ ২৪ ইঞ্চ × ১৮ ইঞ্চ হইবে। ইহাতে প্রায় ৪০টী পঙ্‌ক্তি আছে। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে প্রায়

৭০টী অক্ষর। অন্য ৩ খানি ইহার অপেক্ষা পরিমাণে কিছু ছোট—লেখাও তেমন ঘন নয়"।

মন্দিরের সংলগ্ন বাড়ীতে মন্দিরের আশেপাশে ৪।৫টা ছোট ছোট প্রস্তরময় জীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় কুঠুরি আছে। আমরা স্নানাদির জন্য উহারই পার্শ্বদেশ দিয়া অগ্রসর হইলাম। ঐ স্থান দিয়া ক্ষুদ্র রাস্তা মাঠে নামিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বেড়া দেওয়া শস্যক্ষেত্র। ক্ষেত্রের কোন কোনটায় ন'টের শাকের আবাদ যথেষ্ট দেখিলাম। কেমন সুন্দর সতেজ ডাঁটাগুলি স্নিগ্ধ-হরিত কান্তিতে উজ্জ্বল হইয়া তৃণশূন্য ক্ষেত্র-গুলিকেও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে! কেদার ও গঙ্গোত্তরীর পথে এ শাকের কিছুমাত্র আদর নাই! সেখানে পাহাড়ীরা এই সকল শাক জঞ্জাল বোধে ক্ষেত হইতে তুলিয়া ফেলিয়াছে ও সেগুলি সেইরূপ অনা-দৃত অবস্থায় যেখানে-সেখানে পড়িয়া শুকাইতেছে, বরাবর দেখিয়া আসিতেছি। শাকের মধ্যে তাহারা ভুজ্জি বলিয়া এক রকম শাকমাত্র চিনে, তাও তার আদর বড় একটা নাই। কিন্তু এখানে বাঙ্গালীর এ ন'টের শাকের এত আদর কেন? বোধ হয় ঐ সকল পথে বাঙ্গালী যাত্রীর বিশেষ সমাগম নাই বলিয়া এ শাকেরও সেখানে আদর নাই। আর এই বদরীনারায়ণের পথে বাঙ্গালীর যথেষ্ট সমাগম, আর বাঙ্গালীরাও তেমনি শাকপ্রিয়, এখানকার পাহাড়ীরা তাহা বুঝিতে পারিয়াই আপনা-দের ক্ষেত্রে শাকের স্থান দিয়াছে। কালে নানাদেশীয় নানারূপ যাত্রীর আধিক্যে এ পাহাড়ভূমেও কত বিষয়ে কত রকম পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

আমরা শস্যক্ষেত্রগুলি ছাড়িয়া আরও কিছু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, পাহাড়ীরা নালা কাটিয়া ঐ স্থানে অলকনন্দার একটা ধারা আনিয়াছে। বোধ হয় স্রোতের বেগে গোধূম ভাঙ্গিবার কল চালান' অভিপ্রায়েই উহা আনাইয়া থাকিবে। যাহা হউক আমরা প্রশস্ত প্রান্তর মধ্যে বিনা-

প্রয়াসে ঐরূপ অজস্র ধারায় স্রোতের জল পাইয়া ইচ্ছামত স্নানে বড়ই তৃপ্তিবোধ করিলাম। আর সাধারণ পাহাড়ী পল্লীর মধ্যে হাঁটিয়া বেড়াইবার উপযুক্ত এতখানি সমতলক্ষেত্র আর কোথাও পাই নাই, আজ এখানে তাহা পাইয়াছি বলিয়া যে তৃপ্তি, এ তৃপ্তিও বড় কম তৃপ্তি নহে। সমতল স্থানই আমাদের অভ্যস্ত স্বাধীনতার স্থান। তাহার অভাবে যে ক্লেশ, আর পদে পদে প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে যে কষ্ট, তাহা এ পথে যে না আসিয়াছে, সে কখন বুঝিতে পারিবে না।

সে সকল কথা যাক্, যে স্থানে আসিয়াছি, তাহার কথা হউক। বাজারে যথায় আমরা বাসা লইয়াছিলাম, তাহার নিম্নবর্ত্তিনী অলকনন্দার অপর পারে তটবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে ১খানি সমতল প্রশস্ত শিলাখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ঐস্থানে মহারাজ পাণ্ডু তপস্যা করিয়াছিলেন, ঐখানেই কুরুক্ষেত্রের মহাযোদ্ধা পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয় বলিয়া আজিও লোকে দেখাইয়া দিয়া থাকে। এই জনশ্রুতির সহিত শাস্ত্রেরও সবিশেষ ঐকমত্য আছে। কেদারখণ্ডে লিখিত হইয়াছে,—

পাণ্ডুনা চ তপস্তপ্তং শপ্তেন মৃগরূপিণা।
মুনিনা পরকোপেন পাণ্ডুস্থানং ততঃ স্মৃতং।
প্রসন্নো ভগবানাহ পাণ্ডুং পরম সুন্দরং।
ভো ভোঃ পাণ্ডো তব ক্ষেত্রে ধর্ম্মাদীনাং সুতাঃ কিল।
ভবিষ্যন্তি সুতাত্মানঃ সর্ব্বে শাস্ত্রার্থপারগাঃ॥

ইহাতে পাণ্ডুস্থান বলিয়া এস্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে এইস্থানে সঙ্ঘটিত ঐ সকল ব্যাপার আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। সেই প্রসঙ্গের শ্লোকগুলির মর্ম্ম এইরূপ ;— মহারাজ পাণ্ডু মৃগয়া ব্যসনে আসক্ত হইয়া একদা মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মৃগীর সহিত সঙ্গত একটী মৃগ তীক্ষ্ণবাণে বিদ্ধ করেন। মৃগ তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তাঁহাকে অভিশাপ দেয়,

মহারাজ, আমি মৃগ নহি, মৃগবেশধর মুনিপুত্র। বন্য ফল মূল ভক্ষণে জীবন ধারণ করি, কাহারও কোন অনিষ্টসম্পর্কে থাকি না। তথাপি তুমি আমায় যেমন নিরপরাধে এই অবস্থায় নিহত করিলে, তুমিও এই আমারই ন্যায় অবস্থাপন্ন হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে সেই মৃগ কালবশতা প্রাপ্ত হইল। মহারাজ পাণ্ডু অতর্কিত দুর্ঘটনায় এরূপ দারুণ শাপগ্রস্ত হইয়া নিতান্ত অনুতপ্ত হইলেন। মহর্ষি বেদব্যাস হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি যে এরূপ পাপ-ব্যসনে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া বড়ই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেন এবং অতঃপর পিতৃবৃত্তিই অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া রাজধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্যার্থ নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া হিমালয়প্রস্থ আশ্রয় করিলেন। ধর্ম্মপত্নীদ্বয় তাঁহার সহিত বনবাসে নিতান্ত নির্ব্বন্ধ-পরায়ণ হওয়ায় তাঁহাদিগকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন।

ক্রমে তিনি হিমালয় অতিক্রম করিয়া কিছুদিন গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গমন ও হংসকূট উল্লঙ্ঘন করিয়া শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গিয়া বহুকাল তপস্যা করেন। একদা তত্রত্য তপঃসিদ্ধ তাপসগণ ব্রহ্মলোক-গমনে উদ্যত হইলে, মহারাজ পাণ্ডু অপুত্রতা-নিবন্ধন নিজের স্বর্গগতি নিরুদ্ধ জানিয়া ঐ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের নিকট বহু অনুতাপ করেন। তাহা শুনিয়া তাপসেরা কহিলেন, মহারাজ, এ নিমিত্ত আপনার অনুতাপের কোন কারণ নাই। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, আপনার দৈব সুপ্রসন্ন। আপনি কার্য্যদ্বারা সেই দৈব প্রসাদের ফললাভ করুন, অর্থাৎ দেবোপম সৎপুত্রধনে ধনী হউন, পরে স্বর্গে গমন করিবেন। ঋষিবাক্যে মহারাজ পাণ্ডু দুঃখ-দুশ্চিন্তাদি দূর করিলেন এবং প্রণিধানপূর্ব্বক কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া স্বয়ং অনুমতি দানে নিজক্ষেত্রে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারযুগল হইতে পঞ্চ পুত্ররত্ন লাভ করিলেন।

এই বৃত্তান্তও লোকমুখে এখানে যেমন চলিয়া আসিতেছে, স্থান-নির্দ্দেশও পরম্পরাক্রমে তেমনি চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং এই পাণ্ডুকেশ্বরই যে সে কালের সেই পাণ্ডুস্থান, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

বৈকালে আমরা পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় এক মাইল আন্দাজ পথ অতিক্রম করিয়া শেষধারা নামক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইলাম ও উহার পবিত্র জল স্পর্শ করিলাম। * ইহার সমীপে শেষনাগের একটী ক্ষুদ্র মন্দিরও আছে। ক্রমে বদরীনারায়ণ ক্ষেত্র যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, আমাদের উৎসাহ ততই বাড়িতেছে, ইহা লেখাই বাহুল্য। বিশেষতঃ ফেরত যাত্রীদিগকে যতই দেখা যায়, প্রাণ যেন আরও পুলকে নাচিয়া উঠে। দর্শন মাত্রেই তাঁহাদের মুখে বদরী-বিশালার জয়ধ্বনি, আমাদের মুখেও অমনি তাহারই প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে প্রায় ৩ মাইল পথ আসিয়া আমরা লামবগড় নামক চটী প্রাপ্ত হইলাম। চটী উত্তম, কিন্তু তখনও বেলা আছে, কি বলিয়া তখন বসিয়া থাকিব? অগত্যা আমরা এ চটী হইতে উঠিলাম।
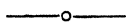
হনুমান চটী।

ক্রমে অলকনন্দার ধারে ধারে আমাদের গন্তব্য পথের পার্শ্বে পার্শ্বে এত পুষ্পিত লতা ও বৃক্ষ দেখা যাইতে লাগিল যে আমরা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম। বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়াই কি এখানে দিগ্‌-দিগন্ত-উদ্ভাসক এত অপরিমেয় পবিত্র শ্বেতপুষ্পরাশির ছড়াছড়ি? আমি মনে মনে ঐ প্রফুল্ল পুষ্পরাশি শ্রীনারায়ণের চরণযুগলে অর্পণ করিলাম।

---

* শেষতীর্থে মহাপুণ্যে গঙ্গায়াং স্নাতি যো নরঃ।
ইহলোকে বরান্ ভোগান্ পরত্র পরমাং গতিং॥

এ দিকের রাস্তা অতি কদর্য্য, বে-মেরামত। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ চড়াই। অধিকন্তু ভারবাহী ছাগলের পাল মধ্যে মধ্যে সমস্ত পথ জুড়িয়া চলিতে থাকায় স্থানে স্থানে যাত্রীদিগকে গতিবন্ধ করিয়া দাঁড়াইতে হয়। তথাপি আমরা এ বেলা পাণ্ডুকেশ্বর হইতে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হনুমান্ চটীতে উপস্থিত হইলাম। এ চটীর অগ্রেই এক প্রবল পার্ব্বত্য ধারা আসিয়া অলকনন্দায় মিশিয়াছে। ঐ ধারার নাম ঘৃতগঙ্গা। এই চটীতে মহাবীরের মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। একটী দোকানদার শিলাজতু প্রভৃতি ঔষধ বিক্রয়ের দোকান করিয়াছেন। লোকটী অতি ভদ্র। চটী মন্দ নহে, অনেকগুলি দোকান আছে। এই সকল চটীতে দুগ্ধ, গরম গরম লুচি, পেড়া প্রভৃতি মিষ্টান্ন সচরাচরই মিলে। এদিকে ক্রমে শীতের প্রাদুর্ভাব অধিক। আমরা একটু আবৃতস্থান বাছিয়া লইয়া রাত্রি যাপন করিলাম।

এইখানে বৈখানসমুনির আশ্রম ছিল এবং এই স্থানেই মরুত্ত রাজার বিখ্যাত যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল। দেবগুরু বৃহস্পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা সম্বর্ত্ত এই যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন এবং এই যজ্ঞে সমস্তই সুবর্ণময়-পাত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার নিকটবর্ত্তীস্থান খনন করিলে অদ্যাপি হোমকুণ্ডের অঙ্গাররাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। *

---o---

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

প্রভাতে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। অলকনন্দার তুষার-শীতল জলস্পর্শে হাত কন্‌কন্ করিতেছে, আগুনের সেক লইবারও বিলম্ব সহিল না। উৎসাহে ও আনন্দে বাহির হইয়া পড়িলাম। বদরীনারায়ণধামের

* ততঃ ক্রোশদ্বয়ে দেবি বৈখানসমুনিস্থলং। যজ্ঞভূমিস্তথা তত্র তেষাং মুনিবরাত্মনাং॥
নদীনাং প্রবরা সা বৈ মহাপাতকনাশিনী। হোতৃস্থানে মুনীনাঞ্চ শৃণু প্রত্যয়লক্ষণং॥
অদ্যাপি তৎপ্রদেশে বৈ যবা দগ্ধাস্তথা কিল। অঙ্গারশ্চাপি দৃশ্যন্তে হোতৃস্থানে মহাত্মনাং॥

আর ৪ কি ৪॥০ মাইল পথ অবশিষ্ট আছে। ইতিমধ্যে আর চটী নাই। কিন্তু এই পথ এমন চড়াই ও সমস্ত রাস্তা এখন সংস্কারহীন, যে উহা অতিক্রম করিতে আমাদের প্রাণান্তকর কষ্টবোধ হইতে লাগিল। ৪ মাইল স্থলে পথ ৮ মাইল বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। দুইধারে অতি উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত, তাহাতে গাছপালা কিছুই নাই, শৃঙ্গ সকল এখনও তুষাররাশিতে আচ্ছন্ন। নিম্নে অলকনন্দা তেমনি উচ্চ কোলাহলে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। তাঁহার গতিপথে অগণ্য প্রস্তরখণ্ড নিয়ত বাধা দিতে থাকায় তিনি নিয়তই যেন ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতেছেন, আর স্থানে স্থানে পর্ব্বতে পর্ব্বতে তাহার প্রতিধ্বনি ব্যক্ত হইতেছে। আমরাও যেমন ক্রমে উচ্চে উঠিতেছি, অলকনন্দাও তেমনি উচ্চ হইতে উচ্চতর কল্লোল-কোলাহল বিস্তার করিয়া নামিয়া আসিতেছেন দেখিলাম। পিতৃগৃহে আদরিণী কন্যা কিছু স্বাধীনা, কিছু মুখরাই হইয়া থাকে। ইনিই ত শেষে সাগরসঙ্গমে স্বয়ম্বরা হইয়াছেন!

বদরীনারায়ণের পথে।

কিন্তু এই প্রচণ্ড প্রবাহবেগ সহ্য করা উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বতেরও যেন অসাধ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। সারি সারি শৃঙ্খলাবদ্ধ শৈল সকল যতই নির্ভীকের ন্যায় উন্নতশিরে দণ্ডায়মান থাকুন, কিন্তু তাঁহাদের অর্দ্ধেক অঙ্গ ধ্বসিয়া নদীগর্ভে পতিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট অনুমান হইতে লাগিল। স্রোতের প্রবলবেগে মৃত্তিকাক্ষয় ত হইয়াই থাকে, দৃঢ়সঙ্ঘাত পর্ব্বতও শিথিলবন্ধ হয়। তার পর ভারকেন্দ্রের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমে একটু ঝুঁকিলেই সেই দিকের কিয়দংশ খসিয়া পড়িয়া ভারলাঘব করিতে থাকে। ইহাতে সন্দেহ কি? তাই এ সকল নদীগর্ভে এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর-খণ্ড বর্ত্তমান। অপরপার্শ্বস্থ পর্ব্বতের কতক অংশও ঐরূপে ধ্বস্ খাইয়া

হয়ত সমধিক বিস্তৃতভাবে পড়িয়া যায়। কালে সেই ধ্বস্ত অংশের উপরেই চটী, বসতি, ক্ষেত্র প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। বর্ত্তমান বসতি, চটী প্রভৃতিও হয়ত ঐরূপেই হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পরিণাম কত যুগ-যুগান্তরে সম্পন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, কে বলিতে পারে?

ক্রমে আমরা আমাদের গন্তব্য পথের মধ্যেও বরফরাশি পাইতে লাগিলাম। নীচের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম, অলকনন্দার তটও অনেক স্থানে বরফে বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে। আবার অলকনন্দার প্রবাহও স্থানে স্থানে বরফ-রাশিতে একবারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। গবাদি পশু ও মনুষ্যও তাহার উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছে! ঐরূপ তুষারাচ্ছন্ন অংশে কোথাও দেখিলাম, একখণ্ড বিশাল প্রস্তর কিছু মাথা তুলিয়া প্রবাহের গতি-পথে প্রকাশ্যে বাধা দেওয়ায় তথায় অলকনন্দা যেন ক্রোধভরে উন্মত্তার ন্যায় নিজের তুষারময় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রবাহ তথায় তুষারভার কোথায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া এমন প্রবল বেগে সেই পথরোধী সুদৃঢ় প্রস্তরখণ্ডের উপর ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়িতেছে, যেন বরফরাজ্যের মধ্যে হঠাৎ উৎসের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোথাও উভয়তট-ব্যাপী বরফের আচ্ছাদন গাঢ় হইতে গাঢ়তর আকার ধরিয়া এতদিন হয়ত নদী-প্রবাহের পরিসর একবারে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে তলস্থ ঐ প্রবাহের আকার অনুসারে উভয় পার্শ্বে ফাট ধরিয়া প্রবাহের পরিসর স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছে এবং নিজেরও অস্থায়িতার অঙ্কুর বিলক্ষণ উদ্ভাবন করিতেছে। কোথাও বরফরাশির কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া প্রবাহ-জলসাৎ হওয়ায় অবশিষ্ট অংশ খণ্ডিত হইলেও শুভ্রতা-মণ্ডিত নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, কোথাও দূর-বিস্তৃত বরফের ক্ষেত্র অভগ্ন হইলেও মনুষ্য-পশ্বাদির পদধূলির বা পবনোদ্ধূত ধূলিরাশির মলিন-স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গে প্রকট কালিমা বহন করিতেছে! কোথাও পর্ব্বত শিখর হইতে তুষারস্তূপ

গলিতে আরম্ভ করায় পর্ব্বতের শ্যাম অঙ্গ সুব্যক্ত হইয়া পড়িতেছে, আর বিভবক্ষয়ে বিভবশালীর অশ্রুধারার ন্যায় পর্ব্বতের সেই প্রভূত তুষারদ্রব প্রবল নির্ঝরের আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই হিমানীবিভব পরিমাণে এত অধিক যে ইহার অক্ষয়ভাণ্ডার ক্ষয় হইয়াও নিঃশেষে ক্ষয় হয় না! আমরা ত প্রখর গ্রীষ্মে যথাসম্ভব উপযুক্ত সময়ে যাত্রায় বাহির হইয়াছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এই হিমালয় অঞ্চলের কিরূপ অবস্থা ছিল একবার অনুমান করিয়া দেখুন। পর্ব্বতগুলি আপাদ-মস্তক ধূলিকঙ্কর-শূন্য নিষ্কলঙ্ক হিমরাশিতেই আচ্ছন্ন ছিল; সারি সারি শৃঙ্গগুলি যেন হিমের টোপর মাথায় দিয়া বসিয়াছিল। পর্ব্বতের গায়ে ক্ষোদিত পথগুলি হিমাবৃত হইয়া পর্ব্বত-রাজের শুভ্র কটিবন্ধ-রেখার আকার ধারণ করিয়াছিল। আর নদীগুলি ত শুধু বরফেরই নদী, নদীগর্ভের নিম্নতামাত্রে নদী বলিয়া অনুমান হইতেছিল। মন্দির-শ্রেণী হিমনির্ম্মিত মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। মার্ব্বল পাথর সদ্য সদ্য কাটিয়া দৈবপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ মন্দির সৃষ্টি করিতে পারিলে তাহাও কি এই বরফমণ্ডিত মন্দিরের সহিত তুলনার যোগ্য হয়? ফলতঃ অন্য সময়ের হিমালয় প্রকৃত হিমালয়ই হইয়া থাকে।

এখন আমরা এখনকার এই পর্ব্বতরাজ্যের শ্যামে ও হিমে মিশ্রিত অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দ্রবীভূত বরফ-স্পর্শে তীক্ষ্ণ-শীতল বায়ুপ্রবাহ আমাদিগের পথশ্রম দূর করিতে লাগিল। জ্বালানি কাঠের ভার লইয়া দলে দলে ধাবমান পাহাড়ী নর-নারী আমাদের কৌতুক বৃদ্ধি করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা, দেব-দর্শনান্তে প্রতিগমনোন্মুখ, প্রফুল্লমুখ যাত্রি-সমূহের ঘন ঘন আনন্দোচ্চারিত বদরীনারায়ণের জয়ধ্বনি আমাদের চিত্তক্ষেত্রে সবিশেষ অধিকার স্থাপন করিল। নারায়ণক্ষেত্র যে আসন্ন, তাহা স্পষ্টই আমরা অনুমান করিতে পারিলাম। পথের কঠিনতা দূর হইতে লাগিল, সুন্দর সমতল

ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অনতিবিলম্বে বদরীনারায়ণের পবিত্র পুরীর আভাস আমাদের নয়নাগ্রে অস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। অগ্রবর্ত্তী যাত্রীরা চীৎকার করিয়া কহিলেন, ঐ শ্রীমন্দিরের স্বর্ণময় চূড়া দেখা যাইতেছে! * সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে "বদরী-বিশালাকি জয়" ধ্বনি অসংখ্য কণ্ঠে উদ্গত হইল। আর কিসের ক্লেশ, কিসের শ্রান্তি! পথও আর তেমন উৎকট উন্নত নাই, সুন্দর সমতলক্ষেত্র পাইয়াছি। সমতল দিয়া আসিতে আসিতে অলকনন্দার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গড়ানে পথ দিয়া নামিয়া একটা কাঠের পুলের উপর উঠিতে হইল। † পুল পার হইয়া আবার গড়ান রাস্তা দিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিলাম।

—o—

বদরিকাশ্রম।

বদরীনাথের প্রশস্ত পুরী, বিস্তৃত বাজার। বাজারের আরম্ভেই ঋষি-গঙ্গা পাওয়া যায়, আরও একটু অগ্রসর হইলেই কূর্ম্মধারা। তারপর রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ, ঘন-সন্নিবিষ্ট অসংখ্য দোকান। একটু উপরে পাণ্ডাদের বাসস্থান ও কতকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। আমরা ধূলিপায়ে দেবদর্শনোদ্দেশে অগ্রে মন্দিরের দিকে ছুটিয়া চলিলাম। বাজার ছাড়াইয়া পথ হইতে উচ্চ ১৫।১৬টি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দ্বার প্রাপ্ত হইলাম। দ্বার অতিক্রমপূর্ব্বক মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখি সমগ্র দেবালয়টী যাত্রীতে পরিপূর্ণ। সকলেই দর্শনার্থী, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভিন্ন দর্শনের উপায় নাই। যাহারা যেমন অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদিগকে তেমনি অগ্রে দর্শন করাইয়া অন্য পথে বাহির করিয়া দিতেছে, এই অবসরে

* এই স্থানেই দক্ষিণ ধারে কুবেরশিলা আছে, তাহা অবশ্য দর্শনীয়।

কুবেরস্য শিলাং নত্বা দারিদ্র্যং নোপজায়তে।

† নূতন পুল প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। উহা প্রস্তুত হইলে পারের এরূপ কষ্ট থাকিবে না।

পশ্চাদ্বর্ত্তী যাত্রীরা অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বদর্শকদের স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা সেই ভিড় ঠেলিয়া অগ্রবর্ত্তীদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলাম না, হইতে ইচ্ছাও করিলাম না। পাণ্ডার লোকটীও আমাদিগকে ঐরূপ ব্যস্ত হইতে বারণ করিল। কহিল, আপনারা একটু স্থির হউন, যাত্রীর ভিড় একটু কমুক। বরং এই অবসরে আপনারা স্নান করিয়া আসুন, স্নানান্তে ভগবানের দর্শন করিবেন। আমরা তাহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। তাহাই যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু তাহা হইলে অগ্রে একটা বাসা লইয়া ঐ সকল করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল। কোথায় বাসা লওয়া যায়? পূর্ব্বে পরামর্শ করা হইয়াছিল যে এখানে আসিয়া পাণ্ডার বাটীতে বাসা লওয়া হইবে না। তীর্থকৃত্য অবশ্য পাণ্ডাদ্বারাই সম্পন্ন করিতে হইবে, কিন্তু অবস্থিতি কোন একটা ধর্ম্মশালাতেই করিতে হইবে। তদনুসারে আমরা পাণ্ডার কর্ম্মচারীটীর কথা না শুনিয়া ধর্ম্মশালার দিকে চলিলাম। কর্ম্মচারীটীও তাহার প্রভুকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল।

আমরা সন্ধান করিয়া বাবা কালীকমলীবালার কি রেওয়া-মহারাজের (ঠিক স্মরণ নাই) এক উত্তম ধর্ম্মশালায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, পাণ্ডাজীও সন্ধানে সন্ধানে তথায় গিয়া উপস্থিত। তখন তিনি আমাদের এখানে—এ ধর্ম্মশালার নিরাশ্রয় নির্ব্বান্ধব পুরীতে আসায় যে ঘোরতর অবিবেচনার কাজ হইয়াছে, তাহা অশেষ-বিশেষে বুঝাইতে লাগিলেন। আমরা ধর্ম্মশালায় স্বাধীনভাবে থাকার পক্ষে যত যুক্তি দিই, পাণ্ডাজী সে সকলই কষ্টের নামান্তর বলিয়া ততই খণ্ডন করিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য, মায়া-মমতা ও সাধুতা-শিষ্টতা এতই বাড়িয়া গেল যে আমরা অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহার অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। তাঁহার সঙ্গে সেখান হইতে আমাদিগকে উঠিতে হইল এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট একটা বাড়ীর উপরের একটা কুঠুরিতে বাসা লইতে হইল। পাণ্ডাজী আমাদের ভারি যত্ন ও তত্ত্বাবধান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু এখন আমাদের যত্নের কোন প্রয়োজন নাই, স্নানেরই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। পাণ্ডা আমাদের সঙ্গে লোক দিলেন। আমরা বাসা বন্ধ করিয়া সকলেই স্নানে চলিলাম। কেবল বালা আমাদের বাসার সম্মুখবর্ত্তী খোলা উঠানে রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া থাকিল। আমরা ঐ উঠান হইতে নীচে নামিয়া বাজারের মধ্যবর্ত্তী সমতল পথে বরাবর চলিয়া বদরীনারায়ণের বাটির সমীপেই উপস্থিত হইলাম। তবে সিঁড়ির দিকে না উঠিয়া সিড়ির নিম্নবর্ত্তী ঐ সমতল পথ হইতে কিছু নিম্নে নামিয়াই আমাদিগকে তপ্তকুণ্ডে যাইতে হইল। অর্থাৎ নীচে অলকনন্দার ঘাট, উপরে নারায়ণের মন্দির, মধ্যে এই তপ্তকুণ্ড। দুই দিক্ হইতে দুইটা ধারা আসিয়া এই কুণ্ডে পড়িতেছে। কুণ্ডে জল একবুক পরিমাণ হইবে, নামিতে কষ্ট নাই, উপরেও ছাদ দেওয়া আছে, জলও বেশ গা-সহা গোচ গরম, সুতরাং স্নানের কোন অসুবিধাই নাই। বরং এ দুর্জ্জয় হিমালয় পুরীতে এইরূপ গরম জলে স্নান বড়ই আরামদায়ক, বড়ই প্রীতিকর। যেমন এক দিক্ দিয়া কুণ্ডে জল পূর্ণ হইতেছে, তেমনি অন্য দিক্ দিয়া ঐ জল বাহির হইয়া যাইতেছে। আবার নিকটেই শীতল জলের প্রস্রবণ। আর সিঁড়ি বাহিয়া আর একটু নীচে নামিলেই প্রচণ্ডস্রোতস্বতী অলকনন্দার তুষার-শীতল প্রখর প্রবাহ।

১১টার সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইবে বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। গিয়া দেখি, যথাপূর্ব্বং তথা পরং, পূর্ব্বেও যেমন যাত্রীর ভিড় ছিল, এখনও তেমনি। যাত্রীদিগেরই বা অপরাধ কি? কোন্ দূর-দূরান্তর হইতে কতদিনে অভীষ্ট স্থানে পঁহছিয়াছে, পঁহুছিয়া দর্শন করিতে আর তর সহিবে কেন? কাজেই সকলে জমাট বাঁধিয়া ভিড় করিয়া রহিয়াছে। কে সে ভিড় ভাঙ্গিবে? আর কত কষ্টে অগ্রসর হইয়াই বা কে আমাদের জন্য পিছাইবে? দ্বাররক্ষকগণও যথানিয়মে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক যাত্রী প্রবেশ করাইতেছে, যথানিয়মে

পার্শ্বের দ্বার দিয়া তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিতেছে, আবার পিছনের দলকে তাহাদের স্থলে লইতেছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, তবে আর উপায় কি? উপায় আপনিই হইল, ক্রমে ভিড় কমিল, আমরাও দর্শন পাইলাম। মসৃণ শ্যামবর্ণ পাষাণময় অতিরমণীয় চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি, পুষ্প, মাল্য ও বহুমূল্য বসন-ভূষণে ভূষিত, মস্তকোপরি রত্নময় কিরীট-মুকুটাদি, তাহার উপরে সুবর্ণের ছত্র। বিগ্রহের বামে-দক্ষিণে লক্ষ্মী, কুবের, নর-নারায়ণ ও উদ্ধব-নারদাদি ভক্তচূড়ামণিগণ। দেখিয়া চরিতার্থ হইলাম। ভাবিলাম, প্রভো, এতদিনে কি এ অধমের বাসনা পূর্ণ করিলে? অতি দুঃসাহস, দুরাকাঙ্ক্ষার ভয় হে নিখিলভয়ভঞ্জন, আজি কি ভগ্ন করিলে? বড় আকাশ-পাতালব্যাপিনী দুশ্চিন্তায় এতদিন মগ্ন ছিলাম, হে দুশ্চিন্তা-হারী, আজি কোন্ কটাক্ষপাতমাত্রে তাহা হরণ করিলে? কঠোর পাষাণস্থলী কিরূপে চক্ষুর নিমিষে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করিলে? হে যোগগম্য আমি কি সত্য-সত্যই তোমার পাদপদ্ম দর্শন পাইয়াছি? কৃপাময়, তোমার কৃপায় কি না হয়? জড় জীবত্ব প্রাপ্ত হয়, জীব শিবত্ব প্রাপ্ত হয়! তোমার চতুর্ব্বাহু ত কল্পতরুর চতুঃশাখা! দয়াময়, যাহা দিয়াছ, যথেষ্ট দিয়াছ। আজি আমি কৃতার্থ! আর আমার প্রার্থয়িতব্য কি আছে?

আবার মনে হইল, দেখিয়া যে সব ভুলিয়া গেলাম! প্রার্থয়িতব্য কি আর কিছু নাই? আছে বৈ কি প্রভু! জীবন দিয়াছ ত, তাহা সার্থক করিয়া দাও, সামর্থ্য দিয়াছ ত সিদ্ধি দাও, সম্পদ্ দিয়াছ ত সন্তোষ দাও, সংযম দাও; কিন্তু কিসের সার্থকতা, কিরূপ সিদ্ধি, কেমন সন্তোষ ও কেমন সংযম, ক্ষুদ্র আমি তাহাই কি জানি? কি বলিয়া হৃদয়-বেদনা নিবেদন করি? তখন ভগবান্ শঙ্করস্বামীর সেই হৃদয়-ভেদিনী প্রার্থনা মনে পড়িল। করযোড়ে কাতরকণ্ঠে পাঠ করিলাম—

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো, দময় মনঃ, শময় বিষয়-মৃগতৃষ্ণাং।
ভূতদয়াং বিস্তারয়, তারয় সংসার-সাগরতঃ॥

ভগবন্ বিষ্ণো, আমার অবিনয় অপনয়ন কর, চিত্ত দমন কর, রূপ-রসাদি-বিষয়স্বরূপ মৃগতৃষ্ণা প্রশমন কর, সর্ব্বভূতে আমার দয়া বিস্তার কর এবং এইরূপে আমায় দুস্তর সংসার-সাগর হইতে নিস্তার কর। *

প্রার্থনার পর বন্দনা—

দিব্যধুনী-মকরন্দে পরিমলপরিভোগ-সচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতি-পদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥

দেবনদী ভাগীরথী যে পাদপদ্মে মকরন্দবিন্দুস্বরূপ; নিত্যজ্ঞান ও নিত্য নির্ম্মল আনন্দ যথায় পরিপূর্ণ পরিমলস্বরূপ, আমি ভগবানের সেই পাদপদ্মযুগল বন্দনা করি; অনন্তকাল যেন আমার জন্ম-জরা-মরণাদিজন্য ভয় ও ক্লেশরাশির বিনাশ হয়।

এইবার আত্মনিবেদন—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

হে নাথ, যদিও আমার ভেদবুদ্ধির অপগম হইয়াছে, অর্থাৎ তুমি ছাড়া আমি বলিয়া পৃথক্ বস্তু একটা কিছু নাই, তুমিই সর্ব্বস্ব, এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, তথাপি হে প্রভো, তোমারই আমি, আমার তুমি

* বাল-ব্রহ্মচারী শঙ্করাবতার শঙ্করস্বামীর কি সরলতা! তখনও বুঝি অলক্ষিতে অহংভাব চিত্তস্পর্শ করে, তখনও যেন চিত্তে রূপরসাদির ক্ষণিক ছায়াপাত হয়। তাই চিত্তদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ভগবৎসমীপে নিজ প্রার্থনা জানাইতেছেন। জ্ঞানগুরু কঠোর তার্কিকের একি সরল-সুকুমার বাল ভাব! এমন দেবতুল্য হৃদয় না হইলে কি তথায় অদ্বৈত ব্রহ্মভাবের পূর্ণ আবির্ভাব হয়?

নহ। কেননা, সমুদ্রেরই তরঙ্গ হয়, ইহাই ত সত্য; তরঙ্গের সমুদ্র, ইহা কি বলা যায়? * ইত্যাদি।

দেবদর্শনের এখন পরিমিত সময়। স্তুতিপাঠ মাত্র করিয়া পিছাইতে হইল। আমার ন্যায় শত শত যাত্রী আজি দর্শন-ভিখারী হইয়া ভগবানের দ্বারে উপস্থিত। তাঁহাদিগকে অবসর দিয়া আমরা একদল ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে মন্দিরের দক্ষিণের দ্বারের নিকটে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির। মন্দিরমধ্যে বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা লক্ষ্মীদেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি। এ মন্দিরটী ক্ষুদ্র। উহার সমীপেই নারায়ণের ভোগমন্দির। ঐ স্থানে নিত্যভোগের কয়েক মণ চাউল, দাল, ও তরকারি প্রভৃতি পাক হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণে দরজার দিকে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত গরুড়ের মূর্ত্তি। মন্দিরের অপর পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি দোকান। মন্দির প্রদক্ষিণের সময় সমস্ত দেখিতে পাইলাম। অদ্য আমাদের অন্যান্য তীর্থকৃত্য বা নারায়ণের পূজা, ভোগ দেওয়া বা ব্রাহ্মণ ভোজনের সুবিধা হইল না। পরদিন ঐ সমস্ত করার ব্যবস্থা হইল। আপাততঃ আমরা পাণ্ডার কর্ম্ম-চারীর সহিত বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

নারায়ণের জন্য নিত্য প্রচুর অন্নভোগ হইয়া থাকে, ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভোগনিবেদনের পর উক্ত মহাপ্রসাদ মন্দিরের সমস্ত কর্ম্মচারী, ভৃত্যবর্গ ও পাণ্ডা প্রভৃতিকে যথানিয়মে দেওয়া হয়। পাণ্ডা-দিগের কল্যাণে যাত্রীরাও উক্ত প্রসাদ পাইয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের ন্যায় ইহারও পুরীর মধ্যে স্পর্শ-দোষ নাই। প্রভেদের মধ্যে এ প্রসাদ বাজারে বিক্রয় হয় না। শাস্ত্রে আছে,—বদরীনাথনৈবেদ্যং

* হায়, কি দীনতা, কি অকিঞ্চনতা! কে বলে শঙ্করাচার্য্য শুষ্কজ্ঞানী? বিশুদ্ধ ভক্তির অমন মন্দাকিনীধারা এমন আর কোথায় বহিয়াছে? শিশিরবিন্দু হইয়া সমুদ্রে আত্ম-সমর্পণ করিতে এমন আর কে পারিয়াছে? বিশুদ্ধ জ্ঞানী না হইলে কি বিশুদ্ধা ভক্তির স্ফূর্ত্তি হয়?

ভুক্তং যৈ র্ভক্তিতৎপরৈঃ। অভোজ্যাশনদোষাদ্যৈ মু্‌চ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ। প্রসাদং হরিনৈবেদ্যং ভুঞ্জীয়াদ্‌ভক্তিতৎপরঃ। অর্থাৎ বদরীনাথের উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিলে অভক্ষ্যভক্ষণজনিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতএব ভক্তিপরায়ণ হইয়া ভগবানের প্রসাদ ও নৈবেদ্য ভোজন করিবে। লক্ষ্মীঃ পচতি নৈবেদ্যং ভুঙ্‌ক্তে নারায়ণঃ স্বয়ং। চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং ন দোষায় ভবেৎ ক্বচিৎ। বদরীনাথনৈবেদ্যং যো মোহাত্তু পরিত্যজেৎ। চাণ্ডালাদধমো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥

অর্থাৎ নৈবেদ্য লক্ষ্মী স্বয়ং পাক করেন ও স্বয়ং নারায়ণ তাহা ভক্ষণ করেন। এ নিমিত্ত চাণ্ডালে স্পর্শ করিলেও সে নৈবেদ্য কোনরূপ দোষাবহ হয় না। বরং যে ব্যক্তি মোহবশতঃ উক্ত নৈবেদ্য পরিত্যাগ করে, সেই চাণ্ডালাধম ও সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত।

বদরীনারায়ণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ক্ষেত্রপ্রাপ্তিনিমিত্তক একদিন উপবাস করিবে। প্রভাতে গঙ্গাস্নান ও নারদকুণ্ডে স্নানপূর্ব্বক তপ্তকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। স্নানে অশক্তের পক্ষে মার্জ্জনাদি। পরে যথাশক্তি উপহার লইয়া ভগবানের পাদপদ্ম হইতে কিরীটপর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিবে। দর্শনের পরে প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর ব্রাহ্মণোদ্দেশে গো, ভূমি, অন্ন, স্বর্ণাদিধাতু, অশ্বগজাদিবাহন, যাহার যেমন শক্তি, দান করিবে। এখানে একটী গাভীর অবয়বের পরিমাণ ভূমিদান করিলে তাহা বেদপারগ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে সমগ্র পৃথিবী দান করার তুল্য হয় ও যৎকিঞ্চিৎ স্বর্ণদানও স্বর্ণের তুলাদান করার ন্যায় ফলপ্রদ হয়। গঙ্গাতটে ও নারায়ণ-মন্দিরে দীপদানেরও বহুফল লিখিত হইয়াছে। *

---

* ক্ষেত্রে শুভে ততো গত্বা ঋষিগঙ্গোত্তরে নরঃ। ক্ষেত্রোপবাসং কুর্য্যাদ্বৈ দিনমেকং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

প্রাতঃ স্নাত্বাতু গঙ্গায়াং নারদীয় হ্রদাদিষু। বহ্নিতীর্থে ততঃ স্নায়াৎ্প্রিয়তো যতমানসঃ॥

আকিরীটাঙ্ঘ্রিপর্য্যন্তং পশ্যেন্নারায়ণং বিভুং। যথাশক্ত্যা ব্রাহ্মণেভ্যো দদ্যাদত্র মহামনাঃ॥

বদরিকাশ্রমে আগমন করিয়া নিম্নলিখিত পঞ্চতীর্থে স্নান-মার্জ্জনাদি ও পঞ্চশিলা দর্শন পূজনাদি এবং কেদার-নামক শিবলিঙ্গের পূজন অবশ্য কর্ত্তব্য।* পঞ্চতীর্থ, যথা—প্রথম ঋষিগঙ্গা, ইহা বাজার হইতে দক্ষিণ ধারে, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কূর্ম্মধারা, ইহা বাজারের মধ্যে। তৃতীয় প্রহ্লাদধারা। চতুর্থ তপ্তকুণ্ড। তপ্তকুণ্ডের বিষয় ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চম নারদকুণ্ড। ইহা তপ্তকুণ্ডের নীচে, অলকনন্দার ধারে। প্রবাদ এই যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই নারদকুণ্ডে ডুব দিয়া বদরীনারায়ণ বিগ্রহ উত্তোলন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে ইহার এইরূপ মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে যে নারদীয় হ্রদে স্নান করিলে পুনর্ব্বার জননীর স্তন্যপান করিতে হয় না অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। উক্ত হ্রদে ভগবান নারায়ণের বহুমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। যুগে যুগে নারায়ণের অংশাবতারস্বরূপ মুনীশ্বরগণ আবির্ভূত হইবেন ও বদরীনাথ নামে ঐ সকল মূর্ত্তি এখানে স্থাপন করিবেন।

প্রদক্ষিণং ততঃ কুর্য্যাদ্‌ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ। তত্তত্তীর্থেষু চাগত্য দদ্যাদ্দানানি শক্তিতঃ॥
গোচর্ম্মমাত্রা পৃথিবী যেন দত্তা কুটুম্বিনে। তেন সর্ব্বমহী দত্তা ব্রাহ্মণে বেদপারগে॥
ত্রুটিমাত্রং হিরণ্যং বৈ দত্তং বেদবিদে পুনঃ। সুবর্ণস্য তুলাদানাদ্ যত্তৎ ফলমবাপ্নুয়াৎ।
দেবালয়ে মহাবিষ্ণোর্গত্বায়ং যোধসি প্রভো। দীপা দেয়াশ্চন্দ্রগুপ্ত সংসার-পরিমুক্তয়ে।
দীপদশ্চক্ষুরাপ্নোতি স্বর্ণদোষপুরুত্তমং। অন্নদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি ধাতুদো ভাগ্যমুত্তমং।
গোপ্রদাতা মহাভাগ সংসারে ন স জায়তে। হস্ত্যোগজদশ্চৈব যানং প্রাপ্নোতি সত্তম।

নরনারায়ণৌ শ্রেষ্ঠৌ পর্ব্বতৌ মুনিপুঙ্গবৌ।
যো নমেৎ পরয়া ভক্ত্যা ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥
স্নাত্বা ঋষীণাং গঙ্গায়াং ধারায়াং যে সমাহিতাঃ।
পানং কুর্ব্বন্তি তে মর্ত্ত্যাঃ পরং ব্রহ্ম সমাপ্নুয়ুঃ॥
আচামেৎ কূর্ম্মধারায়াং জলং পরমপাবনং।
যদীচ্ছেৎ সুতরাং শুদ্ধিং দর্শনে পরমাত্মনঃ॥
নারদীয়হ্রদে স্নাত্বা ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ।

পঞ্চশিলার মধ্যে, প্রথম নারদ শিলা, দ্বিতীয় বরাহ শিলা, তৃতীয় নরসিংহ শিলা, চতুর্থ গরুড় শিলা ও পঞ্চম মার্কণ্ডেয় শিলা। তপ্তকুণ্ডের প্রস্রবণ যেস্থান হইতে নির্গত হইয়াছে, তথায় গরুড় শিলা আছে। এই পঞ্চ শিলার মধ্যে বদরীনারায়ণের আসন অবস্থিত। তপ্তকুণ্ডের কিঞ্চিৎ উপরেই কেদারনামে শিবলিঙ্গ আছেন। অত্রত্য নর ও নারায়ণনামক পর্ব্বতদ্বয়ও মুনিবুদ্ধিতে প্রণম্য।

ব্রহ্মকপাল নামক স্থানে পিণ্ডদান যাত্রীদিগের একটী প্রধান কার্য্য। ইহার এইরূপ ফলশ্রুতি আছে যে পিতৃলোক যতই পাপকারী ও যতই দুর্গতি প্রাপ্ত হউন, ব্রহ্মকপালে তাঁহাদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে তাঁহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত পিণ্ডদান ভক্তিপূর্ব্বক

তত্র বহ্ব্যো মূর্ত্তয়শ্চ সন্তি বৈ শ্রীপতে র্বিভোঃ
যুগে যুগে ভবিষ্যন্তি বিষ্ণোরংশামুনীশ্বরাঃ।
স্থাপয়িষ্যন্তি দেবেশং বদরীনাথনামকং ॥
তথা পঞ্চশিলাং নত্বা পরিক্রম্যাচ্চয়েৎ সুধীঃ।
সংপূজ্য তত্র কেদারং শিবলোকে মহীয়তে ॥
নারদীয়শিলা যত্র বিষ্ণুলোক প্রদায়িনী।
শিলা যত্র চ বারাহী পাপহা সর্ব্বকামদা।
বারাহকুণ্ডকাখ্যাতং বিষ্ণুপদ্যাং হি মৎপ্রিয়ে।
নারসিংহী শিলাতত্র সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
মার্কণ্ডেয় শিলা যত্র সর্ব্বলোকেষু দুর্লভা।
যাং স্পৃষ্ট্বা পিতৃণাং ভক্ত্যা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
গারুড়ীচ তথা প্রোক্তা গরুড়েন মহাত্মনা।
প্রাপ্তং হরের্বাহনত্বং সখ্যঞ্চ পরমং হরেঃ ॥
এতৎপঞ্চশিলামধ্যে হ্যাসনং বদরীপ্রভোঃ।
বহ্নিতীর্থ সমাযুক্তং বিষ্ণুলোকপ্রদং শিবে ॥

কেদারখণ্ড।

হউক না হউক, তাহাতেও ক্ষতি নাই। এই নিমিত্ত পিতৃলোক উৎসুক-চিত্তে অপেক্ষা করিতে থাকেন যে আমাদের বংশীয় কোন সন্তান যদি এখানে আগমন করে। ব্রহ্মকপালে শ্রাদ্ধতর্পণ করিলে গয়া বা অন্য তীর্থ গমনের কোন প্রয়োজন নাই। এই ব্রহ্মকপাল বদরীনাথের মন্দির হইতে অল্প দূর ঈশান কোণে নিম্নবর্ত্তী অলকনন্দার তীরে অবস্থিত।

দ্বিতীয় দিবসে আমাদের নারায়ণের পূজা ও ভোগ দেওয়া এবং যথাসাধ্য তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করা হইল। তৎপরে পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পন্ন করিয়া আমরা ভোজন করিলাম। পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণেরা পুরী ও মিষ্টান্নাদি স্বয়ং বরাদ্দ করিয়া দিলেন, তদনুসারে দোকান হইতে টাট্‌কা ঐ সকলে দ্রব্য আনীত হইল। আমাদের ভারবহক বালাও ব্রাহ্মণ, তাহারও আজি আমাদের নিকট তুল্য আদর। বাঙ্গালী অপেক্ষা পাহাড়ীরা ভোজনে পটু, পরিশ্রমে অধিকতর পটু এবং কি উড়িয়া, কি বাঙ্গালী উভয় অপেক্ষা ইহারা সাধরণতঃ গৌরবর্ণ। ভোজনার্থী নানা দেশীয় সন্ন্যাসীরও এখানে অভাব নাই। ইঁহাদের নিমন্ত্রণ করা দুরে থাক্‌, বাজারে মিষ্টান্ন কিনিতে গেলেও তাঁহাদিগকে কিছু না দিয়া অব্যাহতি নাই। শুধু খাদ্য দ্রব্য কেন, একখানি পুস্তক কিনিতে গেলেও ঐ পুস্তকের প্রার্থী ৫ জন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন ও বাঙ্গালী লোগ বড়া ভক্তিমান্ হ্যায় বলিয়া যাত্রীর স্তুতিবাদ আরম্ভ করিবেন। না দিলে শাপান্ত করাও আছে। ফলতঃ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে ভেকধারীর সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও কম নয়।

---

* ব্রহ্মকপালে পিতরঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্ববংশজং। তিষ্ঠন্তি তস্মাৎ পিণ্ডানাং প্রদানং মুনয়োহব্রুবন্। অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতোবাপি ভক্ত্যাহভক্ত্যাথবা পুনঃ। যৈরত্র পিণ্ডবপনং কৃতং জলহুতপর্ণং। তারিতাঃ পিতরস্তেন দুর্গতা অপি পাপিনঃ। কিং গয়াগমনাদ্যৈর্বা কিমন্যতীর্থতর্পণৈঃ।

পাণ্ডাজাতীয় কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা যাত্রীদিগকে তীর্থ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া বেড়ান ও মাহাত্ম্য-প্রকাশক বচন গুলির হিন্দিতে ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা শ্রোতাদিগের নিকট তাঁহাদের কিছু কিছু প্রাপ্তি ঘটে। সন্ধ্যাকালে তাহাও শোনা গেল ও বাজার হইতে বদরীমাহাত্ম্য পুস্তক যাহা ক্রয় করিয়াছিলাম তাহাও দেখা গেল। ক্রমে শীত অধিক বোধ হইতে লাগিল। এখানে শীত বিলক্ষণ প্রবল, তাহা বলাই বাহুল্য, তবে গঙ্গোত্তরী ও কেদার অপেক্ষা কম। যাহা হউক, শীত নিবারণের জন্য আগুন করিতে হইয়াছিল। আমরা যেমন আগুন করিয়াছি, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তেমনি ধুনি লাগাইয়া সম্মিলিত-কণ্ঠে সুস্বরে স্তব আরম্ভ করিয়াছেন, শুনিতে পাইলাম—

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল
হেম-মন্দিরশোভিতম্।
নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল
বদরিনাথ-বিশ্বম্ভরম্।
শেষ সুমিরণ করত নিশিদিন
ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্।
বেদ ব্রহ্মা করত অস্তুতি
বদরিনাথ বিশ্বম্ভরম্।
ইন্দ্র চন্দ্র, কুবের ধুনিকর,
ধূপদীপ প্রকাশিতম্।
সিদ্ধ মুনিজন করত জয় জয়
বদরিনাথ-বিশ্বম্ভরম্॥
ইত্যাদি।

মূল কথা, বদরীনারায়ণ-পুরী কি বাহ্য দৃষ্টিতে, কি শাস্ত্র দৃষ্টিতে সর্ব্বথা অতি রমণীয় স্থান। কৈলাস ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের নিম্নভাগে ও পবিত্র

স্রোতস্বতী অলকনন্দার অনুচ্চ-তটে এই পুরী কি সুসন্নিবিষ্ট! চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গসকল তুষারে আবৃত, অলকনন্দার খরপ্রবাহ এখনও অনেক স্থানে তুষারে সমাচ্ছন্ন। মধ্যে এই বিস্তৃত উপত্যকা কত কত ধর্ম্মার্থী গৃহী, যোগী, সাধু-সন্ন্যাসীকে ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া তাহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছে, কত পবিত্র প্রস্রবণ এখানে গিরিগাত্র হইতে অবতীর্ণ হইয়া লোকের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। তপ্তকুণ্ডের ধারা মার্জ্জন-অবগাহনে কতই তৃপ্তি উৎপাদন করিতেছে। ঘন-সন্নিবিষ্ট অসংখ্য দোকান, অগণ্য জনসমাগম। সমাগত ঐ জন-মণ্ডলীর মুখে কেবল 'আনন্দ কোলাহল, হৃদয়ে কেবল ভক্তি ও আনন্দের ধারা। সংসারের যুদ্ধবিগ্রহ, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, দস্যুবৃত্তি, উৎকট প্রতারণা, প্রবঞ্চনা এখানে কিছুই নাই। এখানে কত মহাত্মা কত দান-ধ্যানে রত। কত ভাগ্যবান্ রাজা, শ্রেষ্ঠী, সমৃদ্ধ লোক, কত দীন-অনাথ-আতুর সাধু-সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইতেছেন, কত ভোজ্যবস্তু নিয়ত প্রস্তুত হইতেছে ও নিয়ত বিক্রীত হইতেছে, সহস্র সহস্র মুখে দেবতার জয়ধ্বনি, দেবতার স্তুতি-গীত উদ্‌গীত হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ-ধারায় আপ্লুত ও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। বস্তুতঃ এস্থান অদ্যাপি প্রকৃত তপস্যার ক্ষেত্র হইয়া আছে। এখানে সাত্ত্বিক ভাবের আপনিই স্ফূর্ত্তি হয়। প্রাণিহিংসা একেবারেই নাই। মৎস্য, মাংস, মদ্যের স্পর্শ নাই। অব্যবহার্য্য অনাচরণীয় বিলাসদ্রব্যের প্রবেশ নাই। অধিক কি, দেবদ্বিজ ও সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি ঘোষণায় চির-দীক্ষিত, সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি মিশনারি মহাত্মাদিগেরও এখানে উপদ্রব নাই। জীবনধারণের নিতান্ত উপযোগী দ্রব্যাদিই এখানে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, উপদ্রব নিবারণার্থ ও শৃঙ্খলাবিধানার্থ পুলিশ আছে। সাময়িক ডাকের বন্দোবস্ত আছে। ডাকঘরের নাম্ বদরীনাথ পোষ্ট আপিস্। এই তীর্থের সবিস্তর বিবরণ কলিকাতার সুবিখ্যাত "সাহিত্য" পত্রে সুলিখিত একটী প্রবন্ধ হইতে আমরা কতক উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"বদরীনাথ ক্ষেত্রের পরিমাণ পূর্ব্ব-পশ্চিমে দেড় ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে উহার অর্দ্ধেক হইবে। এই স্থানের উচ্চতা প্রায় দশহাজার চারিশত ফিট। আরও উর্দ্ধে সমুদ্র-সমতল হইতে ২৩ হাজার ফিট উর্দ্ধে হিমপ্রবাহ। এইখানে গঙ্গার উৎপত্তি। তীর্থক্ষেত্রের কেন্দ্রবর্ত্তী দেবালয় শঙ্করাচার্য্যের সময়ে নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষীয় কালতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে এই দেবালয় দুইহাজার বৎসর এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ১২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটী হিন্দুরীতি-অনুসারে শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ তাম্রমণ্ডিত। ঘণ্টাগৃহ ও অন্যান্য গৃহসমূহ মন্দির নির্ম্মাণের বহুকাল পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবসেবার জন্য বহুসংখ্যক পুরোহিত, পাঠক ও ভৃত্য নিযুক্ত আছে। গাড়োয়াল ও তিহরীর রাজা দেবালয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে কাশী-নরেশের হস্তে মন্দিরসংক্রান্ত তত্ত্বাবধারণের ভার ছিল। কিন্তু দূরত্ব-নিবন্ধন মন্দিরের কার্য্য পরিচালনে বিশৃঙ্খলা ঘটায় তিনি এই কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেবোত্তর সম্পত্তি ও যাত্রিদত্ত অর্থে মন্দিরের বার্ষিক আয় ৪৮০০০ টাকা। এই উপস্বত্বের মধ্যে ২৮০০০ টাকা দেবসেবা প্রভৃতির জন্য ব্যয়িত হয়। উপস্বত্বের উদ্ধৃত অর্থ হইতে এখন প্রায় ৪০০০০ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। রাওল উপাধিধারী প্রধান পুরোহিত দক্ষিণা-পথের কেরলদেশীয় ব্রাহ্মণ। পুরোহিতের পদ উত্তরাধিকার-মূলক নহে। কেরল হইতে প্রধান পুরোহিত নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। পুরোহিতের মাসিক বেতন ১০০৲ একশত টাকা। প্রতিবৎসর তীর্থক্ষেত্রে ৬০।৭০ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

বেলা ৯টার সময় বিগ্রহের স্নান হয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অদৃষ্টেই "নির্ব্বাণ দর্শন" বা রত্নভূষণ ও বেশবিমুক্ত সমাধিমগ্ন দেবমূর্ত্তির দর্শনলাভ ঘটে। যে গৃহে দেবতার স্নান হয়, তাহার দ্বারদেশ রজত-মণ্ডিত। বাহিরের ঘর তাম্র-মণ্ডিত। ইহার পরিমাণ ২৪ × ১৮ ফিট্। ভিতরের কক্ষটী আরও

ক্ষুদ্র। অন্তঃকক্ষের কিছু দূরে একটা রেলিংএর নিকট যাত্রীরা সমবেত হয়। অন্তঃকক্ষ এরূপ অন্ধকারময় যে, দেবমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যায় না। বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বিগ্রহের নিকট গিয়া দেবদর্শন করিতে পারে না। কক্ষ-মধ্যস্থ দীপালোক অনুজ্জ্বল। ঘৃতপ্রদীপ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার আলোক এখানে নিষিদ্ধ। দিবারাত্রি মন্দিরে ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। বিশিষ্ট যাত্রীদিগের আগমন উপলক্ষে পুরোহিতেরা যখন কর্পূর প্রজ্জ্বলিত করেন, তখনই বিগ্রহমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যায়।

বদরীনাথমূর্ত্তিটী অতি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক। শঙ্করাচার্য্য সাত-বার নারদকুণ্ডে ডুব দিয়া এই মূর্ত্তি উত্তোলন করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটী পদ্মাসনে সমাধিমগ্ন ও ধূসর প্রস্তরে নির্ম্মিত। বিগ্রহ-মূর্ত্তির নিকট উদ্ধব-নারদ প্রভৃতি ভক্তগণের মূর্ত্তি সংস্থাপিত। বিগ্রহ যখন বসন ভূষণে সজ্জিত হন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি অতি রমণীয় হইয়া উঠে। কিন্তু বদরীনাথের নির্ব্বাণ মূর্ত্তি দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে গভীর আনন্দ ও ভক্তির সঞ্চার করে। যে সিংহাসনে বিগ্রহ স্থাপিত হয়, তাহার মূল্য চারি হাজার টাকা। দেবতার রত্নালঙ্কারাদির মূল্য ৭।৮ হাজার টাকা হইবে। শীত সমাগমে যখন দেবমন্দির তুষার-মধ্যে সমাহিত হয়, তখন মন্দিরের ধনরত্নরাজি জোশীমঠে আনীত হইয়া থাকে। মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিবার সময় দুইমন ঘৃতের এক প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয়। যাহাতে প্রদীপ জ্বলিবার কোন বিঘ্ন না হয়, তজ্জন্য মন্দিরে বায়ুসঞ্চারের পথ থাকে। ছয়মাস পরে তুষার-রাশি অপসারিত করিয়া মন্দিরদ্বার প্রথম উদ্‌ঘাটন করিবার সময় মন্দির-মধ্যে ধূসর আলোক শিখা দৃষ্টিগোচর হয়। এই দ্বার-মোচনের পূর্ব্বে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইলে লোকে তাহা অনাবৃষ্টি ও সংক্রামক রোগ প্রভৃতি অশুভ ব্যাপারের নিদর্শন বলিয়া মনে করে।"

এ স্থানের বাহ্য দৃশ্য বর্ষে বর্ষে অনেক ধর্ম্মাত্মা যাত্রীই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সুতরাং ইহার বাহ্য রমণীয়তা সম্বন্ধে অধিক বাগাড়ম্বর

নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিতে এ ক্ষেত্রের রমণীয়তা ও বিচিত্রতা আরও অধিক। মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিত্যপদার্থ পরম-পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালস্বরূপ, বিশালা নামে খ্যাত বদরীপুরীতে তাঁহার ত্রিলোকবিশ্রুত পবিত্র আশ্রম আছে। তথায় একটী উষ্ণতোয়বাহিনী, অপরটী স্নিগ্ধসলিলবাহিনী গঙ্গা আছে। সেই গঙ্গার সিকতা সকল সুবর্ণময়। মহাভাগ দেব ও ঋষিবৃন্দ যথায় নিত্য উপস্থিত হইয়া ভগবান্ নারায়ণকে নমস্কার করেন, যথায় পরমাত্মরূপী সনাতন বিষ্ণু সর্ব্বদা অবস্থান করেন, সমগ্র জগৎ, সমস্ত তীর্থ ও আয়তন তথায় অবস্থিত জানিবে।*

স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী সংবাদে বদরীমাহাত্ম্য সবিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অরুন্ধতীর প্রশ্নক্রমে বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, এই বদরীনারায়ণক্ষেত্র স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও শুদ্ধ এই চারিভাগে বিভক্ত। ইহা বিস্তারে যোজনত্রয় ও দৈর্ঘ্যে দ্বাদশযোজনব্যাপক। এই স্থান মহৈশ্বর্য্যদায়ক ও পাপী লোকের অগম্য। ঘোর কলিযুগে তাঁহারাই ধন্য,

* যঃ স ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ ভরতর্ষভ।
নারায়ণঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ ।২৪।
তস্যাতিযশসঃ পুণ্যাং বিশালাং বদরীমনু।
আশ্রমঃ খ্যায়তে পুণ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ।২৫।
উষ্ণতোয়বহা গঙ্গা শীততোয়বহাপরা।
সুবর্ণসিকতা রাজন্ বিশালাং বদরীমনু ।২৬।
ঋষয়ো যত্র দেবাশ্চ মহাভাগা মহৌজসঃ।
প্রাপ্য নিত্যং নমস্যন্তি দেবং নারায়ণং বিভুম্ ।২৭।
যত্র নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
তত্র কৃৎস্নং জগৎ সর্ব্বং তীর্থান্যায়তনানি চ॥

বঙ্গবাসীর প্রকাশিত মূল মহাভারত, বনপর্ব্ব।

যাঁহারা বদরীক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন। কেন না, নানা তীর্থে বিরাজিত ঐ রমণীয় স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতাও বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ হইয়া বাস করেন। উক্ত ক্ষেত্রে আসিয়া যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারাও বিষ্ণুরূপধারী হইয়া যান। অধিক কি, ঐ ক্ষেত্রে যে যে পর্ব্বত আছে, দেবতা ও মুনিগণই ঐ সকল পর্ব্বত-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া তথায় তপস্যা করিতেছেন। এ ক্ষেত্রের এতদুর প্রভাব যে যাঁহারা মনে মনেও বিশালা বদরী বলিয়া স্মরণ করেন, তাঁহারাও উক্ত ক্ষেত্রবাসী বলিয়া গণনীয় হন এবং মরণান্তে মুক্তিপ্রাপ্ত হন। উক্ত ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত বদরীনাথের মূর্ত্তি মনে মনে ধ্যান করিলেও তাহাতেই তীব্র তপস্যা করার ফল ও সমগ্র ভূমি দানের ফল প্রাপ্তি হয়। ফলতঃ কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, গয়া, প্রয়াগ, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র কি অন্যান্য তীর্থও বদরীপুরীর ন্যায় কলিকলুষনাশিনী নহে। অতএব যতদিন দেহে প্রাণ আছে, ইন্দ্রিয়সকল অবিকল আছে, গাত্র শৈথিল্য প্রাপ্ত না হইয়াছে, তাবৎ বদরীক্ষেত্রে গমন করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে। তথায় গমন করিয়া চরণের সফলতা ও নারায়ণ দর্শন করিয়া নয়নের সফলতা লাভ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

চতুর্দ্ধেদং সমাখ্যাতং ক্ষেত্রং পরমপাবনং।
স্থূলং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং শুদ্ধং চেতি প্রকীর্ত্তিতং।
যোজনত্রয়বিস্তারং দীর্ঘং দ্বাদশযোজনং।
অগম্যং পাপিনাং তদ্বৈ মহদৈশ্বর্য্যদায়কং।
ধন্যাঃ কলিযুগে ঘোরে যে নরা বদরীংগতাঃ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা হরিভক্তিরতাঃ প্রিয়ে।
নিবসন্তি স্থলে রম্যে নানাতীর্থবিরাজিতে॥
যে তত্র বাসিনো লোকা বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলে।
বিষ্ণু রূপধরাঃ সর্ব্বে ভবন্তি বরবর্ণিনি॥
যে যে বৈ পর্ব্বতাস্তত্র তৎস্বরূপেণ দেবতাঃ।

তপস্যন্তি মহাত্মানস্তথা মুনিজনাঃ প্রিয়ে।
মনসাপি স্মরেয়ুর্যে বিশালা বদরীতি চ।
তেঽপি তদ্বাসিনো জ্ঞেয়া মৃতা মুক্তিমবাপ্নুয়ুঃ।
বদরীনাথমূর্ত্তিং বৈ মনসাপি স্মরেত্তু যঃ।
তেন তপ্তং তপস্তীব্রং দত্তা তেন ধরাখিলা।
ন কাশী ন তথা কাঞ্চী, মথুরা ন নবা গয়া।
প্রয়াগশ্চ তথাযোধ্যা নাবন্তী কুরুজাঙ্গলং।
অন্যান্যপি চ তীর্থানি যথাসৌ কলিনাশিনী।
যাবৎ প্রাণাঃ শরীরেঽস্মিন্ যাবদিন্দ্রিয়শুদ্ধতা।
গাত্রাণি যাবচ্ছ্লথিলাং নাপ্নবন্তি মহাত্মভিঃ।
বদরীগমনে তাবদ্ বিলম্বো ন বিধেয়কঃ।
চরণানাঞ্চ সাফল্যং কুর্য্যাদ্ বদরিকাগমাৎ।
নেত্রয়োশ্চৈব সাফল্যং কুর্য্যাদ্ বিষ্ণোশ্চ দর্শনাৎ॥

কেদারখণ্ড।

স্থানান্তরে উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, ব্যাসদেব এই স্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিস্তীর্ণ মহাভারতগ্রন্থ রচনা করেন। রাজা জনমেজয় ভবিতব্যতা-বশে অষ্টাদশ ব্রহ্মহত্যা করিয়া এই স্থানে আসিয়া উক্ত মহাভারত শ্রবণে ও বদরীক্ষেত্রের মাহাত্ম্যে ঐ ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।*

স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে,—

কৈলাসে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে গন্ধমাদনপর্ব্বতে। বদরীবনমধ্যে বৈ বদরী-নায়কো হরিঃ। দৃষ্ট্বা যং ব্রহ্মহত্যাভির্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।

---

* ইতি তে কথিতং শুভ্রু ভবিতব্যস্য বৈভবং।
জনমেজয়স্য চ যথা ব্রহ্মহত্যা বভূব হ।
বদর্য্যাশ্রমমাহাত্ম্যাৎ তথা ভারতসংশ্রবাৎ।
রাজাসৌ কল্মষৈর্হীনো বভূব বরবর্ণিনি॥

কেদারখণ্ড।

অর্থাৎ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাস ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরে বদরীবন মধ্যে যে বদরীনারায়ণ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হরিদ্বার হইতে বদরীনাথ পর্য্যন্ত এই সুবিস্তৃত শত শত নদনদী, নির্ঝর, পর্ব্বত, অরণ্যময় পবিত্র ভূমিখণ্ড কেদারখণ্ড নামে শাস্ত্রে উল্লিখিত। ইহা যে কত যোগী, ঋষি, রাজর্ষি ও ভক্ত সাধক সমূহের সাধনাক্ষেত্র, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। নর-নারায়ণের ইহাই তপঃস্থলী, মহর্ষি বেদব্যাসের ইহাই ভারতাদি প্রণয়ন স্থান, পুরূরবা, পাণ্ডু প্রভৃতির ইহাই সাধনাস্থান, পাণ্ডবদিগের ইহাই মহাপ্রস্থানের স্থান, উদ্ধব-নারদাদি ভগবদ্-ভক্তগণের ইহাই নিত্য সমাগম স্থান এবং ভগবান্ নারায়ণের ইহাই নিত্য অধিষ্ঠান স্থান। বহু শাস্ত্রগ্রন্থে বহু প্রকারে ইহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সামান্য লেখনীমুখে আমি তাহা কি ব্যক্ত করিব?

সাধুদিগের মুখে মুখে এক প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে আত্ম-বিস্মৃত ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র পাপক্ষালন মানসে এই উত্তরাখণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন। লঙ্কাধিপতি দশাননকে সম্মুখ-সমরে নিহত করিলেও উক্ত লঙ্কানাথ ব্রহ্মবীর্য্য-সম্ভূত বলিয়া, আপনাকে ব্রহ্মহত্যাপাতক-স্পৃষ্ট বোধে তাঁহার অনুশোচনা হয়। তন্নিমিত্ত বা লোক-শিক্ষা নিমিত্ত ভ্রাতৃ-গণসহ তাঁহার এই পবিত্রতীর্থে আগমন হইয়াছিল। লছমন-ঝোলা এই জন্যই লক্ষ্মণের নামাঙ্কিত হইয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। উহার অদূরে লক্ষ্মণের একটী মন্দিরও অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। হৃষীকেশে গঙ্গাসমীপে রাম-জানকীর সুন্দর মন্দির আছে, ভরতেরও একটী বিশাল মন্দির বর্ত্তমান আছে। দেবপ্রয়াগেও প্রাচীন মন্দির মধ্যে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণে এ সকল কথার উল্লেখ না করিলেও চিরাগত জনশ্রুতি ও উক্ত নিদর্শনসকল আলোচনা করিয়া সাধুদিগের উক্ত প্রবাদকে আমরা অলীক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না।

বসুধারা।

বদরীনারায়ণ হইতে যাত্রীরা বসুধারা গিয়া থাকেন। আমার শারীরিক একটু অসুস্থতা বোধ হওয়ায় আমাদের কাহারও তথায় যাওয়া হয় নাই। যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মুখে সকল কথা শুনিতে পাইলাম। উৎসব নামক ধর্ম্মব্যাখ্যাময় ১খানি সুন্দর মাসিক পত্রের কোন লেখিকাও উক্ত স্থানে গিয়াছিলেন। তিনিও ভ্রমণান্তে উক্ত পত্রে ঐ তীর্থবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। আমি এস্থানে তাঁহার লেখাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তিনি লিখিয়াছেন "পরদিন প্রাতে বদরীনারায়ণ হইতে ৬ মাইল দূরে বসুধারা দেখিতে যাইলাম। এখান হইতে নানাগ্রাম অবধি বেশ পথ। তাহার পর যে কি রাস্তা তাহা মুখে বলা যায় না, প্রাণের আশা ছাড়িয়া যাইতে হয়। এই পথে ইন্দ্র-ধারা অর্থাৎ খুব উচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে বরফ গলিয়া জল পড়িতেছে। এই জলের উপর দিয়াই যাইতে হয়। পরে গণেশ গুহা। ব্যাস-পুস্তক অর্থাৎ একটা পাহাড় থাক থাক বলিয়া বোধ হয়। আকাশে মেঘ উঠিলে যেমন কল্পনা-বলে কেহ হয়, কেহ হস্তী দেখে, এ পাহাড়ও সেইরূপ। এই স্থান হইতে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করেন। কোন্ পর্ব্বতে কে পড়িল, তাহা ত কিছু দেখাইল না। এ সব না জানিলে বৃথা পরিশ্রম মাত্র। শুধু দেখিলাম একটী পাহাড় সেতুর মতন পড়িয়া রহিয়াছে। প্রবাদ, ভীমসেন কর্ত্তৃক পাহাড় এই অবস্থায় আসিয়াছে। এই সেতুর নিকট সরস্বতীর জল অতি প্রবলবেগে পর্ব্বত ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। এই জল নাকি ভুটান হইতে আসিতেছে। এ যে কত সুন্দর তাহা বর্ণনা করা যায় না। এ পথের মত দুর্জ্জয় পথ পূর্ব্বে দেখি নাই। খানিকটা পথ এক এক পা করিয়া যাইতে হয়। এখানে লাঠিও চলে না, কারণ রাখিবার স্থান

নাই। ধরিবারও কোন উপায় নাই। নীচে গঙ্গা, ধীরে ধীরে তথায় নামিয়া বরফের উপর উঠিলাম। পা দিলাম, কতকটা বরফ ধসিয়া যাইল। বরফ ধরিতে যাইব, আবার ধসিয়া যাইল। আমি জলে পড়িয়া গেলাম। জল এখানে অল্প হইলেও কতকটা কাপড় ভিজিয়া গেল। এইরূপে বহুকষ্টে বসুধারায় পহুঁছিলাম। পাহাড়ের উচ্চ শিখর হইতে দুইটী ধারা পড়িতেছে। আকাশে হাউই ছুড়িলে তাহা যেমন হেলিতে দুলিতে আইসে, এ ধারার জলও সেইরূপে আসিতেছে। দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু তখন দেখিবার ক্ষমতা থাকে না। এই জলের ছিটা বহু উচ্চ হইতে গায়ে আসিয়া লাগে। উহার নিকটে যাইলে ত স্নান করাইয়া দেয়। আরও কতকটা উচ্চে উঠিতে হয়, আমি উহার নিকটে যাই নাই। শুনিতে পাই, এইস্থানে পাপপুণ্যের পরীক্ষা হয়। কিন্তু কে পাপী, কে পুণ্যবান্, তাহা ত বুঝিলাম না। জল সকলের গায়েই পড়িল। আবার ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম। এইখানে মাতামূর্ত্তি আছে, তাহা আর দেখা হয় নাই। দূর হইতেই দর্শন করা গেল। আবার উঁচুনীচু পাহাড় ও বরফ এবং ছোট ছোট সেতু পার হইয়া বৈকালে মৃতকল্প হইয়া বাসায় আসিলাম।”

—o—
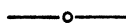
সহস্রধারা ও সত্যপথ।

মানাগ্রাম বা মনিভদ্র পুরীর সমীপে অলকনন্দার যে পুল আছে, তাহার কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে মাতা-দেবীর মন্দির। পুলের বাম দিক্ দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, ঐ রাস্তার মধ্যে সহস্রধারা, চক্রতীর্থ প্রভৃতি তীর্থ আছে। আরও কিছুদূর অগ্রে অর্থাৎ মাতা-মূর্ত্তি হইতে ১২ মাইল দূরে সত্যপথ নামে তীর্থ। ঐ তীর্থে যাইবার পথ বা তাহার অগ্রের পথ, সমস্তই তুষার-ভারে আবৃত। কিন্তু স্থান অতি রমণীয়, যিনি একবার দেখিয়াছেন,

জন্মে আর তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। উক্ত সত্য-পথে একটী ত্রিকোণ সরোবর আছে। উহার কোণত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের নামে খ্যাত। উহাতে স্নান করিলে জীবের আর জঠর-বাসের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ইহার পরই বিচিত্র-বর্ণ তুষারের স্তূপ ও মন্দির দৃষ্টি-গোচর হয়। ঐ অগম্য, অথচ অতিরম্য পথ স্বর্গারোহণ-পথ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে অষ্টাদশ ব্রহ্মহত্যা-জনিত ভীষণ মহাপাপে লিপ্ত রাজা জনমেজয় উল্লিখিত "ব্যাসপুস্তক" পার্শ্বেই প্রায়োপবেশন পূর্ব্বক পঞ্চরাত্র নিরাহার করিয়া ব্যাসদেবের দর্শন প্রাপ্ত হন ও পাপক্ষয় মানসে কৃপাময় মহর্ষির মুখে মহাভারত শ্রবণ করেন। ভারত-শ্রবণ ও বদরীক্ষেত্র-মাহাত্ম্যবশতঃ রাজার উক্ত পাপ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যথা—

তত্র গত্বা মহাভাগে চক্রে প্রায়োপ বেশনং।
ব্যাসপুস্তকপার্শ্বেতু পঞ্চরাত্রং মহীপতিঃ।
নিরাহারো নিরানন্দো মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ।
ব্যাসং দদর্শ নৃপতি র্জটামণ্ডলধারিণং।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাসৌ পরিক্রম্য পুনঃ পুনঃ।
উবাচ বচনং ত্রস্তো রক্ষরক্ষেতি চাসকৃৎ। ইত্যাদি

কেদারখণ্ড।

—o—

বদরিকাশ্রম হইতে বিদায়।

বিদায়ের দিন উপস্থিত। সকাল সকাল তপ্তকুণ্ডে স্নান সারিয়া নারায়ণের মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। ভাগ্যক্রমে তখন যাত্রীর তত ভিড় হয় নাই, অক্লেশে দর্শন পাইলাম। কিন্তু এই শেষ দর্শন বলিয়া মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল। কাতর হইয়া পূজা দিলাম, কাতর হইয়াই নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিলাম। হায়, কত কায়ক্লেশে এই দর্শন মিলিয়াছে, আজ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি! এত কালের আশা কি

এই অল্প সময়ে মিটে ? স্তব, স্তুতি, ধ্যান, ধারণা ত কিছুই হইল না! তথাপি সেই সময়ের মত, ব্যাকুল প্রাণের ২।৪টী কথা তাঁহার পাদপদ্মে শেষ নিবেদন করিলাম। কত দিনের অনুশীলিত, কিন্তু গত-রাত্রিতে-মাত্র পরিসমাপ্ত সঙ্গীতময় সেই মর্ম্মকথা কয়েকটী এই—

তব চরণ-ধূলি ধরি' মৌলিমণি-মাঝে।
রাজে পরম ধামে, মুনি-মনুজ-দনুজ-সুর-সিদ্ধসমাজে॥
স্তুতি-মিনতি-প্রণতি, প্রভু, ভকতি-রতি-প্রীতি,
সুগতি-সোপান তব ধ্যান আর জ্ঞান,
প্রাণ মন দান তব চরণে অব্যাজে॥
যুগে যুগে জগত-জীব-অশুভভয়বারী,
ভূরি অবতার ধরি' করুণা বিথারি'
প্রেম-ভিখারী, প্রেম প্রচারি পুনঃ পতিত-উদ্ধারী;
আনন্দ-ঘন, পরমাত্ম-পরব্রহ্ম,
ত্রাহি ভবনাথ ভব-ভীত জন যাচে॥*

হায়, এই ভাব যদি সর্ব্বদা স্থায়ী হইত, চিত্তে পাষাণ-অঙ্কণে অঙ্কিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে তাহা কত সুখের বিষয়ই হইত! কত ধনোন্মাদ, কত যৌবনোন্মাদ, কত স্বার্থ-সর্ব্বস্বভাব, হিংস্রপশূচিত নির্দ্দয় নৃশংসভাব তাহা হইলে কমিয়া যাইত! কিন্তু দুর্দ্দম রিপুবর্গের উদ্দাম উত্তেজনায় তাহা হইতে পায় না। দেবস্থানের মাহাত্ম্যে, সৎসঙ্গমাহাত্ম্যে, সাধু অধ্যবসায়ের মাহাত্ম্যে যত দিন ব্যাপিয়া যাহা হইল, তাহাই পরম লাভ। এখন আমাদের বিদায়ের পালা, বিদায়ের কথাই মনে পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু চির-বিদায়ের কথা, কই কিছুই ত মনে জাগিল না! জাগিবারই কিন্তু কথা! তাহারই জন্ত এ দীর্ঘযাত্রার প্রয়োজন, অথচ সে জাগরণ হয় না। যথায় যাই, তথাকার উদ্দেশ্য পূর্ণ

* কানাড়া-ঝাঁপতালে ইহা গেয়।

হইলেই ঘর-সংসারের কথা, আর ঘরে ফিরিবার কথা, আর তাহার জন্ত কি ব্যস্ততা! বাহবা-বাহবা! দুদিনের জন্ত কি ঘর-সংসারই আমরা পাতাইয়াছি! যেন চিরদিনের জন্ত এই ঘর-সংসার! এই সংসার শূন্ত করিয়া যে অন্যত্র যাইতে হইবে; দুদিন, দুবৎসর, দুই যুগ, কি এই মুহূর্ত্তেই যাইতে হইবে, কই তাহার জন্ত ত কোন ব্যস্ততা নাই, কখন কোন উদ্‌যোগ নাই! হরি হরি, কি মায়া-মোহই আমাদিগকে দৃঢ় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! আমরা কি ইহলোক-সর্ব্বস্বই হইয়াছি! আমরা বাহ্য ঐশ্বর্য্য, গৃহ-দেহাদি বাহ্য বস্তুর সাজ-সজ্জা-সমুন্নতির জন্তই ব্যস্ত; অন্তরৈশ্বর্য্য, আন্তরিক উন্নতি, অন্তর্গৃহের সজ্জা-সংশোধন, এ সকল দিকে কই সে সযত্ন দৃষ্টি বা সমুচিত প্রয়াস, কিছুই ত নাই? আমরা যে বিদ্বান্ বিচক্ষণ হইতেছি ও হইয়াছি বলিয়া আপনাকে ধন্ত মনে করিতেছি, আমাদের সেই বিদ্যাবত্তা ও বিচক্ষণতার কি এই পরিণাম? ভাই, মহাজনবাক্য মনে কর, শিষ্টের শিক্ষা স্মরণ কর—

যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী!

অর্থাৎ ইহলোকেও সুখী হইতে পারিবে, পরলোকেও সুখী হইতে পারিবে, যদি এমনি পথে চলিতে পার, তাহার নামই ত চাতুরী, আর তাহা হইলেই ত তোমার বুদ্ধির বলিহারি! সাধকের উক্তি আছে—

জনকরাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি;
সে যে, এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেতে পেত দুধের বাটী।

তাই বলি, সময়ে ঘর-সংসারের চিন্তা আমরা যেন একটু খর্ব্ব করি। কিন্তু বলিতে বলিতে যেন অধিক বলা হইয়া গেল। পাঠকের বিরক্তি আশঙ্কা করিতেছি। এক্ষণে বিদায়ের কথাই পাড়ি।

আমাদের বিদায় ত অতি সহজই কথা; চলিয়া যাইলেই হইল। কেহ থাকিতে বলিবারও নাই, বসিতে বলিবারও নাই। কঠিন সমস্যা পাণ্ডা বিদায়ের কথা লইয়া। তাহার জন্তই ভাবনা। এই ভাবনা আগে হইতেই

উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের কিছুদিনের সহযাত্রী, অথচ আমাদের কিছু পূর্ব্বে এখানে আগত অমরাবতী-নিবাসী একদল মহারাষ্ট্রীয় তীর্থ-যাত্রী, তাঁহাদের দলে ৪০ জন লোক ছিল, তাঁহারা একত্র অনেকগুলি টাকা একবারে সুফলের সময় দিলেও পাণ্ডাজী রাগ করিয়া তাহা ফেলিয়া দেন। তাহাতে তাঁহারা বড় বিব্রত ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, তাই যাইবার সময় আমাদের সহ পথে সাক্ষাৎকার হওয়ায় আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে আপনারা কোন পাণ্ডার বাটীতে না উঠিয়া ধর্ম্ম-শালাতেই উঠিবেন। তদনুসারে আমরা এখানে পঁহুছিয়া সেইরূপ চেষ্টাই করিয়াছিলাম, তাহা পাঠক অবগত আছেন; কিন্তু সে চেষ্টায় যে কোন ফল হয় নাই, পাণ্ডাঠাকুরের শিষ্টতা ও সমবেদনার আধিক্যে যে আমাদের সকল চেষ্টাই ফাঁসিয়া গিয়াছিল, শেষে পাণ্ডাজীর বাটীতে উঠিয়া এ কয়েক দিন থাকিতে হইয়াছে, তাহাও পাঠক অবগত হইয়াছেন। এ কয়েক দিন পাণ্ডাজী আমাদের যত্নও বিলক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে কিরূপে তাহার প্রতিদান হইতে পারে, তাহা লইয়া বিতর্ক বিবেচনার সময় উপস্থিত। আমি বিতর্ক বিবেচনা বলিয়া লিখিতেছি, কিন্তু পাণ্ডাজীর ইহাতে বিতর্ক বা বিবেচনার কথা কিছু নাই। আবদারের মত কথাও তাঁহার নহে। তিনি সুফলের সময় স্থিরচিত্তে স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বলিলেন, কড়ায় গণ্ডায় ন্যায্য পাওনা আদায়ের মত স্বরে কহিলেন, তোমরা আমার একটী মোকান করিয়া দাও; হাতী, ঘোড়া, শয্যা, পালঙ্ক, শাল-দোশালা দাও; তদ্ভিন্ন নগদ যাহা দিবে বিবেচনা করিয়া দাও। এ সকল ন্যায্য দেয়। তোমাদেরই ইহাতে পুণ্য অথচ আমার তাহা অবশ্য প্রাপ্য। তোমরা যাহা দিবে, সম্বৎসর আমরা তাহাই খাইব। এ সকল না দিলে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতেছি না। আমরা সন্তুষ্ট হইলেই তোমাদিগকে এই তীর্থ যাত্রার যথার্থ সুফল দিব। এত কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক এই মহাতীর্থে আসিয়া

অন্নের জন্য সমস্ত পণ্ড করিবে কেন? তাহা কেহই করে না। এই দেখ অমুক আমাকে এত দিয়াছে, অমুক এত দিয়াছে, ইত্যাদি। এ সকল কথার উত্তর করিয়া পাণ্ডাজীকে বুঝাইবার যো নাই, বুঝিতে তাঁহারা শিখেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে ইহা তাঁহাদের আখ-মাড়ার ন্যায় ব্যবসায়। যত্ন করিয়া আখগুলি গুছাইয়া লইয়া একবার কলে পুরিতে পারিলেই হইল, তাহার পর যতই পীড়ন করিতে পারিবে, ততই রস! পূর্ণ রস আদায় করিতে হইলে ঐরূপ করিতেই হইবে, দয়া মায়ায় সে কার্য্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হয় না। তার পর রস নিঃশেষ হইলেই সম্বন্ধ চুকিয়া গেল, আর তাহার কোনরূপ খোঁজখবর লইবার প্রয়োজন থাকে না। এ অবস্থায় তাঁহার নিকটে আমাদের বিনয়বাক্যে, যুক্তি-প্রয়োগে, কি বাক্‌পটুতায় কোন্ কাজ হইবে? আমরা পাণ্ডাজীর প্রার্থিত এই সর্ব্বস্ব-দক্ষিণায় সুফল ক্রয় করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত ও অসমর্থ হইলেও তাহা তেমন করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না। স্ত্রীলোকেরা ত পারিবেনই না। কেন না, তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার আছে যে পাণ্ডাজী সুফল না দিলে তীর্থযাত্রা সফল হয় না, তাহার উপর তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও যত্নে কয়েক দিন থাকিতে হইয়াছে। এ ধর্ম্ম-সম্বলিত উপকারের ঋণ তিনি জোর করিয়া শোধ করাইবেন কি, আমরাই তাহা জোর করিয়া শোধ করিতে বাধ্য। সুতরাং যথাশক্তি বিরক্তি সম্বরণপূর্ব্বক ক্রমে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দক্ষিণার মাত্রা চড়াইয়া পাণ্ডাজীর অসম্মতিতেও কতক টাকা তাঁহাকে গতাইলাম। নিজের বিরক্তি প্রকাশের এ ক্ষেত্র নহে। প্রত্যেক তীর্থেই সুফল ভোগের জন্য এ কটু-তিক্ত কর্ম্মভোগ অভ্যাস করিতে হয়। হায়, একটু সংযমের অভাবে এ মধুর সম্বন্ধ কি তিক্তভাবে পরিণত হইয়াছে! আরও দুঃখের বিষয়, এইরূপ অপ্রিয় পরিণাম বাঙ্গালী যাত্রীর সম্বন্ধেই প্রবল, হিন্দুস্থানী প্রভৃতির সম্বন্ধে সেরূপ নহে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বাঙ্গালী জাতির স্বভাবই সর্ব্বাগ্রে আমার চক্ষে পড়ে। বাঙ্গালীর অন্তঃকরণ কিছু উদার ও নজরও কিছু দরাজ। সর্ব্বদা সাধারণ ভিক্ষুককে কিছু দিতে হইলে বাঙ্গালী যেমন দেয়, অন্য জাতি তেমন দেয় না। ভিখারীর কাতর উক্তি বাঙ্গালীর যেমন কাণে বাজে, অন্যের বোধ হয় ততদূর নহে। তা ছাড়া, অন্যে যেখানে ১৲ টাকা দেয়, বাঙ্গালী হয় ত সেখানে ১০৲ টাকা দিবে। বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা যে ইহার কারণ, তাহা নহে; পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, বাঙ্গালীর স্বভাব বা অন্তঃকরণই ইহার কারণ। আবার বাঙ্গালীর সঞ্চয়শীলতা খুব কম। তেমনি বাঙ্গালীর মধ্যে বড় ধনীও কম। সুতরাং অন্যদেশীয় ধনী লোকেরা যেমন বড় বড় বদান্যতার কাজ করিতে পারেন, বাঙ্গালীর মধ্যে তাহার পরিচয়ও খুব কম। বাঙ্গালী ১৲ টাকার স্থলে ১০৲ টাকা দিতে পারে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু দুহাজার দশহাজারের কেহ নয়। দুর্গম পার্ব্বত্য পথে কথায় কথায় যেখানে-সেখানে দশ বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে বড় বড় ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, সেতু প্রভৃতির ব্যবস্থায় বাঙ্গালী কয়জন আছেন? বোধ হয় কেহই নাই। পক্ষান্তরে নিত্য ব্যয়ে, ক্ষুদ্র দান-খয়রাতে যে-সে বাঙ্গালী সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। ইহা ভিন্ন, বেশ-ভূষায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় প্রত্যেক বাঙ্গালী যেন এক একটী বাবু, অন্যদেশে সেরূপ সাজেগোজে থাকায় যেন জমিদারি থাকা দরকার হয়। বাঙ্গালী-সাধারণের এইরূপ ব্যবহারে ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে বাঙ্গালী মাত্রকেই ধনী বলিয়া লোকে ভ্রম করে। বিশেষতঃ ভিন্নদেশীয় তীর্থের পাণ্ডারা বাঙ্গালী দেখিলেই পাইয়া বসে, যেন প্রত্যেক বাঙ্গালীই এক-একটী রাজা মহারাজ আসিয়াছেন। ইহার পরিণামে দাতা গৃহীতা উভয় পক্ষেরই অসন্তোষ ভোগ, যাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

অদ্য পাণ্ডাজীর বা তাঁহার ভৃত্যের আমাদের সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবরই নাই, যেন কে কাহার বাড়ীতে রহিয়াছে! জলের ঘড়া প্রভৃতি

আজি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেগুলি অলক্ষিতে আজ অন্য যাত্রীর কাছে চলিয়া গিয়াছে। লাড্ডু প্রভৃতি প্রসাদ আজ আসিলই না। কথাবার্ত্তা কহিতেও যেন পাণ্ডাজীর অদ্য অবকাশ নাই, অন্য যাত্রীর জন্য তিনি আজ এমনি ব্যস্ত। আমরা আমোদ দেখিতে লাগিলাম, পাঁচ রকম দেখাতেই না আমোদ! পরদিন বিনা-বাক্যব্যয়েই পাণ্ডাজীর নিকট চিরবিদায়-গ্রহণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তার পর আমরা যেমন রওনা হইলাম, পাণ্ডাজীও তেমনি নূতন যাত্রীর সন্ধানে সেই একই পথে এক সঙ্গে বাহির হইলেন, তথাপি আমাদের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তার কোন সূচনা উপস্থিত হইল না।

—o—

শ্যামাচটী।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ।

অদ্য আমরা মধ্যাহ্নে বদরিকাশ্রম হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী লামবগড় নামক চটীতে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নের ব্যাপার সম্পন্ন করিলাম। নারায়ণ-দর্শনের শুভাদৃষ্ট যতটুকু যাহা ছিল, একরূপ সম্পন্ন হইয়াছে, এখন আর অনর্থক পথে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি? মধ্যাহ্নের পর আবার পথ-বাহন করিতে করিতে অপরাহ্নে পাণ্ডুকেশ্বরে পঁহুছা গেল। ফিরিবার সময় যাত্রীদের পায়ের শক্তি এইরূপ যেন বাড়িয়াই থাকে।

পর দিন ২৭শে জ্যৈষ্ঠ। পাণ্ডুকেশ্বর হইতে অদ্য বিষ্ণুপ্রয়াগ উত্তীর্ণ হইয়া বামদিকের যোশীমঠের রাস্তা ত্যাগ করিয়া ডানহাতি নদীর ধারের রাস্তা অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রমাগত চড়াই-পথে উঠিতে উঠিতে মধ্যাহ্নে শ্যামাচটী প্রাপ্ত হইলাম। একটু বাঁকের উপর এই চটী। চটীর স্থান-টুকু বেশ সমতল। দুইধারে দোকান, মাঝ দিয়া রাস্তা। চটীর প্রান্ত-ভাগে সমতলেই একটী স্থূলধার ঝরণা। সকল দোকানই যাত্রিপূর্ণ।

দেখিয়া দেখিয়া মন্দ'র ভাল হইবে বিবেচনায় দ্বিতীয় দোকানখানিতে আমরা আশ্রয় লইলাম। একটী দ্রাবিড়-অঞ্চলের ধনী যাত্রী তথায় অনেকটা স্থান অধিকার করিয়া আছেন দেখিলাম। তাঁহারা পতি-পত্নী একযোগে তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছেন। উভয়ের ঝাম্পান-বাহী লোকও অনেকগুলি। কিন্তু ততগুলি লোকেও সে স্থান তেমন গুলজার হয় নাই, যেমন তাহাদের মালিক সেই পতি-পত্নীযুগলে হইয়াছে! তাঁহাদের কি মণি-কাঞ্চন যোগ! পত্নীও যেমন মুখরা, পতিও সেইরূপ মুখর। সহজ কথা কহিতে তাঁহারা যেন ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে আবার তাঁহাদের একবাক্যতা, ঐকমত্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও নাই, তাহা অল্পক্ষণেই বেশ বুঝা গেল। তাহার উপর, উভয়ের কি হাঁক-ডাক হুকুম! সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও তেমনি বিকট কড়মড়ানি! ইতিমধ্যে আর এক বিপদ্ উপস্থিত,—ঝাম্পান-বাহকদিগের সহিত তাহাদের পাওনার হিসাব লইয়া তাঁহাদের বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। চীৎকার-কোলাহলে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত আর কি! কাণ ঝালা-পালা হইয়া যাইতে লাগিল, বিরক্তির ত সীমাই নাই। উভয়পক্ষের ভাষাও যে উভয়পক্ষ ভাল বুঝিতেছেন না, তাহাও বেশ বুঝা গেল। এই অপূর্ব্ব বাগ্‌যুদ্ধে এবং তাহার সহিত বিপুল মুখভঙ্গি ও হস্তভঙ্গিতে মধ্যে মধ্যে আমোদও বিলক্ষণ বোধ হইতে লাগিল! কিন্তু অধিকক্ষণ আমরা এ আমোদ উপভোগ করিতে পাইলাম না, আর একটা অপ্রীতিকর ঘটনায় ইহা চাপা পড়িয়া গেল। সে ঘটনাটী এই,—

অযোধ্যা-অঞ্চলের একটী অতি শান্তপ্রকৃতি সরল-চিত্ত সাধু আমাদের এই দোকানেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। দোকানদার এই সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি লইবেন? সাধু কহিলেন, আমার এক্ষণে কিছুই লইবার প্রয়োজন নাই। দোকানদার কহিল, তবে তুমি এখান হইতে উঠ। আমরা দোকানদারকে বারণ করিয়া কহিলাম, কর কি?

সাধুলোকের সহিত কি এইরূপ ব্যবহার করিতে আছে? দোকানদার কহিল, হাঁ, সাধুকে নিশ্চয়ই উঠিতে হইবে, ঐ স্থানে আমার আর একটা যাত্রী বসিবে, আমি এখানে ত ধর্ম্মশালা খুলি নাই? তার পর সাধুর দিকে তর্জ্জন করিয়া কহিল, অ্যায়্ সাধু, তুমি জল্‌দি এখান হইতে বাহির হও। আমরা কহিলাম, রাম-রাম! এখানে কোন আশ্রয় বা ধর্ম্মশালা নাই, উনি এখন কোথায় যাইবেন? হিন্দু হইয়া তোমার এ কিরূপ ব্যবহার? দোকানদার কহিল, বহুত আচ্ছা বাবু, আপনাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আমি ডাকি নাই, আপনারা আপন আপন কর্ম্ম করুন। সাধু অবিলম্বে উঠিয়া আমাদিগকে কহিলেন, বৎসগণ, তোমরা ক্ষুব্ধ হইয়ো না, দোকানদার ভাল কথাই কহিয়াছে। আমার এই স্থান-টুকুতে উহার আর একটী যাত্রীর স্থান বস্তুতঃই হইতে পারিবে। আর আমাদের কথা কি জান? বৃক্ষমূলই আমাদের উপযুক্ত আশ্রয়, তাহাই প্রকৃত শান্তির স্থান। কিন্তু আমরা শান্তি অপেক্ষা সুখে অধিক অভ্যস্ত হইয়াছি। ইহা ত উচিত নহে, আমার ওঠাই ঠিক্। বলিয়া তিনি হাস্যমুখে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা এই দৃশ্যে বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। আমাদের পাক-শাক আরম্ভ হইয়াছিল, নতুবা আমরা নিশ্চয়ই সে নারকীর স্থান হইতে উঠিয়া যাইতাম। কিন্তু উঠিয়াই বা কোথায় যাইতাম? যেখানে যাইতাম, সেই স্থানই যে এইরূপ হৃদয়-হীন, মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত! তথাপি যতক্ষণ পরিচয় না হয়, ততক্ষণই শান্তি, ইহাই যাহা হউক।

গাছ-তলাই যে সাধুর পক্ষে উত্তম আশ্রয়, তাহা ত বুঝিলাম। কিন্তু হায়, এখানে যে সে-গাছতলাও নাই! কঠোর পার্ব্বত্য-পথ, কঠোর সময়! সাধু এই মধ্যাহ্নের রৌদ্রে, আমাদেরই মত ক্লান্তদেহে, হাসিতে হাসিতে সেই কঠোর পথে বাহির হইলেন।

আমরা মধ্যাহ্নের কার্য্য শেষ করিয়া এই স্মরণীয় শ্যামাচটী হইতে

রওনা হইলাম। পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের তীর্থযাত্রী নর-নারীই এখন আমাদের এ পথের সঙ্গী। অন্যেরা অন্য পথে গিয়াছেন। আমরা এক মাইল আন্দাজ চড়াই অতিক্রম করিয়া সুন্দর সিধা সড়ক প্রাপ্ত হইলাম। শুনিলাম, অতঃপর এইরূপ সড়কই বরাবর পাওয়া যাইবে। পার্শ্ববর্ত্তী গভীর খাতের দিকে পর্ব্বত-শূন্য নিম্নভূমি অনেকটা দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। বামধারে গোধনপূর্ণ কৃষকপল্লীও দুই একটী দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সড়ক রাস্তায় অশ্বারোহী লোকও দুই একটী দেখিতে পাইলাম। স্থানে স্থানে রাস্তার ধারে দুই চারিটা বড় বড় গাছও দেখা গেল।

অপরাহ্নে আমরা কুমার-চটী পঁহুছিলাম। পঁহুছিবার পূর্ব্বে পুল দিয়া নদী পার হইয়া ধারে ধারে যে খানিক আসিতে হইল, ঐ স্থানটা কি ভয়ানক ধ্বসিয়াই যাইতেছে! আমি দুই একজনের দৃষ্টান্তে দুঃসাহস পূর্ব্বক এই ধ্বংসোন্মুখ স্খলনশীল পথে আসিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যপথে নিজের উক্ত অবিমৃষ্যকারিতার জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। হাতের একটা ল্যাম্প একটু অসাবধানে হাত হইতে স্খলিত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে দূর রসাতলে অদৃশ্য হইল, একটু অসাবধানে আমারও ঐরূপ গতির সর্ব্বদা সম্ভাবনা! অন্যেরা কিন্তু একটু তফাৎ ও একটু উচ্চ দিয়া যে একটা ফেরের পথ হইয়াছে, তাহা দিয়া কিছু বিলম্বেই চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থাই ঠিক্ হইয়াছিল। অল্প সুবিধার জন্য এরূপ প্রাণসঙ্কট পথে পদার্পণ করা উচিত নহে।

——o——

কুমারচটী।

কুমার-চটী পঁহুছিয়া দেখিলাম, চটীরও সেইরূপ ভগ্নদশা। অর্থাৎ পূর্ব্বে এই চটীর নিম্নভাগ দিয়া যে রাস্তাটী ছিল, এক্ষণে উহা ধ্বসিয়া

পড়ায় উপর দিয়া নূতন রাস্তা হইয়াছে। ঐ নূতন রাস্তার দুই পার্শ্বে নূতন নূতন দোকান ও যাত্রিনিবাস হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী দোকান ও যাত্রিনিবাসগুলির ভগ্নদশা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু নূতন চটীতে যখন যাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান হয় না, তখন তাহাদিগকে এই চটীর পুরাতন অংশেই আসিয়া আশ্রয় লইতে হয়। অধিকন্তু উৎকৃষ্ট ঝরণাটী এই পুরাতন নিম্ন বসতিভাগেই বর্ত্তমান, বড় বড় দোকানগুলিরও অধিকাংশ উঠি-উঠি করিয়া উঠে নাই। সুতরাং পুরাতন ভাগের গৌরব এ ভগ্নাবস্থায়ও বর্ত্তমান। আমরা চটীর উপরের অংশ বা নূতন অংশ যাত্রীতে পরিপূর্ণ দেখিয়া নিম্নবর্ত্তী পুরাতন অংশেই একটা ঘরে আশ্রয় লইলাম। ঘরও যথেষ্ট, দ্রব্যাদির কোন অভাব নাই, উপরে ময়দানেরও বেশ সুবিধা আছে। মোটের উপর এ চটী উত্তম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

——o——

পিপুল-কুঠী।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ।

অদ্য মধ্যাহ্নে আমরা গরুড়-গঙ্গায় পঁহুছিলাম। চটীতে তৈল মিলিল না, নদীতে জলও স্বল্প, কিন্তু জলটুকু পরিষ্কার, সুশীতল। তাহাতেই সকল দোষ কাটিয়া গেল, রুক্ষ স্নানের জন্যও কষ্ট হইল না, অবগাহন-যোগ্য জল না থাকিলেও অতৃপ্তি হইল না। চটী অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু যাত্রী বিস্তর। বহুকষ্টে একটা ঘরের এক কোণে যে জায়গাটুকু মিলিল, তাহাতে পাক-ভোজন কোনরূপে নির্ব্বাহ হইল, কিন্তু বিশ্রামের কোন উপায় হইল না। অগত্যা সত্বরেই তথা হইতে রওনা হইতে হইল।

একটু কষ্ট করিয়া অপরাহ্নে পিপুল-কুঠী পঁহুছিলাম। পঁহুছিয়া কিন্তু সকল কষ্ট দূর হইল, পর্য্যাপ্ত স্থান পাওয়ায় হাত-পা ছড়াইয়া ত বাঁচিলাম।

কিন্তু শুধু তাহাই নহে, পিপুল-কুঠীর বাজার উৎকৃষ্ট, কোন জিনিষের অভাব নাই। অধিকন্তু চামর এখানে যথেষ্ট মিলে। বাজারের প্রান্তে সুন্দর একটী ঝরণা। বাজারের মধ্যেই পোষ্ট আপিস্। পোষ্টমাষ্টারটী এই অঞ্চলের লোক, লোকটী অতি ভদ্র ও সদালাপী। তাঁহার একটী দোকান আছে, সেই দোকানের অর্দ্ধাংশই ঐ পোষ্ট আপিস্। যাইবার সময় তাঁহার ঐ দোকানে দ্রব্যাদি লইতে গিয়াই তাঁহার সহিত আলাপ হইয়াছিল। এক্ষণে ফিরিবার সময় আমাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে দেখিয়া ভদ্রলোক কতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন! দেশের উন্নতির কথা, শিক্ষার কথা এবং তাহাতে বাঙ্গালীর অগ্রসরতার কথা, কত কথাই হইল! ভদ্র-লোকের সর্ব্বত্র সমান ভাব, পরিচয় হইলে আর স্বদেশী-বিদেশী ভেদ থাকে না। কথা-প্রসঙ্গে, তিনি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনদৃষ্টে কলিকাতা হইতে একটী ওয়াচ ঘড়ী আনাইয়া সম্পূর্ণরূপে ঠকিয়াছিলেন বলিয়া যে গল্প করিলেন, তাঁহার সে দুঃখমিশ্রিত হাস্যের সহিত সে গল্পটী আজিও আমার মনে আছে।

—o—

লালসাঙ্গা।
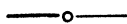
২৯শে জ্যৈষ্ঠ।

প্রচণ্ড বেগবতী অলকনন্দার উন্নত তটভাগ দিয়া একমনে আসিতে আসিতে ক্রমে তাহার নিম্ন তটভূমি প্রাপ্ত হইলাম। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে সেই নিম্নতটবর্ত্তী পথ কতই স্নিগ্ধ ও প্রিয়দর্শন বলিয়া বোধ হইল! আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, সম্মুখে সেই লালসাঙ্গার সুন্দর, সুদৃঢ় পুল। অবিলম্বে পুল পার হইয়া লালসাঙ্গায় বা চমৌলিতে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচা গেল। লালসাঙ্গা একটী উৎকৃষ্ট চটী। যাইবার সময় যথায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, আজিও এখানকার সেই দোকানটীর প্রশস্ত

দ্বিতলের বারান্দায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইলাম। একবার পরিচয় করিয়া সেখানে যেন আমাদের অধিকার স্থাপন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখন এই দ্বিতলে যে সকল যাত্রীর সহিত এক সঙ্গে ছিলাম, এখন তাঁহাদের কেহই নাই ; সে ক্ষণ-পরিচয় সেই সঙ্গেই বোধ হয় চির-সমাপ্ত হইয়াছে। এখন তাঁহাদের পরিবর্ত্তে কতকগুলি নূতন যাত্রী দেখিলাম। এই সকল যাত্রী আমাদের মত ফিরিতেছেন না, ইঁহারা যাইতেছেন। পান্থশালায় নিত্য ইহাই ঘটিতেছে। সংসারও এইরূপ একটা প্রকাণ্ড পান্থশালা। এইরূপ পুরাতনের স্থানে নূতন ও এইরূপ যাওয়া-আসা লইয়াই তাহার ব্যাপার। কিন্তু এখানকার মত কোন্ অলক্ষ্য কর্ম্ম-সেতুর যোগে নিরন্তর তথাকার ঐ যাওয়া-আসা চলে, কিছুই বুঝা যায় না।

যাইবার সময় আমরা আমাদের গঙ্গোত্তরীর গঙ্গাজলপূর্ণ পাত্রগুলি ও আপাদমস্তকব্যাপী আমার সেই দুর্ব্বহ বিলাতি পোষাকটী এখানকার একজন দোকানদারের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। এখন চাহিবামাত্র ঐগুলি ঠিক্ পূর্ব্বের অবস্থায় ফেরত পাইলাম। এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির নিকট এ সকল মূল্যবান্ বস্তু রাখিয়া যাওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না। কারণ ইহারা কোন অংশেই আমাদের পরিচিত নহে বা আমরাও কোন অংশে ইহাদের পরিচিত নহি। কিন্তু আমাদের বোঝাওয়ালা বালা আমাকে বুঝাইয়াছিল যে স্বচ্ছন্দে এগুলি রাখিয়া যাউন, কোন চিন্তা করিবেন না। এ আপনাদের মুলুক নহে। আমি অবস্থাগতিকে তাহার কথায় সম্মত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার মনের সন্দেহ দূর হয় নাই। এখন জিনিষগুলি ঠিক্‌ঠিক্ প্রাপ্ত হইয়া পাহাড়ী লোকদিগের এইরূপ বিশ্বস্ত ব্যবহারের পরিচয়ে বড়ই চমৎকৃত হইলাম। বস্তুতঃ এ অংশে এখানে সত্যযুগ এখনও বর্ত্তমান।

——০——

নন্দপ্রয়াগ।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার।

অদ্য লালসাঙ্গার দিকে অলকনন্দার ধারে ধারে নূতন পথ দিয়া চলিলাম। এক স্থানে একটী আমগাছ দেখিয়া ও তাহাতে অনেকগুলি আম হইতে দেখিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইল। ক্রমে লাউ-শশার গাছ ও বেলফুলের গাছও দেখা গেল। দুই মাইল পরেই কোয়ল-কুরেড নামে ক্ষুদ্র চটী, ১টী ঝরণা ও তাহার ধারে ২।৩ খানি দোকান দেখিতে পাইলাম। এখান হইতে ২॥০ মাইল পরে মঠিয়ানা নামক চটী পাওয়া গেল। নিকটে ঝরণা আছে, ঝরণার ধারে দোকান ২।৩ খানি আছে। স্থানটী বিশ্রামযোগ্য বটে, কিন্তু ফিরিবার পথে এত শীঘ্র ত বিশ্রাম করা হইবে না। সুতরাং আরও ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নে নন্দ-প্রয়াগ নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। নন্দ-প্রয়াগ উত্তম স্থান, এখানে নন্দা ও অলকনন্দার সঙ্গম হইয়াছে। সঙ্গমস্থানে যাইতে পথের পার্শ্বে উত্তম ১টী বাগান দেখিতে পাইলাম। বাগানে আমগাছ, কলাগাছ, ডালিমগাছ ও শাকসবজী প্রভৃতি আছে। শুনিলাম, একটী সাধু যত্ন-পূর্ব্বক উহা তৈয়ারি করিয়াছেন এবং তিনি শুদ্ধ নিজেই উহার ফলভোগ করেন না; অতিথি, সাধু প্রভৃতিকেও উহার ফলভোগী করিয়া থাকেন। সাধুর উপযুক্ত কার্য্য বটে! ঐ বাগানের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে নীচে নামিতে হইল। নামিবার পথের ধারে ২।৩টী সুন্দর সতেজ অশ্বত্থগাছ দেখিলাম। তথা হইতে সঙ্গমস্থানে নন্দার জল কালো ও অলকনন্দার জল পাণ্ডুবর্ণ বোধ হইতে লাগিল। অলকনন্দার প্রবল বেগ, সে নন্দাকে অগ্রাহ্য করিয়াই যেন আপন মদ-গর্ব্বে চলিয়া যাইতেছে। ক্ষুদ্র নন্দা যে ধীরে ধীরে আসিয়া যথাশক্তি তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহাতে যেন তাহার দৃক্‌পাতই নাই। অসমান-অবস্থায় মিলন হইলে সকলেরই এইরূপ

দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমরা সঙ্গমস্থানে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। নন্দপ্রয়াগ উত্তম স্থান। কণ্বঋষি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া কণ্বাশ্রম নামে ইহার প্রসিদ্ধি আছে। এখানে চণ্ডিকাদেবী, বশিষ্ঠেশ্বর-মহাদেব ও লক্ষ্মীনারায়ণদেবের অধিষ্ঠান আছে। বাজারও উত্তম, ২০।২৫ খানি দোকান আছে, যাত্রিনিবাসও যথেষ্ট। ডাকঘর, পুস্তকালয় প্রভৃতিও আছে। আমি স্থানটীর প্রশংসা করাতে একটী ভদ্রলোক কহিলেন, মহাশয়, এখন নন্দপ্রয়াগের কি আছে যে ইহার প্রশংসা করিতেছেন? পূর্ব্বে ইহা এমন মনোরম স্থান ছিল যে বিদেশী লোক এখানে আসিলে ২।১ দিন অবস্থিতি না করিয়া যাইতে পারিতেন না। পূর্ব্বে গঙ্গার ধারে নিম্নভূমিতে ইহার প্রশস্ত বাজার ও সুন্দর বসতি ছিল, কিন্তু গঙ্গা ইহার সর্ব্বস্ব উদরসাৎ করায় উপরিভাগে নূতন করিয়া বাজার, সড়ক প্রভৃতি একরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। শুদ্ধ ইহারই দুর্দ্দশা হইয়াছে এমন নহে, লালসাঙ্গা, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর ও দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি তীরবর্ত্তী স্থানমাত্রেরই গঙ্গার বিষম উপদ্রবে এইরূপ শোচনীয় দশা হইয়াছে।

এখানে মধ্যাহ্ন-কৃত্য সম্পন্ন করিয়া অপরাহ্নে পুনর্ব্বার আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথে একটী বালিকা ছোট ছোট আম বিক্রয় করিতেছে দেখিয়া আমরা অম্বলের জন্য দুই পয়সার আম কিনিলাম। সোনলা চটী আসিতে ২।১টী আমগাছ ও সোনলা চটীতে একটী আমবাগানও দেখিতে পাইলাম। সোনলা নন্দপ্রয়াগ হইতে ৩ মাইল। আরও দুই মাইল হাঁটিয়া ভরত-চটী নামক ক্ষুদ্র চটীতে আসিয়া আশ্রয় লইলাম।

চটীতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময়ে বন-পোড়ার মত চটপট শব্দ শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পাথর পড়ার দুম-দাম শব্দ হওয়ায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলাম, চটীর সম্মুখে পাহাড়ের একটী স্থান ধ্বস্ খাইয়া মধ্যে মধ্যে খসিয়া পড়িতেছে।

ইন্দুরে মাটী তুলিয়া যেমন ঢিবি করে, সেই আকারে নিম্নে পর্ব্বতের গায়ে স্খলিত বালি ও মাটীর পর্ব্বতাকার প্রকাণ্ড ঢিবি হইয়াছে ও ছোট-বড় প্রস্তর-খণ্ডসকল ঢিবির বিস্তৃত মূলদেশের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও মধ্যে মধ্যে পড়িতেছে। বোধ হয় ঐ পাহাড়ে বালির অংশ বেশী আছে, গাঁথনিরও তেমন জমাট নাই, অধিকন্তু বৃষ্টির জন্য উপরের আবরণ শিথিল হওয়ায় স্খলন-ব্যাপার প্রবল হইয়াছে। জল আনিতে গিয়া আরও আমরা স্পষ্টরূপে উহা প্রত্যক্ষ করিলাম। এখানে জলের ও ময়দানের সুবিধা আছে। আমরা এখানেই অদ্য রাত্রিযাপন করিলাম।

——o——

কর্ণপ্রয়াগ।

৩১শে জ্যৈষ্ঠ।

প্রভাতে চলিতে চলিতে অলকনন্দার নিম্নতটে সুন্দর সমতল অনেকগুলি শস্যক্ষেত্র দেখিতে পাইলাম। পথে জয়কাণ্ডী-চটী প্রভৃতি ২।১টী চটী পাওয়া গেল। আমরা সে সকল স্থানে বিশ্রাম না করিয়া প্রায় ৮ মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক কর্ণপ্রয়াগ পঁহুছিলাম। এখানে অলকনন্দার সহিত কর্ণগঙ্গা বা পিণ্ডরগঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে। সঙ্গমঘাটে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অশ্বত্থমূলে এক বেদির উপর হইতে পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে চটীতে আশ্রয় লইবার অগ্রেই সঙ্গমে স্নান করিয়া যাইবার জন্য যাত্রীদিগকে আগ্রহসহকারে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। আমাদের বোঝাওয়ালা আমাদের বস্ত্রাদির বোঝা লইয়া তখনও অনেক পশ্চাতে আছে। বাসা না লইয়া, একটু সুস্থ না হইয়া, তৈলাদি না মাখিয়া কিরূপে স্নান করা যায়, স্নানান্তে পরিধেয় বস্ত্রেরই বা কি উপায়, এই সকল ভাবিয়া আমরা ইতস্ততঃ করিতেছি, কিন্তু দেখিলাম ক্রমে সকল যাত্রীই চটী লইবার জন্য সিধা সড়কে না গিয়া, সড়ক হইতে

স্নানঘাটের দিকে যে রাস্তা নামিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া চলিলেন। আমরাই বা কোন্ ভরসায় থাকি? আমরাও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথ ধরিয়া স্নান-ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সঙ্গমস্থানে তেমন প্রচণ্ড স্রোত নাই। আমরা স্বচ্ছন্দে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া সেই পবিত্র স্থানে সন্ধ্যোপাসনাপূর্ব্বক ঘাটের উপরে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা কর্ণের প্রতিষ্ঠিত সুন্দর শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। সেই অদ্বিতীয় দান-বীর এখানে যে বিপুল যজ্ঞ ও প্রভূত সুবর্ণ দানাদি করিয়াছিলেন পুরাণেতিহাসে ও লোকপরম্পরায় আজিও তাহা কীর্ত্তিত রহিয়াছে। তাহারই নামসংযুক্ত কর্ণকুণ্ড এখানে একটী প্রধান তীর্থ। তদ্ভিন্ন উক্ত শিবমন্দিরের একটু উপরে উমাদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে।

কর্ণপ্রয়াগ উত্তম স্থান। কর্ণগঙ্গা বা পিণ্ডরগঙ্গার উপরিস্থিত পুল পার হইয়া গিয়া কর্ণপ্রয়াগের বাজারে যাইতে হয়। বাজারও উত্তম, ২০।২২ খানি দোকান আছে। বাবা কালীকম্বলী বালার সুন্দর ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, ডাকঘর, ছাপাখানা, পুলিশ ষ্টেশন সকলই আছে। কেবল জলের বড় কষ্ট, কেন না গঙ্গা অতি দূর-নিম্নে। এ কষ্টের কারণ যে গঙ্গারই উপদ্রব, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। পুল পার হইয়া বহুদূর খাড়া চড়াই অতিক্রমপূর্ব্বক কর্ণপ্রয়াগের চটীতে আশ্রয় লইতে হয়। আমরা যদি অগ্রে চটীতে আসিয়া আশ্রয় লইতাম, তাহা হইলে ক্লান্ত শরীরে পুনর্ব্বার কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক দূরবর্ত্তী সঙ্গমস্থানে স্নানে যাইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। সুতরাং অগ্রে সঙ্গমে স্নান করিবার জন্য পাণ্ডাগণ পথমধ্যে যে আগ্রহ-অনুরোধ প্রকাশ করেন, তাহা তাঁহাদিগের সদ্বিবেচনারই কার্য্য, ইহা এতক্ষণে বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলাম।

—o—

চটোয়া-পিপল।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে এক রাস্তা দক্ষিণমুখে পিণ্ডরগঙ্গার ধারে ধারে রামনগর অভিমুখে গিয়াছে। পঞ্জাব প্রদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য দিকের যাত্রী বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় এই পথ অবলম্বনে রামনগর পহুঁছিয়া ট্রেন ধরেন। এ পথের বৃত্তান্ত পরে যথাস্থানে লিখিত হইবে। দ্বিতীয় রাস্তা অলকনন্দার ধারে ধারে পশ্চিমমুখ হইয়া রুদ্রপ্রয়াগ পঁহুছে ও তথা হইতে শ্রীনগর-দেবপ্রয়াগ হইয়া হরিদ্বার উপনীত হয়। আমরা এখন এই পথেরই যাত্রী। সুতরাং আমরা কর্ণপ্রয়াগ হইতে অপরাহ্নে ঐ পথেই রওনা হইলাম ও অলকনন্দার ধারে ধারে ৪॥০ মাইল পথ আসিয়া চটোয়া-পিপল নামক চটী প্রাপ্ত হইলাম।

চটোয়া-পিপল ক্ষুদ্র চটী। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও জলের ও ময়দানের সুখ আছে এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মিলে। দুধ যাহা ছিল, আমরা পঁহুছিবার পূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিল। অগত্যা উপস্থিত-মত যাহা মিলিল, তাহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইল।

চটীর সম্মুখে গঙ্গার ধারে মূলে-বেদীবদ্ধ একটী অশ্বত্থগাছ আছে। সায়ংকালে তথায় বিশ্রাম-আশায় বসিলাম, কিন্তু বসিয়া আরাম পাইলাম না। সারাদিনের রৌদ্রে উত্তপ্ত পাথর শীতল হইতে বহু বিলম্ব হয়। যখন শীতল হইবে, তখন অবশ্য খুবই শীতল হইবে।

এই স্থানে বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্য সচ্চিদানন্দ স্বামী নামে নূতন সম্প্রদায়স্থ, মধুরপ্রকৃতি এক সন্ন্যাসিবেশী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহার মুখে শুনিলাম যে ইঁহারা শুনিয়াছেন, কেদারনাথের পথে কোন কোন যাত্রীর কলেরা হইতেছে, দোকানদারেরা ঐ সকল যাত্রীকে নিকটে স্থান দিতেছে না। যদি ঐরূপ হইয়া থাকে, ঐ নিরাশ্রয় মারাত্মক রোগাক্রান্ত যাত্রীদিগের আশ্রয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন। তিনি তাহার

তদন্তে যাইতেছেন। যুবাটী বি, এ, পাশ করিয়াছেন, বাড়ী সেতুবন্ধ-রামেশ্বর অঞ্চলে। এই সম্প্রদায়স্থ লোকের কার্য্য ও স্বভাব অতি প্রশংসনীয়। ইঁহারা শাস্ত্রানুশাসন সম্পূর্ণ মানিয়া চলিলে আরও কত সুখের বিষয় হইত! দুঃখের বিষয়, ইঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানেন না। জীবের প্রতি দয়া ত ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ, তাহাতে ত কোন মত-ভেদ নাই। তবে শাস্ত্রপদ্ধতি হইতে ভিন্ন আকারের একটা নূতন মার্গ প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন কি?

———০———

কমেডা চটী।

১লা আষাঢ়।

চটবা-পিপল হইতে প্রভাতে রওনা হইয়া কিয়দ্দূর আসিয়াই বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পাইলাম। কিন্তু তাহা কষ্টকর বলিয়া বোধ হইল না, বরং মধু-বৃষ্টির ন্যায় আনন্দজনক বলিয়া বোধ হইল। চলিতে চলিতে অলকনন্দার তীরে একস্থানে এমন বিস্তীর্ণ ও সমতল শস্যক্ষেত্র দেখিলাম যে, ইতি-পূর্ব্বে এ পার্ব্বত্য প্রদেশে কোথাও তাহা দেখি নাই। ঐ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে একস্থানে একখানি গ্রামও বসিয়া গিয়াছে। আবার তাহার অদূরে উচ্চভূমিতে, যে স্থান দিয়া আমাদের গমনের পথ চলিয়াছে, সেখানেও এমন দুর্ব্বাদল-মণ্ডিত বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের মধ্য দিয়া আমাদের ঐ পথ চলিল যে ঐরূপ ক্ষেত্র এ প্রদেশে একান্তই দুর্লভ। আমাদের দেশের কৃষ্ণনগর-কলেজের বিস্তীর্ণ হাতা আমার মনে পড়িল। আমরা যে সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে আছি, ক্ষণকালের জন্য আমি তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই এখানকার নিত্য-অভ্যস্ত প্রাকৃতিক অবস্থা স্মরণ করিতে হইল। কেন না অবিলম্বেই পরস্পর-নিকটবর্ত্তী দুইটী পাহাড়ের মধ্যস্থিত এমন নির্জ্জন নিস্তব্ধ পথে পতিত হইলাম যে,

আমার পূর্ব্বসুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইতে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। তাহার উপর প্রবল ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। শরীরও ক্লান্ত, আশ্রয়-স্থলও দেখিতে পাই না। ছাতায় কত রক্ষা হইবে? বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল, সেই অবস্থায়ই চলিতে লাগিলাম। না চলিয়া কি করি? চলিতে না পারিলে পথে দাঁড়াইয়া ভিজিতে হইবে। তাহা অপেক্ষা চলা ভাল, যদি কোথাও আশ্রয় পাওয়া যায়। ঐ অবস্থায় ৫ মাইল পথ চলিয়া হংসাকি দোকান বা কর্ন্ডো চটী প্রাপ্ত হইলাম। এ চটীতে দুইখানি ঘর আছে। প্রথম ঘরখানি সম্পূর্ণ জীর্ণ, তাহার চাল ভেদ করিয়া বর্ষার সহস্রধারা অনবরত ঝরিতেছে, শুষ্ক স্থান একবারে দুর্লভ। দ্বিতীয়খানি উচ্চভূমির উপর অবস্থিত ও সেইরূপ জীর্ণ নহে। সেই খানিতেই আমরা আশ্রয় পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। বলা বাহুল্য যে প্রথমে প্রথমখানিতেই আশ্রয় লইয়াছিলাম, নহিলে তাহার অত গুণাগুণ বুঝিব কিরূপে? কিন্তু সে ঘরে থাকা আর বাহিরে ভেজা একই কথা দেখিয়া তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ঘরখানিতে আসিয়া প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলাম। বহু প্রয়াসে আর্দ্র বস্ত্রগুলি অল্প-বিস্তর শুকাইয়া লইলাম। বহু কষ্টে পাক-ভোজনও একরূপ সম্পন্ন করিলাম। এই সময়ে মধ্যাহ্নের সূর্য্য দেখা দিলেন। তাঁহার দর্শনে আমরা যেন প্রাণ পাইলাম। হায়, এই সূর্য্যদেব, যাঁহার নিত্য উদয়লাভ আমাদের অভ্যস্ত বলিয়া আমরা তাঁহাকে আদর করি না বা করিতে জানি না, ক্ষণকাল তিনি দৃষ্টির অগোচর হইয়া থাকিলেই বুঝিতে পারি যে তাঁহা বিনা জগৎ যথার্থই অন্ধকার!

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যেন আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বৃষ্টির আর নাম-গন্ধ নাই, সমস্ত মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, নির্ম্মল নীল আকাশ দেখা দিল, তাহাতে প্রচণ্ড রৌদ্র ফুটিয়া উঠিল। অতি বর্ষণে ক্লান্ত গাছ-পালাগুলি যেন সহর্ষে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল।

ক্ষণমধ্যে পথগুলি শুষ্ক, পৃথিবী উত্তপ্ত। আমরা অত উত্তাপে পথে বাহির হইতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম। ৩ মাইল পথ হাঁটিয়া অপরাহ্নে শিবানন্দী চটী প্রাপ্ত হইলাম।

——০——

শিবানন্দী চটী।

শিবানন্দী ক্ষুদ্র চটী, দুধ পেড়া প্রভৃতি এখানে মিলে না। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য যাহা মিলে, পূর্ব্বাপেক্ষা দরে শস্তা দেখা গেল। আটা ৵৹ আনা সের। বিশুদ্ধ ঘৃত টাকা সের। ইতিপূর্ব্বে এগুলি ঐরূপ দরে মিলে নাই। দোকানের নিকট একটি মন্দির, তাহাতে লক্ষ্মী-নারায়ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। অলকনন্দার তীরে চটী বা দোতলা ধর্ম্মশালা। অলকনন্দার প্রবাহ বহু নিম্নে নহে। অধিকন্তু নিকটেই পথের ধারে ১টী বেগবান্ নির্ঝর থাকায় জলের বেশ সুবিধা আছে।

আমরা উপর-তলে বারান্দায় বাসা লইয়াছিলাম। কেন না তাহা পূর্ণ আলোকে আলোকিত ও তাহার সম্মুখভাগেই অলকনন্দা প্রবাহিত ও তাহা দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বারান্দার দুই প্রান্তের পশ্চাতে যে দুই কুঠুরি আছে, তাহা জানালা-বর্জ্জিত বলিয়া যেমন অন্ধকারময়, তেমনি বায়ুসঞ্চার-রহিত। মধ্যের লম্বা হলে বা খোলা দালানে পাকাদির ব্যবস্থা আছে। তথায় সারি সারি অনেকগুলি উনন দেখিলাম, কিন্তু সবই অপরিষ্কার ও তাহার বহু দূর লইয়া আবর্জ্জনাময়। আমাদের পাকের প্রয়োজন নাই, কিন্তু শয়নের প্রয়োজনও তথায় সম্পন্ন হইবার উপায় নাই। এত বড় স্থান থাকিতেও স্থানাভাব। অগত্যা বারান্দাতেই আমরা রাত্রিযাপনের স্থান করিয়া লইলাম। কিন্তু কেমন দুর্ভাগ্য, সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন আর বিবেচনা করিয়া কোন প্রতিকার হইতে পারে না। কেন না তখন ভাল-মন্দ

সকল স্থানই যাত্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, উপস্থিত সরলধারেই বৃষ্টি পড়িতেছিল, ছাট ছিল না। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিবেচনা করারও বিশেষ প্রয়োজন হইল না। বিশেষতঃ নিকটে সারি সারি অনেকগুলি সাধু আসন লাগাইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভজনের ধূমে অন্য কথা ভুলিয়া যাওয়া গেল। তাহার উপর শরীর পথিশ্রমে ক্লান্ত, শয়নই তখন স্বাভাবিক, সে অবস্থায় তদনুরূপই ব্যবস্থা হইল। এদিকে বৃষ্টির বিরাম নাই, দিনে যেমন প্রচণ্ড রৌদ্র হইয়াছিল, এখন রীতিমত তাহার প্রতিশোধ হইতে লাগিল। হউক, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এক এক দমে অনেকক্ষণ ধরিয়া চটাপট্ দুড়ুম-দাড়ুম এইরূপ প্রবল শব্দ হইতে লাগিল, ও তাহাতে আমাদের আগমনোন্মুখ নিদ্রার পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ হইতে লাগিল। ঐরূপ ক্ষণিক ভঙ্গ হইলেও নিদ্রা বরাবর অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াই রহিল। কিন্তু রাত্রিশেষে আর এক উৎপাত উপস্থিত, বৃষ্টির ছাট আরম্ভ হইল ও তাহাতে অনেকবার উঠিয়া বসিতে হইল, এবং ক্রমেই যথাসাধ্য অধিকাধিক বিছানার সঙ্কোচ করিতে হইল। উপায় কি আছে? যাহা হউক, স্থানটী বিস্তৃত বলিয়া উঠিয়া বসিয়া কোনরূপে সকলেরই সে দুর্দ্দিনের নিশার অবসান হইল।

—o—
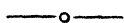
রুদ্রপ্রয়াগের পথে।

২রা আষাঢ়।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি, সম্মুখেই নদীপারে পাহাড়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ সমস্ত রাত্রির প্রবল বৃষ্টিধারায় এমন ধ্বসিয়া পড়িয়াছে যে সেই সেই স্থানের পতিত স্তূপ নিম্নে অলকনন্দার প্রবাহকে সরাইয়া উচ্চ হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। অদূরে পথের ধারে যে সুন্দর ঝরণাটী ছিল, সে প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রচণ্ডবেগে লম্ফ-ঝম্পসহকারে ধাবিত হইয়াছে।

অধিকন্তু, সেইস্থানে তাহার অবতরণের পথটী ভাঙ্গিয়া স্থানটীকে উচ্চ তীরে পরিণত করিয়াছে। আমরা সেই দিক্ দিয়া আসিয়াছি, অন্যদিকে আমাদিগকে রওনা হইতে হইবে। সুতরাং তাহাতে আমাদের আপাততঃ ক্ষতি বোধ হইল না। কিন্তু আমরা আমাদের গন্তব্য পথের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখি, সম্মুখেই পথি-পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের এক উচ্চস্থান হইতে প্রকাণ্ড-পরিসর এক বিশাল জলরাশি দুই স্থূল ধারায় বিভক্ত হইয়া প্রচণ্ডরবে প্রবলবেগে পথের উপরি পতিত হইতেছে। অনবরত পার্ব্বত্য মৃত্তিকারাশি ধৌত করিয়া আসিতেছে বলিয়া ঐ জলরাশি সম্পূর্ণ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং উহা যে-পথের উপর পতিত হইতেছে, তথায় পথের চিহ্ন মাত্র নাই। ঐ স্থান হইতে বহুদূর নিম্ন স্থান পর্য্যন্ত গভীর গহ্বরে পরিণত করিয়া ঐ উন্মত্ত জলরাশি অলকনন্দার গর্ভে ধাবিত হইয়াছে। আমরা হতবুদ্ধি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলাম। কি প্রচণ্ড শব্দে দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে! কি পতিতোৎক্ষিপ্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ শুভ্র-সূক্ষ্ম জলকণা বহুদূর ব্যাপিয়া আত্ম-প্রভাব বিস্তার করিতেছে! হরি হরি, আমরা জানিতাম, আমাদের কোমল-মৃণ্ময় পৃথিবীই বুঝি সর্ব্বদা ক্ষয়শীল, অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ; এ সুদৃঢ় পার্ব্বত্য ভূমিরও এমন দুর্দ্দশা? যাহাহউক, এখন আমাদের গতি-পথের কি উপায়? চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, আমাদের অগ্রবর্ত্তী কতকগুলি যাত্রী বহুদূর নিম্নে নামিয়াছেন, সেখানে জলরাশি অনেক দূর ছড়াইয়া পড়িয়া অপেক্ষাকৃত অনেক মৃদুবেগে অলকনন্দায় গিয়া মিশিতেছে। আমরাও সেই উপায় অবলম্বনে বহুদূর নামিয়া ও বহুদূর ঘুরিয়া জলরাশি অতিক্রমপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে পথ প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু আরও কতক পথ অতিবাহন করিয়া দুইটী স্থানে উহা অপেক্ষাও যে বিষম সঙ্কটে পতিত হইলাম, তাহা লিখিয়া হৃদয়ঙ্গম করান দুঃসাধ্য। ঐ দুইস্থানে পুল ছিল, তাহা বোধ হয়

পূর্ব্ববর্ণিত প্রবাহ অপেক্ষাও উদ্ধত প্রবাহবেগে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। ঐ ঐ স্থানে আমাদের অগ্রে প্রস্থিত যাত্রীদিগের মধ্যে কতকগুলি যাত্রী দেখিলাম, প্রবাহের ধারে গিয়া মণ্ডলী করিয়া বসিয়া আছেন। কতক তখনও বন জঙ্গল ধরিয়া সেখানে অবতীর্ণ হইতেছেন। একজন অশ্বারোহী পথিক অশ্বের লাগাম ধরিয়া তথায় দাঁড়াইয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি অশ্ব ফিরাইয়া পুনর্ব্বার উপরে উঠিলেন। বোচ্‌কা-বুচ্‌কি-পিঠে কতকগুলি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক, দেখিলাম দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মহা-কলরব আরম্ভ করিয়াছে। উপর হইতে আমরা এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ত প্রমাদ গণিতে লাগিলাম। বহুকষ্টে ভগ্নপথের পার্শ্বের বন-জঙ্গল ধরিয়া নিম্নে নামিয়া গিয়া আমরা তাহাদের দলের পুষ্টি মাত্র সম্পাদন করিলাম। উপায় কি আছে? ভাবা-ভাবনাই বহুক্ষণ ধরিয়া চলিল। অবশেষে ২।৩টী বলিষ্ঠ পুরুষ সাহস অবলম্বন করিয়া জলে নামিলেন। সম-বিষম পাথরের উপর খুব সাবধানে পা ফেলিয়া প্রবাহের বেগ সামলাইতে সামলাইতে ধীরে ধীরে তাঁহারা অপর পারে পঁহুছিলেন। আর চিন্তা কি? তখন তাঁহারা পরম উৎসাহে প্রফুল্লমুখে ফিরিয়া আবার এ পারে আসিলেন। আসিয়া একে একে স্ত্রীলোকদিগকে হাত ধরিয়া পার করাইতে লাগিলেন। আনন্দের বিষয়, একজনও সে প্রখর-স্রোতের বেগে বিপন্ন হইল না। শৌর্য্য ও সাহসের সর্ব্বত্র জয়। আমরাও তাহাদের দেখাদেখি কোনরূপে ভব-সিন্ধু পার হইলাম।

অন্য স্থানটীতে গিয়া দেখিলাম, কতকগুলি তদ্দেশীয় লোক মিলিত হইয়া একটা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রবাহের মধ্যে দুইধারে যে দুইখানা পাথর জাগিয়াছিল, তাহার উপর কড়িকাঠের মত লম্বা লম্বা দুইখানা কাঠ লম্বালম্বি করিয়া দিয়াছে। তাহার নীচে দিয়া প্রবাহের জলরাশি ভয়ঙ্করবেগে প্রচণ্ডরবে ছুটিয়াছে। সে প্রবাহের দিকে দৃষ্টি করিলে সকলেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। যাত্রীরা অতি সাবধানে অতিধীরে

পায়ে পায়ে চলিয়া দুইধারে জল, মাঝে সঙ্কীর্ণ কাঠের সেতু-রূপ বিষম স্থানটী কষ্টে সৃষ্টে উত্তীর্ণ হইতেছে। আমরাও তথায় সেইরূপ উপায়ে উত্তীর্ণ হইলাম।

এতদ্ভিন্ন কতস্থানেই যে পাহাড়ের অংশ বিশেষ ধ্বসিয়া রাস্তায় পড়িয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তাহাতে অনেক স্থানে রাস্তা একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোথাও স্খলিত ও পতিত পাথরের অংশই স্তূপীকৃত হইয়াছে, মৃত্তিকার অংশ ধুইয়া গিয়াছে। কোথাও পতিত স্তূপের মধ্য দিয়া বৃষ্টির প্রবাহ বহিয়া তাহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও স্নিগ্ধশ্যামল-পল্লবিনী একটী লতা উন্নত পর্ব্বত-গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া পথে গড়াগড়ি যাইতেছে। কিন্তু তখনও সে প্রফুল্লভাব পরিত্যাগ করে নাই। আহা তখনও হয় ত সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এই সকল দৃশ্য যেমন চিত্তের উদ্বেগকর, আবার অপর কতকগুলি দৃশ্য তেমনি চিত্তের আকর্ষণকারী হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হওয়ায় তরুলতাসমূহ সমস্ত রাত্রি তাহাদের চিরপ্রার্থিত ধারাজলে আপাদ-মস্তক স্নাত হইয়াছে। তখনও তাহারা নিজ কোমল পত্রাবলীর অগ্রভাগ হইতে ক্রম-সঞ্চিত মুক্তাবিন্দু পরিত্যাগ করে নাই। স্বাভাবিক সুনীল-সুকুমার ও সুচিক্কণ পত্রাবলী যেন আরও ঐ ঐগুণের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। ধান্যক্ষেত্রে অচিরোদ্গত সুকোমল চারাগুলি কি বর্ণ-লালিত্যে, কি সজীবতায় যেন উদ্ভিদ্‌রাজ্যে তরুণ বয়সেই দিগ্‌বিজয়ী হইয়া দীপ্যমান রহিয়াছে। বর্ষণ-জল কোথাও একক্ষেত্র হইতে অন্যক্ষেত্রে প্রবাহিত, কোথাও পার্শ্ববর্ত্তী প্রণালী দিয়া প্রধাবিত হইয়াছে, কোথাও অন্য পথ না পাইয়া মনুষ্যগম্য পথের মধ্যভাগই ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিয়াছে, আর আমরা তাহা লঙ্ঘন করিতে করিতে চলিয়াছি। কৃষকগণ পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চভূমিস্থ আপন আপন গৃহে বসিয়া কেহ গান ধরিয়াছে, কেহ প্রফুল্ল-নয়নে নিজ ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিপাত

করিতেছে। সকলেই আরামে মগ্ন, নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন কেহ আজি ঘরের বাহির হয় নাই। পথে কেবল আমরাই চলিয়াছি, চলিতে চলিতে পথে জল ভাঙ্গিয়া কোথাও জলের কল কল ধ্বনি উৎপাদন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পথের ধারে মধ্যে মধ্যে ছায়াপ্রধান ২।১টী অশ্বথ ও বটগাছ আজি যেন আরও সুস্নিগ্ধ হইয়া শান্তি ও আনন্দ বিস্তার করিতেছে। ফলতঃ আজি আমরা জন্মভূমি বঙ্গভূমির বর্ষাকালীন হর্ষ ও শান্তিমিশ্রিত দৃশ্য এখানে যেন অবিকল প্রত্যক্ষ করিলাম।

---o---

রুদ্রপ্রয়াগ।

শিবানন্দী হইতে ৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মধ্যাহ্নে আমরা রুদ্রপ্রয়াগ প্রাপ্ত হইলাম। চটীতে একটা ঘরে দ্রব্যাদি রাখিয়া সঙ্গমে স্নানার্থ আমরা পুল পার হইয়া চলিলাম। পুল পার হইয়াও অনেকটা রাস্তা যাইতে হয় এবং ঐ রাস্তা চড়াই ও নদীর খাড়া পাহাড়ের উপর। প্রায় ১ মাইল ঐরূপ চড়াই অতিক্রম করিয়া মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গম দেখিতে পাইলাম। যেখান হইতে দেখিতে পাইলাম, তথা হইতে শতাবধি সিঁড়ির ধাপ ভাঙ্গিয়া সঙ্গমস্থলে অবতীর্ণ হইতে হয়। সেখানে অলকনন্দার কি তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণ উন্মত্ত নৃত্য! বিষ্ণুপ্রয়াগ পুনর্ব্বার আমাদের স্মরণপথে পতিত হইল। আমরা সঙ্কল্পপূর্ব্বক অতি সাবধানে সঙ্গমস্থানে স্নান করিয়া আবার ততোঽধিক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া রুদ্রনাথের মন্দিরে উঠিয়া তথায় তাঁহার দর্শন লাভ করিলাম। এই সঙ্গমের পারেও অনেকগুলি দোকান ও যাত্রি-নিবাস আছে। এখান হইতে কেদার-নাথে যাইবার এক রাস্তা মন্দাকিনীর ধারে ধারে চলিয়াছে। যাহা হউক, আমরা দেবদর্শনান্তে তথায় কিঞ্চিৎ জলযোগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পুল পার হইয়া বাসায় পঁহুছিলাম। আজি সকলেরই শরীর কিছু অধিক ক্লান্ত।

কিন্তু সহিষ্ণুতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপা স্ত্রীজাতি, বিশেষ হিন্দুমহিলা ক্লান্ত হইয়াও ক্লান্ত নহেন। আমি শ্রম-বিবশ অঙ্গে আরাম করিতে লাগিলাম। আর সঙ্গিনী সহ-যাত্রীরা অধিক বেলা হইয়াছে বলিয়া যেন অধিকতর ব্যস্ত-সমস্তভাবে অম্লানমুখে পাকাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এপারেও এক পার্ব্বত্য নদী আসিয়া অলকনন্দায় মিশিয়াছেন, ইহার নাম পুনরাগঙ্গা। আমাদের প্রথমে ইহাকেই মন্দাকিনী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। আমরা এই নদীর পুল উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার অলকনন্দার ধারে ধারে দুই মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক গোলাপরায়নামক ক্ষুদ্র এক চটী প্রাপ্ত হইয়া তথায়ই অদ্য রাত্রিযাপন স্থির করিলাম। এই চটী ক্ষুদ্র বা দরিদ্র হইলেও এখানে জলের বেশ সচ্ছলতা আছে, সুন্দর স্থূল-ধারে ঝরণাটী অনবরত শীতল জল বিতরণ করিতেছে। ময়দানেরও কষ্ট নাই। বরং পাহাড়ের ধারে ধারে একটু স্থান ও তাহাতে বন্য গাছ-পালা, ঝোড় জঙ্গল যথেষ্ট আছে। গো-মহিষাদি তথায় স্বচ্ছন্দে চরিতেছে। তবে বাসের জন্য লম্বা ধাওড়া দোচালা বটে, তা হউক। চটীর সম্মুখবর্ত্তী রাস্তার একটু নিম্নে নদীতটে যে কতকগুলি ফলবান্ আমগাছ আছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর বোধ হইল। তাহারা আপনাদের শান্ত-নিভৃত দৃশ্যে ও সুশীতল ছায়াবিস্তারে পার্ব্বত্য পথ-যাত্রীর ক্লান্ত, উত্তপ্ত চক্ষে যেন পল্লীগ্রামের কি প্রীতিপূর্ণ শান্ত-স্নিগ্ধ ছবিই ধরিয়া রহিয়াছে!

৩রা আষাঢ়।

অদ্য প্রভাত হইতেই চড়াই আরম্ভ। ক্রমাগতই চড়াই, অনেকদিন এরূপ চড়াই পাই নাই। প্রায় দুই মাইল ঐরূপ চড়াই করিয়া শিখর-দেশ প্রাপ্ত হইলাম। তথায় ১ খানি ক্ষুদ্র দুগ্ধের দোকান রহিয়াছে। বিক্রয়ের উপযুক্ত স্থান বটে এবং বিক্রেতারও ব্যবসায়-বুদ্ধি বটে।

আমরা তথায় একটু গরম দুগ্ধ পান করিয়া লইলাম। এখানে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবার আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তখন সেটা অসঙ্গতও বটে, এবং আর-কাহারও মুখ দিয়া সে কথা বাহির হইবে না, আমিও বা কেন তাহা তুলিয়া নিজের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করি? সুতরাং কথাটা চাপাই রহিল। যথাপূর্ব্ব চলিতে আরম্ভ করা গেল। তখন অল্প অল্প করিয়া উতরাই আরম্ভ হইয়াছে। কিছুদূর চলিতে চলিতেই আকাশে মেঘ দেখা দিল। যেমন মেঘের দেখা অমনি বৃষ্টি আরম্ভ। সে বৃষ্টিও বিলক্ষণ বৃষ্টি, অবিরলধারে ও স্থূলধারে অবিরামে পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির সঙ্গে একটু বাতাসও ছিল, তাহাতে আরও লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিল। যাত্রিগণ সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত অবস্থায় পরস্পরের প্রতি দীন দৃষ্টিপাতমাত্র করিতে করিতে ছুটিতে লাগিলেন। আর কি করিতে পারেন? পথে কোন আশ্রয় নাই। পথের ধারে আশ্রয়ের উপযুক্ত একটি গাছপালা পর্য্যন্ত নাই। স্ত্রীলোকদিগের আরও কষ্ট। ক্বচিৎ কোন স্ত্রীলোকের মাথায় ছাতা আছে, কিন্তু অধিকাংশেরই নাই। আমার বিবেচনায় এরূপ দীর্ঘ ও সঙ্কট পথে নিরন্তর রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেক স্ত্রীলোক ও পুরুষের ছাতা সংগ্রহ থাকাই যেন কর্ত্তব্য। ব্যবহার-বিরোধ এস্থলে ধর্ত্তব্য নহে। কি কঠিন পথ! ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, মধ্যাহ্নে আমরা থাঁকরা-নামক ক্ষুদ্র চটী প্রাপ্ত হইলাম। চটীর নীচেই একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী, কিন্তু পাহাড়ে বর্ষণ-আরম্ভ হওয়ায় তিনিও তখন তাঁহার সেই অল্প-পরিসর খাত জলরাশিতে পূর্ণ করিয়া উন্মত্তনৃত্যে ধাবিত হইয়াছেন। আমরা তথায় স্নান করিয়া বস্ত্রাদি কোনরূপে শুকাইয়া লইলাম। পাক ভোজনও তথায় কোনরূপে সম্পন্ন হইল। ক্ষুদ্র স্থান হইলেও এখানে দুগ্ধক্ষীরাদির অভাব দেখিলাম না।

অপরাহ্নে দেবতার আর কোন উপদ্রব নাই, যেন সে-দিনই নহে। আকাশ নির্ম্মল, প্রখর রৌদ্র। ২।১ খানি মেঘ আছে, তাহা নিতান্ত

নিষ্ক্রিয়, নিজের সম্পূর্ণ নিঃসারতা দেখাইয়া যেন দূর আকাশে তাহারা একদিকে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। হায় দেবরাজ, তুমি বহুরূপী, তোমাকে কিছুতে চিনিবার যো নাই। আমরা আবার নির্ভয়ে রওনা হইলাম। কিন্তু আবার বিষম চড়াই। সে চড়াই অতিক্রম করিতে সকলকেই তৃষ্ণার্ত্ত হইতে হয়। অথচ এ পথে জল-বিন্দু নাই। বিধাতা এস্থলে কোনরূপ প্রসন্নতা প্রকাশ করেন নাই। বহুকষ্টে চড়াইএর শেষ সীমায় উত্তীর্ণ হওয়া গেল। এখানে তারাদত্ত নামে একজন মহাত্মা জলদান করিতেছেন, তাই রক্ষা। নতুবা উভয় দিক্ হইতে বহুযাত্রার যাতায়াতের পথে এত উৎকট চড়াই স্থলে কি সঙ্কট উপস্থিত হইত, আমরা ভুক্ত-ভোগী হইয়া তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলাম। ধনসম্পত্তিশালী পুণ্যবুদ্ধি মহাত্মাদিগের এই স্থলে প্রচুর পানীয় জলের ব্যবস্থা নিমিত্ত দৃষ্টিপাত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। স্থানটীর নাম গঙ্গাদর্শনা বা ছাতিখাল। এই স্থানে একটু বিশ্রাম করিয়া আমরা উতরাই আরম্ভ করিলাম। যেমন চড়াই, উতরাইও তেমনি বিকট। যাহাহউক, আমরা ৩৷০ মাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক উচ্চ হইতে নামিতে নামিতে হঠাৎ সুন্দর সমতলভূমি পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। এখানকার চটীর নাম ভট্টিসেরা।

——০——
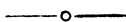
ভট্টিসেরা।

প্রথম প্রাপ্ত দোকানগুলি পরিত্যাগ করিয়া প্রায় শেষভাগে অর্থাৎ একখানি দোকান অবশিষ্ট থাকিতে যে ধাওড়া, খুব লম্বা, থামওয়ালা দোচালা আছে, উহাতেই আশ্রয় লইলাম। দোকানদার আমাদিগকে যথেষ্ট আদর করিয়া তাহার দোকান-ভাগের নিকট স্থানটীতে আমা-দিগকে আশ্রয় দিল। ইহা অবশ্য আমাদের ভাগ্য। কেন না, কিয়ৎ-

কাল পরেই জানিয়াছিলাম,চাল দিয়া সর্ব্বত্রই জল ঝরে, কিন্তু আমাদিগের দিকে কম। ইহা অবশ্য দোকানদাররের কৃপা ও আমাদের ভাগ্যের কথা, তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু বাঙ্গালীর ভাগ্যে শেষ রক্ষা হয় না, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়। সকল কথা ক্রমে ব্যক্ত হইতেছে।

চটীতে বসিয়া নিশ্চিন্তে আরাম করিতেছি, দোকানদারের সওদা লওয়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি। আমি বলিলাম, আচ্ছা, সব হইতেছে, একটু অপেক্ষা কর। অন্যদেশীয় যাত্রী যেমন চটীতে প্রবেশিয়াই আটা প্রভৃতি লইল ও তাহা পাকাইবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল, আমাদিগের তেমন ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। সায়ং সন্ধ্যার পরই যাহা কিছু দরকার, লইব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। এদিকে অন্ধকার ক্রমে ঘনাইয়া আসিল। ঘরের মধ্যে বসিয়া আছি, বুঝিতে পারি নাই যে মেঘ আবার মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে। ঘরের মধ্যে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ দেখিয়া আমাদের চৈতন্য হইল। দোকানদার আমাদের সওদা লইতে বিলম্ব দেখিয়া এই সময়ের মধ্যে মনে মনে একেবারে বিষম চটিয়া উঠিয়াছে। আমরা যে দ্রব্যাদি লইব বলিয়াছি, সে সবই আমাদের প্রবঞ্চনা বাক্য বলিয়া তাহার স্থির হইয়াছে। হঠাৎ সে উগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, নিকৃলো হিঁয়াসে তুম্‌লোক, সব্‌ম্যায় সমঝ্ গয়া হুঁ। আমি বলিলাম, কেন বাপু, দুধ পেড়া প্রভৃতি যাহা লইব বলিয়াছি, সবই আমরা লইতেছি, অকারণে আমাদের উপর এত ক্রোধ কেন ? তখন বৃষ্টি গড়াইতে আরম্ভ হইয়াছে। মেঝের মাঝখানে জল জমিয়া লম্বালম্বি বিস্তৃত হইয়া যাইতেছে। যাত্রীরা সরিতে সরিতে দুইদিকের দুই প্রান্তভাগ আশ্রয় করিয়াছে। আমাদের দিকেও চাল দিয়া সামান্য জল ঝরিতেছে দেখিয়া আমরাও উদ্‌বিগ্ন হইয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছি। ইহা দেখিয়া দোকানদারের আরও অসহ্য হইল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, আঃ কি বাবুলোক আর কি ! কোথায় কয়েক জায়গায় চালের ফাঁক

দিয়া টোপ টোপ করিয়া জল পড়িতেছে, ইহাতেই উঁহাদের গায়ে বাণ বিঁধিতেছে! আর ওদিকে অত গুলো লোক বৃষ্টিতে বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে, তাদের মাঝদিয়া নদী-নালা বহিয়া যাইতেছে, তারা অম্লান মুখে তাহা সহ্য করিতেছে! তোমাদের এখানে জায়গা দিয়া কি বেকুবিই করিয়াছি! এই জায়গা টুকুতে আরও ২।৩ টাকা আজ আমি বেশি পাইতাম। আমি মনে করিলাম, খুব বাহাদুর তুমি, জগতে তোমার জোড়া খুঁজিয়া মেলা ভার! কিন্তু মুখে কিছুই বলিতে পারিলাম না। সে দুর্য্যোগে যদি কোথাও উপায়ান্তর না হয়? কাহার দ্বারাই বা উপায় চেষ্টা করিব? সঙ্গের লোক দুটা বোঝা ফেলিয়া দিয়া যে কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহাদের আর দেখা নাই। সুতরাং ঐরূপ কল্পনা মন হইতে দূর করিয়া দিয়া আপাততঃ দোকান-দারের মনোরঞ্জনের জন্যই চেষ্টা করিলাম, অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র আমাদের জিনিষ পত্র দিবার জন্য তাহাকে তাগাদা করিতে লাগিলাম। আমাদের কথা তখন দোকানদারের কাণে বিষ বর্ষণ করিতেছে, সে এ দিকে কর্ণপাতও না করিয়া নিরুত্তরে বিরক্তিব্যঞ্জক মুখভঙ্গি সহকারে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। তখন তাহার মনোগত ভাব, কোন্ যাত্রী বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া চলিতেছে, দেখিতে পাইলে, তাহাকে অন্য দোকানে যাইতে না দিয়া নিজদোকানে ডাকিয়া লইবে। আহা, তাহার মনোরথ ক্রমে পূর্ণ হইল! কতকগুলি দুর্ভাগ্য যাত্রী অন্যত্র স্থান না পাইয়া এখানে স্থান আছে মনে করিয়া এই দোকানেই প্রবেশ করিল। এইরূপে যথাশক্তি যাত্রী ঠাসিয়া গুদাম-জাত করা হইলে দোকানদারজী জিনিষ-পত্র বেচিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা সে বর্ষার রাত্রি সেখানে কিরূপে যাপন করিলাম, তাহার আর বিস্তারে প্রয়োজন কি? কোনরূপে দুর্দ্দিনের প্রভাত হইল।

—o—

৪ঠা আষাঢ়, প্রভাত।

দুর্দ্দিনের রাত্রি গত হইয়াছে, কিন্তু বৃষ্টি গত হয় নাই। এই সময়ে আমাদের ভারবাহকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের পূর্ব্ব-বোঝাওয়ালা পীড়িত হইয়া জবাব দেওয়ায় তাহার ঐ বোঝা লইবার জন্য এক জনের স্থলে আমাদিগকে দুইজন কাণ্ডীওয়ালা নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ইহারাই গত কল্য বোঝা নামাইয়া দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। এ প্রসঙ্গে আরও ২।৪ কথা বলিবার অপেক্ষা আছে, নতুবা কথাটা পরিষ্কার হইতেছে না। আমরা যে ঘরটীতে আশ্রয় লইয়া আছি, ইহার একটা নীচের তালা আছে, তাহা পূর্ব্বে আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের তালাই রাস্তার সমতলে অবস্থিত, সুতরাং তাহাকেই প্রথম তালা বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল। দোকানদার আমাদের ভারবাহক-দিগকে ইহার নীচের তালায় থাকিতেই বলিয়াছিল। কিন্তু সে তালা এমন স্যাঁত-সেঁতে যে তাহা মনুষ্যের বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। অগত্যা তাহারা স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়াছিল। প্রভাত হইতেই তাহারা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতেই আমাদিগের নিকট উপস্থিত। কেননা তাহাদের পথ ত কমান চাই। কিন্তু তাহারা যে ঐ নিম্নতলে ছিল না, তাহা আমাদের তীক্ষ্ণদর্শী দোকানদার সন্ধান রাখিয়াছে। এখন তাহাদিগকে উপস্থিত দেখিয়া রুক্ষস্বরে কহিল, তোরা এখানে কেন? তার পর আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনারা কি এখনি উঠিবেন? আমরা কহিলাম আমাদের এখনি যাইবার ইচ্ছা বটে, বৃষ্টির গতিক একটু অপেক্ষা করিয়া দেখিতেছি। দোকানদার পুনর্ব্বার কাণ্ডীওয়ালা দুইজনকে উগ্রস্বরে কহিল, তোরা শীঘ্র বাহির হ। তাহারা যাইতেছি বলিয়া বৃষ্টির জন্য, কি তামাক খাইবার জন্য বাহির হইতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া দোকানদার তাড়িয়া আসিয়া অগ্রবর্ত্তী কাণ্ডীওয়ালার গলায় ধাক্কা দিয়া কহিল, এখনও দেরি, বেইমান! তারপর লাথি মারিয়া বেচারাকে

ফেলিয়া দিল। আমি কহিলাম, বাপু, আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে! ও মার আমাদিগকেই হইতেছে, আমরা এখনি যাইতেছি, বলিয়া কাণ্ডী-ওয়ালাদিগকে বোঝা বাঁধিতে বলিলাম। ব্যাপার এই, কাণ্ডীওয়ালারা দোকানদারের দর্শিত আমাদের ঘরের নিম্নতলে রাত্রিবাস করিতে না পারিয়া অন্য যে দোকানদারের আশ্রয়ে ছিল, তথায়ই সওদা লইয়াছিল, নতুবা সেই বা থাকিতে দিবে কেন? কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ইহার মালপত্র ত উহাদের দ্বারা কিছুই বিক্রয় হইল না, সুতরাং এ দোকানদার উহাদিগকে নিজদোকানে ২।৩ মিনিট দেরি করিতে দিবে কেন? উহারা যদি আসিয়াই কাণ্ডী বোঝাই আরম্ভ করিত, সে যাহা হয় হইত। তাহা না করিয়া এখানে আসিয়া ভদ্রলোকের মত ২।৩ মিনিট বিলম্ব করিবার উহারা কে? তাহাতে আবার বৃষ্টি হইতেছে, উহারা স্বচ্ছন্দে ২।৩ মিনিটের জন্য বৃষ্টি হইতে মাথা রক্ষা করিতে পাইতেছে, এ অতুলনীয় উপকার পাইবারই বা উহারা কে? এ ব্যাপারের মর্ম্ম কাণ্ডীওয়ালারা তৎক্ষণেই বুঝিয়াছে, বুঝিয়া চুপ করিয়া আছে; অল্পবুদ্ধি আমাদেরই বুঝিতে যাহা-কিছু বিলম্ব হইল। ছেলেদের মুখে শেক্‌সপীয়রের সুদ-খোর ইহুদীর গল্প শুনিয়াছিলাম, আর আজ স্বয়ং স্বচক্ষে পাহাড়ী দোকানদারের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলাম। উনিশ-বিশ বড় নাই!

এই দোকান-ঘরের সম্মুখেই একটা প্রচুর-ফলভরে অবনত সুন্দর আমগাছ দেখিলাম। গাছের নিম্ন দিয়া ১টি ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী খর-স্রোতে বহিয়া যাইতেছে, জলের কোন কষ্ট নাই, ময়দানেরও কষ্ট নাই। অসুন্দর কিছুই দেখিলাম না। কিন্তু দোকানদারের পশু ব্যবহারে সবই অসুন্দর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমরা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া উপস্থিত মনের ভার লাঘব করিলাম।

অর্দ্ধপথে বৃষ্টির লাঘব হইল। আমরা শুকদেব-চটীনামক এক চটী প্রাপ্ত হইলাম। চটী পাইবার কিছু অগ্রেই পথের ধারে ১টী সুন্দর প্রশস্ত

গুহা দেখিয়াছিলাম। ১টী সাধু তথায় বাস করেন। আমরা সাধুর আর উপদ্রব না জন্মাইয়া আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আরও ৩ মাইল আসিয়া ত্রিকূট নামক স্থানে এক গৃহস্থের গৃহে ১টী সুন্দর সতেজ তুলসীর গাছ এতদিন প্রবাসের পর এই প্রথম অবলোকন করিলাম। ক্রমে আমাদের অদ্য ৭৷৷০ মাইল পথ অতিক্রম করা হইল। আমরা পার্ব্বত্য গড়োয়াল রাজ্যের শ্রীস্বরূপ শ্রীনগরে উপস্থিত হইলাম। পথে আসিতে আসিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ধর্ম্মশালা পাইলে কোন দোকানদারের আশ্রয় কখনও গ্রহণ করিব না। ঈশ্বরেচ্ছায় এখানে আসিয়া গঙ্গার ধারেই বাবা কালী-কম্‌লীওয়ালা মহাত্মার রাজ-অট্টালিকার ন্যায় এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা প্রাপ্ত হইলাম। তথায় দ্বিতলে এক মনোনীত প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়া নির্ব্বিরোধে নিরাতঙ্কে সুখ-স্বচ্ছন্দে সেদিন সেইখানে যাপন করিলাম।

——o——

শ্রীনগর।

শ্রীনগর বহুকাল হইতে গড়োয়াল-রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৮০৩ সালে দুর্দ্ধর্ষ গোর্খাগণ এইরাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক জয় করে ও প্রায় ১২ বৎসরকাল এখানে রাজত্ব করে। পরাজিত গড়োয়াল-রাজ সুদর্শনশাহ রাজ্য পুনরধিকারের জন্য ইংরেজ-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরেজ-রাজ তাহাতে সম্মত হইলে ১৮১৪ সালে গোর্খাদিগের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐযুদ্ধে ইংরেজরাজ বিজয়ী হইলে রাজা সুদর্শনসাহ নিজরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু ইংরেজ-কৃত উপকারের নিষ্ক্রয়-স্বরূপ তাঁহাকে নিজরাজ্য দুই তুল্যাংশে বিভক্ত করিয়া অলকনন্দার পূর্ব্বাংশ ইংরেজ-সরকারকে দিতে হয়। তৎসূত্রে শ্রীনগর ইংরেজ-অধিকারে আইসে। রাজা পূর্ব্ব হইতেই শ্রীনগর ত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীনগর

হইতে ৩২ মাইল উত্তর-পশ্চিম টিহরী নামক স্থানটী নদী ও পর্ব্বতে সুরক্ষিত এবং মনোনীত বোধ করিয়া তথায় নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রীনগরের প্রাচীন রাজ-অট্টালিকা এখন ইষ্টক-পাষাণময় ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়া আছে।

বৃটিশ্‌গড়োয়াল রাজ্যে শ্রীনগরই প্রধান সহর। তবে এখানকার সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা কমিশনর-বাহাদুর এখানে থাকেন না। এখান হইতে ৬ মাইল দূরে পর্ব্বতের উপর পাউড়ি-নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। তাঁহার সহকারী সাহেব ও তহশিলদার এবং জজ্‌সাহেবও ঐস্থানে থাকেন।

গোর্খাদিগের অত্যাচারে শ্রীনগর প্রথম শ্রীভ্রষ্ট হয়। পরে ইংরেজ অধিকারে আসিয়াও ১৭।১৮ বৎসর হইল, এক দৈব উপদ্রবে অর্থাৎ পর্ব্বত-পাতে অবরুদ্ধ বিরহীগঙ্গার বিশাল জলরাশির আকস্মিক প্লাবনে যেরূপ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়, তাহা ইতি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কেবল কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির ঐ দুর্ঘটনায় রক্ষা পায়। ঐ ঘটনার পর হইতে নিয়ত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পূর্ব্বক্ষতি পূরণ হইয়া এক্ষণে নগরের বর্ত্তমান শোভাসম্পদ দর্শনযোগ্য অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে।

নূতন শ্রীনগরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াই কিন্তু আমরা বিমোহিত হইলাম। এতদিন পর্য্যন্ত এরূপ রমণীয় ও প্রশস্ত পার্ব্বত্যনগর আমরা দেখি নাই। নিরন্তর পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অন্তত্র ভয় ও উদ্বেগেরই সঞ্চার করিয়াছে। এখানে সেই পর্ব্বত যেন নগর প্রান্তবর্ত্তী প্রাচীরের মত তফাতে থাকিয়া নগরের শোভাসম্পাদনার্থ দণ্ডায়মান আছে। বাজার বৃহৎ, তাহার মধ্যে দিয়া সুন্দর প্রশস্ত রাস্তা পর্ব্বতশূন্য সমতল দেশের রাজধানীর রাজপথ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এতখানি সমতল স্থানও কোন পার্ব্বত্য নগরে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই সমতল স্থানের উপর, পুলিশ, পোষ্ট-আপিস্‌, টেলিগ্রাফ-আপিস্‌, হস্‌পিটাল, ছাপাখানা,

ধর্ম্মশালা, দেব-মন্দির, ফল-ফুলের উদ্যান সকলই কেমন সুসন্নিবিষ্ট বোধ হইল! এখানে রাজ-রাজেশ্বরী, মহিষমর্দ্দিনী, কংসমর্দ্দিনী, গৌরী ও চামুণ্ডার ৬টী সিদ্ধ-পীঠ আছে। এবং শিলাময় শ্রীযন্ত্রের অধিষ্ঠান আছে বলিয়া প্রাচীন কাল হইতে এই নগর শ্রীনগর নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

---o---

ভিল্ল-কেদার।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে শ্রীনগরপর্য্যন্ত পহুঁছিয়া দিবার চুক্তিতে আমরা দুইজন কাণ্ডীওয়ালা নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তাহাদের সময় পূর্ণ হওয়ায় আমরা তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছি ও শ্রীনগর হইতে হৃষীকেশ-রোড ষ্টেশন পহুঁছাইয়া দিবার চুক্তিতে আবার নূতন কাণ্ডীওয়ালা নিযুক্ত করিয়াছি। এই কাণ্ডীওয়ালা অতি ধীরগামী। তাহাকে সঙ্গে লইয়া অদ্য (৫ই আষাঢ়) তিন মাইলমাত্র পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ভিল্ল-কেদার চটীতে উপস্থিত হইয়া তথায়ই মধ্যাহ্নক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইল। গঙ্গার দুর্জ্জয় প্রবাহ প্রাচীন ভিল্ল-কেদার চটীকে গ্রাস করিয়াছে, কেবল ভিল্লেশ্বর মহাদেব ও সমীপবর্ত্তী একটী প্রবীণ জামগাছ সে উপদ্রবে রক্ষা পাইয়াছে।

মহাদেবের বর্ত্তমান মন্দিরটী নূতন, ঐ মন্দিরের সম্মুখে মূলে-প্রস্তরের বেদি-বাধান একটী অশ্বত্থগাছ এবং ঐ বেদির উপর মহাদেবের নূতন-নির্ম্মিত সুন্দর একটী বৃষ বর্ত্তমান। মন্দিরের নিম্নে বাঁধান ঘাট, তথায় খাণ্ডব-গঙ্গা দক্ষিণদিক্ হইতে আসিয়া অলকনন্দায় মিশিয়াছে। কিঞ্চিৎ উত্তরে উপর হইতে মার্কণ্ডেয়-গঙ্গা আসিয়া অলকনন্দায় পড়িতেছে। স্থানটী বর্ত্তমান ভগ্নদশাতেও মনোরম। নদীসঙ্গম-স্থানের এইরূপ দশাই ত সম্ভাবিত, এরূপ না হইলেই যেন মনোরম দেখায় না। প্রকৃতির প্রতাপ বা বিভূতি ব্যক্ত হইলেই সুন্দর হয়। আমরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সঙ্গম-

স্থানে উপস্থিত হইলাম। মার্কণ্ডেয়-গঙ্গার স্রোত তেমন ভয়াবহ নহে, তাহার প্রবাহে অর্দ্ধমগ্ন পাষাণখণ্ডের উপর বসিয়া ভয়মিশ্রিত আনন্দের সহিত স্নান করিতে কতই তৃপ্তিবোধ হইল! কমণ্ডলু ভরিয়া সঙ্গমের জল আনিয়া, অঞ্জলি ভরিয়া বিল্বপত্র দিয়া, প্রাণ ভরিয়া ভিল্লেশ্বর-মহাদেবের পূজা করিতেই বা কত আনন্দ বোধ হইল! আর পূজা করিতে করিতেই বা কত কথা মনে পড়িতে লাগিল! সে সকল কথা হিন্দু-সন্তানেরা প্রায়ই অবগত আছেন। অবগত আছেন যে, শত্রুনির্জ্জিত মহাবীর অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র-সমরে জয়লাভ কামনায় মহাদেবের কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিয়ৎকাল পরে সেই তপস্যার কঠোরতা অর্জ্জুনের সহ্য হইলেও আশুতোষের আর তাহা সহ্য হইল না। তিনি সেই তাপস-বীরের তপঃক্লেশ অচিরে দূর করিতে উদ্‌যোগ করিলেন। অর্জ্জুনের যোগ্যতা পরীক্ষার্থ বা যোগ্যতা-প্রচারার্থ নিজে কিরাতবেশ ধারণপূর্ব্বক নিজের ও অর্জ্জুনের, উভয়েরই লক্ষিত ও তদ্দণ্ডেই শর-প্রহারে নিপাতিত একটী বরাহ উপলক্ষ্য করিয়া ছল-বিবাদ উত্থাপন করিলেন; পশ্চাৎ সেই বিবাদ ও তন্মূলক যুদ্ধে অর্জ্জুনের অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ হইলে তাঁহাকে শত্রুঞ্জয় পাশুপত অস্ত্র দান করিলেন। তাহারই বর্ত্তমান শেষ নিদর্শন এই ভিল্লেশ্বর মহাদেব। নব্য শিক্ষিত হিন্দু এ সকল কথা না জানিলেও মহাভারতপাঠী সাধারণ হিন্দুসন্তান অবশ্য এ সকল বৃত্তান্ত জানেন। মহাভারতোক্ত এই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই মহাকবি ভারবি তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয়-নামক অতুল্য-অর্থগাম্ভীর্য্যপূর্ণ অবিনশ্বর মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। আহা এ কাব্যের বিষয়ও যেমন উদাত্ত, ইহার এই ক্ষেত্রও বোধ হয় তাহারই ঠিক্ উপযুক্ত!

এই ভিল্লেশ্বর মহাদেবের মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ কেদারনাথ-মহাদেবেরই অনুরূপ। বৈকালে আমরা এই স্থান ত্যাগ করিলাম।

পাঁচ মাইল পরে যে চটী পাওয়া গেল, তাহার নাম রামপুর। তথায়

জলের তেমন সুবিধা বোধ না হওয়ায় আর দুই মাইল অগ্রসর হইয়া সায়াহ্নে আমরা রাণীবাগ নামক চটীতে পঁহুছিলাম। এখানে একটী ধর্ম্ম-শালা আছে, দুইখানি দোকানও আছে, সাধারণ জিনিষ-পত্র মিলে, অধিকন্তু জলের কোন অসুবিধা নাই। আমাদের তথায় রাত্রিবাসে কোন কষ্ট হইল না। বরং জলের সুবিধা থাকায় প্রভাতে আমরা এখানেই স্নান পূজাদি সারিয়া রওনা হইলাম।

—o—
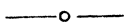
৬ই আষাঢ়।

অদ্য পাঁচ মাইলের মধ্যে চটী নাই, ঠিক্ পাঁচ মাইলে এক সাধুর আশ্রম আছে। আশ্রমটী সুন্দর; সুন্দর ঝরণা, সতেজ কলা-বাগান, পবিত্র একটী দেব-মন্দির এবং পার্শ্বেই উন্নত পাহাড়। পাহাড় যেন নিজ ক্রোড়ে এইগুলিকে স্থান দিয়া রাখিয়াছে; সবই সুন্দর, কিন্তু সাধু অদ্য আশ্রমে উপস্থিত নাই; অধিকন্তু, আমাদের নূতন কাণ্ডীওয়ালার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সে অতি মন্থর-গামী। পূর্ব্ব-চটী রাণীবাগে চাউল, ডাইল সংগ্রহ করিয়া উহার কাণ্ডীতে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মধ্যাহ্নেও সে পঁহুছিল না। অগত্যা আমাদিগকে সেই প্রখর মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে প্রখরতর ক্ষুধাতৃষ্ণায় আরও তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দেবপ্রয়াগ পঁহুছিতে হইল।

—o—
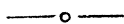
দেব-প্রয়াগ।

দেবপ্রয়াগ উত্তম স্থান ও মহাতীর্থ। উত্তর হইতে মাতা ভাগীরথী অশ্রান্ত অধীরগমনে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, আর পশ্চিমভাগ দিয়া প্রবল-প্রবাহে আনন্দময়ী অলকনন্দা আসিয়া এখানে পঁহুছিয়াছেন। আর ইতিপূর্ব্বে মন্দাকিনী ত রুদ্রপ্রয়াগেই অলকনন্দার অঙ্গে অঙ্গ

চালিয়াছেন। উপস্থিত গঙ্গা-অলকনন্দার ভেদ এখানে লুপ্ত হইয়াছে। এমন দেবনদী-সঙ্গমস্থান মহাতীর্থ হইবেনা ত কোথায় হইবে?

সঙ্গমস্থানে যাইবার জন্য অলকনন্দার উপর সুদৃঢ় পুল আছে। এত দিন আমরা অলকনন্দার পূর্ব্ব ধারে ধারে ইংরেজ-অধিকার দিয়াই আসিতেছিলাম। অদ্য পুল পার হইয়া টিহরী-মহারাজের অধিকারে সঙ্গমস্থানে উপস্থিত হইলাম। এই পারেই সমস্ত পাণ্ডাগণের বাড়ী। পাণ্ডারা উপস্থিত থাকিয়া তীর্থকৃত্য করাইতেছেন। ঘাটে একে একে অবতীর্ণ হইয়া যাত্রীরা সাবধানে স্নান করিতেছেন। বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়াছে দেখিলাম। এখানে স্নান-তর্পণ, পিণ্ডদান এবং অন্ন জল-বস্ত্রদান ভিন্ন মুণ্ডনও অনেকে করিতেছেন। প্রয়াগে এ সকলই কর্ত্তব্য। এই সকলের পর বহু সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া খুব উচ্চে উঠিয়া রামচন্দ্রের মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দিরটী অতি প্রাচীন। তন্মধ্যে রাম-জানকী ও লক্ষ্মণ ঠাকুরের মূর্ত্তি আছে।

অনেকে এখান হইতেই টিহরির পথ ধরিয়া গঙ্গোত্তরী, যমুনোত্তরী ও কেদার দর্শনপূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে যান। কেহ বা ঐ সমস্ত দর্শন ত্যাগ করিয়া এখান হইতে বরাবর পূর্ব্বপারস্থ সিধা সড়কে বদরীনারায়ণ পঁহুছেন। বদরিকাশ্রমের পাণ্ডাগণের এখানেই নিবাস, তাঁহারা এখানেই ঐ সমস্ত যাত্রীর নাম-ধামাদি নিজ খাতাভুক্ত করিয়া লয়েন।

সাধুগণের মুখে শুনিয়াছি,বদরী-নারায়ণের পাণ্ডারা প্রথমে হরিদ্বারেই বাস করিতেন। পরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া দেবপ্রয়াগে বাস করান। তিনি এই বলিয়া উৎসাহিত করেন যে, তীর্থযাত্রা ক্রমে বেশী হইবে এবং তীর্থযাত্রীদিগের প্রদত্ত সাহায্যেই তোমাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হইবে। বাস্তবিক এক্ষণে তাহাই হইয়াছে। মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্‌বাণী সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। তীর্থযাত্রী দিন দিন বেশী হইয়াছে ও হইতেছে এবং তাহাদের অর্থে পাণ্ডাগণ এখানে সুন্দর

সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে পাণ্ডা-পল্লীতে স্থান অতি অল্প। সেই অল্পস্থানের মধ্যেই কয়েক শত পাণ্ডার ঘর-বাড়ী, মন্দির, বাজার, রাস্তা প্রভৃতি। উপায় কি আছে? স্থানের অত্যন্ত অভাব। এমন কি, পাহাড়ের ঢালুতে ঐ বাড়ীগুলি দেখিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল যে কোন্‌দিন সে গুলি স্খলিত হইয়া অলকনন্দার গর্ভগত হইবে!

দেবপ্রয়াগের প্রকৃত বাজার ও জাঁকজমক অলকনন্দার পূর্ব্বপারবর্ত্তী অংশে। তথায় অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া লম্বা বাজার, তাহাতে অসংখ্য দোকান। সকল রকম খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে মিলে। মুসলমানের জুতার দোকান ও মুসলমান খচ্চরওয়ালাও এখানে আছে। তদ্‌ভিন্ন, থানা, পোষ্ট আপিস্, মদের দোকান কিছুরই এখানে ক্রটি নাই। কাণ্ডি, ঝাম্পানও এখানে যথেষ্ট মিলে। নদীর উভয়তীরে স্থানও অতিসুন্দর। ফলতঃ যতগুলি পার্ব্বত্যনগর গড়োয়াল অঞ্চলে দেখিতে দেখিতে আসিলাম, তন্মধ্যে শ্রীনগরের নীচেই এই নগর বলিয়া আমার বোধ হইল।

এখানে আসিয়া আমরা যথায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, অলকনন্দার ঠিক্ উপরে, বিশাল বট-ছায়ায়, বাবা কালীকম্‌লীওয়ালার সেই প্রশস্ত ধর্ম্মশালাটীরই বা কি সুন্দর সংস্থান! ধর্ম্মশালার যেমন প্রকাণ্ড অট্টালিকা, তেমনি সুন্দর বন্দোবস্ত। যেমন খাদ্যদ্রব্যের সদাব্রত, তেমনি পীড়িত যাত্রীর আরোগ্যকল্পে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণের সুব্যবস্থা! সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের প্রান্তে অলকনন্দার তটের দিকে কেমন ফুলগাছগুলির সন্নিবেশ! কেবল অলকনন্দায় অবতরণের পাকা ঘাটটী অভগ্ন থাকিলেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। কিন্তু সে উন্মত্ত প্রবাহের সংস্পর্শে মানুষের কীর্ত্তি দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা কি? যাহাহউক, ধর্ম্মশালার দ্বিতলে খোলা বারান্দায়, বটবৃক্ষের ঘন-বিশাল শাখা-পল্লবের ছায়াময় স্নিগ্ধক্রোড়ে, অলকনন্দার শীতল সুপবিত্র পবন-হিল্লোলে দুইদিন বড়

সুখ-স্বচ্ছন্দেই কাটাইলাম। দুইদিন কেন, বোধহয় চিরদিন এমন নিভৃত-নিরুপদ্রব আশ্রমে যাপন করিলেও মনে অশান্তি কি উদ্বেগের উদয় হয় না। কেন হইবে? এ উন্মুক্ত উন্নত স্থানে পবিত্র পবনের অবাধ-সঞ্চারে কোন কাতরতা নাই, নিম্নে নিত্য-পূর্ণা অলকনন্দার অনন্ত প্রবাহ-বিস্তারে কোন কৃপণতা নাই, প্রমত্ত প্রবাহের বিপুল কলনাদে কখনও ক্লান্তি নাই, উভয়তটোত্থিত বিশাল-কায় পর্ব্বতমালার চির-প্রসারিত ভীষণ-রমণীয় দৃশ্যের সীমা বা সঙ্কোচ নাই, দূরে সমীপে, পার্শ্বে পশ্চাতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ উন্নত-অবনত নানাজাতীয় তরু-লতার বিরলতা নাই। কিসের অভাব আছে যে তাহার জন্য অন্তঃকরণে আকুলতা উপস্থিত হইবে? আর যদি বিষয়-বাসনার সঙ্কোচ হইয়া থাকে, আর তাহার স্থানে ভগবৎ-প্রেমের সঞ্চার ও প্রসার হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত এ আনন্দময় দেশের আর দ্বিতীয়ই নাই!

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ বোধ হয় নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য বা একেবারে অপ্রাপ্য। তাই এমন স্থানেও ক্রমে ক্রমে কয়েকটী অসুখের কারণ ঘটিয়া উঠিল। প্রথমতঃ আমাদের বর্ত্তমান কাণ্ডী-ওয়ালার জ্বর হওয়ায় সে কহিল, আমি আর আপনাদের সঙ্গে যাইতে পারিব না। না পার উত্তম, আমরা অন্য কাণ্ডী-ওয়ালা চেষ্টা করিয়া দেখিতেছি। অন্য কাণ্ডী-ওয়ালা চেষ্টা করিয়া যাহা মিলিল, তাহারা সকলেই উপরে যাইতে প্রস্তুত, গরমের ভয়ে নীচে কেহই যাইতে চাহে না। ঠিকাদারের নিকটে গিয়া তাহাকে অনেক বাড়াইয়া কাণ্ডীর জন্য জানাইলাম। ঠিকাদারজী কহিলেন, কি করিব বাবুজী, এই দেখুন এই আমার সম্মুখে যতগুলি লোক বসিয়া আছে, সবই কাণ্ডীওয়ালা। কিন্তু নীচে যাইতে কেহই রাজী নহে, উপরে যাইতে সকলেই প্রস্তুত আছে। তথা হইতে ফিরিয়া এক মুসলমান খচ্চরওয়ালার নিকট উপস্থিত হইলাম। শেখজী কহিলেন, ১৩৲ টাকার কম তুমি খচ্চর কিছুতেই পাইতেছ না। বহুত

আচ্ছা, কিন্তু অত অধিক মূল্যে আমিও সহসা সম্মত হইতে কিছুতেই পারিতেছি না। এইরূপে কিছুতেই স্থির হয় না, অথচ কাল-বিলম্ব হইতে লাগিল।

ইহার উপর এমন আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল, যাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করা নিতান্ত লজ্জাকর ও ঘৃণাজনক। স্থূল বৃত্তান্ত এই, এই ধর্ম্মশালারই দ্বিতলে, অদ্য ৭ই আষাঢ় তারিখের বোধ হয় শেষ রাত্রিতে আমাদিগের কতকগুলি জিনিষপত্র চুরি গেল। এখানেই দুই তিন দিনের পরিচিত, এক-বারান্দার অধিবাসী, গেরুয়াবেশী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকর্ত্তৃক ঐ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ঐ ভণ্ডবেশী কোন্ দেশীয় বা কোন্ জাতীয়, তাহাও আমি লিখিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষের—সিদ্ধ পুরুষের বহু জপের মালা, তাঁহার নিত্য-হোমের রৌপ্যময় চমস, হোমীয় ঘৃত রাখিবার রৌপ্যপাত্র, এ সকল স্মরণীয় বস্তুর অপহরণ সামান্য কষ্টের কথা নহে। আমার নিত্য-ব্যবহার্য্য সোণার চস্‌মা হারানতেও আমার তত কষ্ট বোধ হয় নাই। আর সাধুবেশধারী দ্বারা এরূপ ঘৃণাজনক কার্য্য হওয়াও সাধারণ কষ্টের বিষয় নহে। হায়, এ পবিত্র বেশ দেখিয়াও কি আমরা প্রাণমনে ভক্তি ও বিশ্বাস উপহার দিতে অতঃপর ইতস্ততঃ করিব? বিভীষণ এইরূপ মনঃক্ষোভে অভিভূত হইয়াই বড় কষ্টে জ্যেষ্ঠসহোদর রাজা দশাননকে কহিয়াছিলেন—

> ব্যাধা ন ধাবন্তি মৃগানিদানীং
> জনা জনানাহ্বয়তো ন যান্তি।
> ভিক্ষাং প্রযচ্ছন্তি ন যোষিতোঽপি
> কর্ম্মাণি তে মর্ম্ম বিদারয়ন্তি॥

ভাবার্থ এই,—লঙ্কানাথ, আপনি অনুগত কিঙ্করদ্বারা মায়ামৃগের ছল বিস্তার ও স্বয়ং যোগিবেশ ধারণ করিয়া, সতীসাধ্বী পরনারী হরণপূর্ব্বক

কি উৎকট কুকার্য্যই করিয়াছেন! এই ব্যাপারে আপনার প্রত্যেক কর্ম্ম আমার মর্ম্ম বিদীর্ণ করিতেছে! দেখুন, ব্যাধগণ—মৃগবধ যাহাদের উপজীবিকা, সম্প্রতি আর মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইতে সাহস পাইতেছে না; মায়া-মৃগ ত ঐরূপই পশ্চাদ্ধাবনকারী রামচন্দ্রের নিকট উৎকট রাক্ষস-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়াছে! লোকে বিপন্ন হইয়া কাতরে আহ্বান করিলে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে আর কেহ এখন সাহস পাইতেছে না; কেননা, মায়া-মৃগ ত ঐরূপ রামচন্দ্রের স্বরের অনুকরণে লক্ষ্মণকে দূরবর্ত্তী করিয়া জানকী-হরণ ঘটাইয়াছে! আর স্বভাব-সদয়া সহজধর্ম্মশীলা কুল-মহিলারাও তাহাদের নিত্যকর্ম্ম ভিক্ষুকের ভিক্ষাদানে দ্বার-সন্নিধানে আসিতে আর সাহসী হইতেছে না; কেননা, জানকীরও ত ঐরূপ যোগিবেশী ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিতে দ্বারের বাহির হইয়াই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে! দেখুন, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় কদনুষ্ঠান আর কি হইতে পারে?

৮ই আষাঢ় প্রত্যুষে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমরা সত্বর সত্বর প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সারিয়া আহ্নিক করিতে বসিলাম। অদ্য এখান হইতে রওনার একটা উপায় করা চাইই, ইহাই অভিপ্রায়। আহ্নিকে বসিয়া মালার ঝুলি খুলিয়াই দেখি, সর্ব্বনাশ, দরিদ্রের ঝুলির সঞ্চিত সর্ব্বস্ব গিয়াছে! হায় উহার বদলে আমার টাকা-কড়ি লইলে ত আমার এত কষ্ট হইত না। তথাপি ভাগ্য, আমার শিবটী লয় নাই। শিবকে মেজেয় বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। তা ত রাখিবেই; শিবে যাহার কাজ, সে এ সকল কাজ করিবে কেন?

তৃতীয়া শ্রীমতী কহিলেন, আমার গরদের কাপড়খানিও গিয়াছে। দ্বিতীয়া কহিলেন তোমরা একবারে অজ্ঞান হইয়া ঘুমাও, খুব ভোরে যখন তাহার হিন্দুস্থানী সঙ্গীরা ভৈরবী-মায়ী ভৈরবী-মায়ী বলিয়া তাহাকে জাগাইতেছিল, তখনি তোমরা উঠিয়া দেখিলেই সব ধরা পড়িত।

প্রথমা বলিলেন, আহা, তবে ত তুমি সবই বুঝিয়াছ! সে সঙ্গীদের ফেলিয়া শেষ রাত্রিতেই পলাইয়াছে। সঙ্গীরা অন্য দিনের মত তাহাকে জাগাইবার জন্য ডাকাডাকি করিতেছিল; শেষে তাহাকে না দেখিয়া কত কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, বুঝিতে পার নাই? পথের দুদিনের সঙ্গী, তার আর খাতির কি? বিশেষ, সে চুরি করিবে, তা উহাদিগকে জাগাইবে কেন? তাহাতে আমরা যদি জাগিয়া উঠি? নতুবা ভোরের ডাকাডাকি ত আমিও শুনিয়াছি।

তৃতীয়া কহিলেন, ভোরের ডাকাডাকিতে ত আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিলেও তখনি ওঠা আমার অভ্যাস নাই, এই একটা দোষ! কিন্তু তখন উঠিয়া আর কি করিতাম!

স্থূল কথা, প্রথমা শ্রীমতীর অনুমানই যথার্থ। আর তাঁহারই কাছে আমাদের সকলের টাকা-কড়ি ছিল, সেও এক মঙ্গল। নতুবা অর্থাভাবে সকলকেই চক্ষুঃ স্থির করিতে হইত।

আমাদের বাসার নিকটেই থানা ছিল। তথায় চুরির ব্যাপার সমস্ত জানাইয়াছিলাম, কোন ফল হয় নাই।

পশ্চাৎ-উপস্থিত এক যাত্রীর মুখে শুনিলাম যে, আমাদের এই মায়াবিনী রাক্ষসী হৃষীকেশে একটী অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণবয়স্ক পোষ্ট-মাষ্টারকে এইরূপ প্রতারিত করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন করিয়া কয়েকদিন কন্যার সমুচিত যত্নে তথায় থাকিয়া শেষে তাঁহার একটী সোণার ঘড়ি চুরি করিয়া সম্প্রতিই তথা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। হায়, মানুষের কি শোচনীয় পরিণাম!

আমি বলি, কয়েক জন না হয় তাহার ধূর্ত্ততায় কিছু কিছু অর্থেই বঞ্চিত হইল, কিন্তু তাহার যে দুর্লভ মনুষ্য জন্মই বিফলে গেল!

———o———

সৌড় ও অমরচটী।

পরদিন ৯ই আষাঢ় প্রভাতে উপস্থিত মত এক কাণ্ডীওয়ালাকে রায়বালা বা হৃষীকেশরোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত ৯৲ টাকা ভাড়া চুক্তিতে সঙ্গে লইয়া আমরা দেব-প্রয়াগ ত্যাগ করিলাম।

দুই মাইল পরে সৌড় নামে একটী ক্ষুদ্র চটী পাওয়া গেল। এই চটীতে নিবিড়-শাখাপল্লবময়, স্নিগ্ধচ্ছায়াময়, ফলভরাবনত সারি সারি কতকগুলি আমগাছ দেখিয়া বড় আনন্দ বোধ হইল। আরও দুই মাইল গিয়া অমরচটীতে গঙ্গা নিকট দেখিয়া তথায় স্নান-পূজাদি সমস্ত মাধ্যাহ্নিক কাজ সম্পন্ন করিলাম। গঙ্গা ভিন্ন ঝরণারও এখানে সুবিধা আছে এবং অশ্বত্থ ও আমগাছের ছায়ায় বিশ্রাম-সুখও সুলভ বটে। কিন্তু দেব-প্রয়াগে কয়েক দিন দীর্ঘ বিশ্রাম করিয়া আর শীঘ্র শীঘ্র বিশ্রামে অনুরাগ নাই। ভোজনান্তে আবার রওনা হইলাম। কয়েক মাইল ধরিয়া পথের পার্শ্বে অজস্র বিল্ববৃক্ষ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। ভাগীরথীকেও এখন অনেকটা বিস্তৃত অবয়বে দেখা গেল। অমরচটী হইতে ক্রমে পাঁচ মাইল আসিয়া ব্যাসঘাটচটীতে আমাদের বিশ্রাম হইল। ইহার এক মাইল পূর্ব্বে বিশ্রামঘাট নামক চটী পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা ভগ্ন চটী মাত্র, তথায় বিশ্রামের উপযুক্ত স্থান নাই।
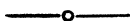
ব্যাসঘাট চটী।

ব্যাসঘাটের ঘাটটী বেশ পড়েন ও প্রশস্ত। গঙ্গায় নামিতে কোন কষ্ট নাই। এ দেশে এরূপ ঘাট বড় দুর্লভ। নিকটেই ব্যাসগঙ্গা আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছেন। ব্যাসগঙ্গার জল যেন গিরিমাটী-গোলা।

এখানে ব্যাসদেবের মন্দির আছে। মন্দির প্রাচীন এবং সংস্কার অভাবে অতি জীর্ণ। এই ব্যাসচটীতে একটী ক্ষুদ্র দোতলা ধর্ম্মশালা আছে। তাহাতে কতই যাত্রী ধরিতে পারে? আমরা ধর্ম্মশালার পরিপূর্ণাবস্থা এক-বার দর্শন করিয়াই তথা হইতে ফিরিলাম। ধর্ম্মশালা ছাড়া এ চটীতে স্থান বিস্তর, অতি বিস্তর দোকান। কিন্তু সবই যাত্রিপূর্ণ। আমরা যে দোকানে আশ্রয় লইলাম, তথায়ও স্থান ছিল না। কিন্তু দোকানের মালিকের প্রবেশের নিষেধ নাই। ঘরে ধরুক আর নাই ধরুক, মালিকের কোন আপত্তি নাই। ঠিক যেন আমাদের দেশের রেলওয়ে কোম্পানির থার্ড ক্লাসের গাড়ী। আমরা সেই বহু যাত্রীর ভিড়ে কোথায় খুসিয়া থাকিলাম, তাহা অন্যে জানা দূরে থাক্, দোকানদারও জানিতে পারিল না। অদ্য রাত্রিতে আমাদের কোন দ্রব্যাদি লইবার প্রয়োজন ছিল না, এই অজ্ঞাত-বাসের জন্য তাহা লইতেও হইলনা।
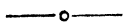
কাণ্ডী-চটী।

১০ই আষাঢ়।

অদ্য প্রভাতেই আমরা ব্যাসগঙ্গার পুল পার হইয়া প্রায় দেড় মাইল চড়াই পাইলাম। আরও আড়াই মাইল আসিয়া কাণ্ডীনামক চটী প্রাপ্ত হইলাম। চটিটী সারি সারি জামগাছ ও বহুসংখ্য ঘন-সন্নিবিষ্ট লেবুগাছ এবং মহানিম ও নিমগাছে সুন্দর ছায়াস্নিগ্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। চটীর দুইধারে স্থূলধার দুইটী ঝরণা থাকায় এখানে জলের জন্য যাত্রীদের কোন কষ্ট নাই। কিন্তু প্রথম ঝরণার জল তেমন মধুর নহে, যেন একটু ক্ষার আস্বাদবিশিষ্ট। ঐ ঝরণার অদূরে একটী সুন্দর পাকা নূতন ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালার মধ্যে ও বাহিরে রাস্তার ধারে

কয়েকখানি বেঞ্চ পাতা আছে, দেখিলাম। বলা বাহুল্য, আমরা ধর্ম্ম-শালাতেই আশ্রয় লইয়া মধ্যাহ্ন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিলাম।

অপরাহ্নে পুনর্ব্বার ভ্রমণ আরম্ভ। কিছুদূর আসিয়া সম্ভালু-নামক একটী চটী পাওয়া গেল। কিন্তু তখনও অনেক বেলা আছে দেখিয়া আরও কতদূর চলিতে ইচ্ছা হইল। এখনকার প্রখর দিনে সায়াহ্নের পূর্ব্ব সময়টী স্বভাবতই ভ্রমণের উপযুক্ত। বিশেষতঃ গঙ্গার ধারে-ধারে তরঙ্গ-ভঙ্গ-রমণীয় গঙ্গার প্রবাহ দর্শন করিতে করিতে কতকগুলি সহ-যাত্রীর একসঙ্গে যাওয়া আরও মনঃপূত বোধ হয়। এক এক স্থানে গঙ্গাগর্ভে প্রবাহ-মধ্যস্থ একখণ্ড কালো পাথরের উপর দিয়া নানারূপ ক্রীড়াভঙ্গিতে তরঙ্গাবলী চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সেইস্থানে কালো পাথরখানির কিছু কিছু অংশ অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হওয়ায় সহসা ক্রীড়াশীল বৃহৎ মৎস্যের পৃষ্ঠ ও পুচ্ছবিবর্ত্তন বলিয়া ভ্রম জন্মিতে লাগিল। সেই ভ্রম মূলক তর্ক-বিতর্কও যে কিছুক্ষণ না চলিয়াছিল, এমন নহে। পথের পার্শ্বে নানা তরুলতার মধ্যে কুটজবৃক্ষের সারি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে-প্রফুল্ল কুসুমরাশিতে দিগন্ত আলোকিত করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া, রামগিরিশৈলে এই প্রথম-আষাঢ়েই কবীশ্বর কালিদাসের "স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ-কুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ" এই স্বভাব-রমণীয় বর্ণনা পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। ফলতঃ অদ্য মধ্যাহ্নের কাণ্ডী-চটীটী যেমন রমণীয়, সেই চটীর পর হইতে অপরাহ্নের এই পথটীও তেমনি রমণীয়। এইরূপ রমণীয়তা-নিবন্ধন অজ্ঞাত-আয়াসে অদ্য অবেলার বহুপথ—৭ মাইল পথ আমরা অতিক্রম করিয়া সায়াহ্নে মহাদেব-চটী প্রাপ্ত হইলাম।

—o—

মহাদেব-চটী।

মহাদেব-চটী ভাগীরথীর অত্যুচ্চ তটের উপর, সুতরাং জলের কোন কষ্ট নাই; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর ছড়ান থাকায় ঘাটের তেমন সুবিধা নাই। পাথর একটু বড় হইলেই ঘাটে ওঠা-নামা ও স্নান-উপবেশনাদির বিশেষ সুবিধা হয়। এ চটীতে দোকান অনেকগুলি, মহাদেবের একটী মন্দির আছে, সুন্দর দুইটী ধর্ম্মশালা ও পোষ্ট আপিস্‌ প্রভৃতি আছে। দুধ প্রভাতে ও সায়ংকালে পাওয়া যায়। ওজনও আশি সিক্কার, ওজন এদেশে সর্ব্বত্রই ঐরূপ থাকি। তবে অন্যত্র দশ পয়সা সের প্রায় পাই নাই, এখানে তাহা পাওয়া গেল। থাকার বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে একটী দোকানদার, এখানে দুইটী ধর্ম্মশালা থাকার জন্যই হউক বা যে জন্যই হউক, আমাদের ডাকিয়া কহিল, আপনারা সওদা কিছু লউন না লউন, স্বচ্ছন্দে আমার দোকানে অবস্থিতি করিতে পারেন। ইহাও হয়ত একরূপ দোকানদারি হইতে পারে। যাহা হউক, এদেশীয়ের পক্ষে এরূপ কথা নূতন শুনিয়া তাহার কথাই রক্ষা করিলাম; উত্তম ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিয়া তাহার সামান্য কুটীরেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তার পর, ভদ্রতার খাতিরেও বটে, প্রয়োজনবশেও বটে, মিষ্টান্নাদিও কিছু কিছু লওয়া হইল। নিম্ন গঙ্গাতটেরই সমীপে, স্থানটী মন্দ নহে। কিন্তু নিকটে কয়েকটী মহিষ বাঁধা ছিল বলিয়া মশার কিছু উপদ্রব হইয়াছিল।

—o—

কুণ্ড-চটী।

১১ই আষাঢ়।

প্রভাতে রওনা হইয়া অনেকটা চড়াই ও অনেকটা তদপেক্ষা বিষম উতরাই অতিক্রম করিতে করিতে তিন মাইলের পর বন্দরচটী প্রাপ্ত

হইলাম। কিন্তু তাহার পর তিন মাইলব্যাপী যে উৎকট চড়াই প্রাপ্ত হইলাম, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। পা পা করিয়া ক্রমাগত হাঁটিতে হাঁটিতে অথবা উঠিতে উঠিতে পুনঃ পুনঃ পদদ্বয় অবসন্ন হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ পিপাসার আক্রমণ গুরু হইতে গুরুতর হইতে লাগিল, পুনঃ পুনঃ বিশ্রামার্থ ছায়া-তরুর আশ্রয়ে ধাবিত হইতে হইল। বহুকষ্টে বহুবিলম্বে বোধ হয় বেলা ১টার সময় আমরা সেই চড়াইয়েরই কয়েক পা নিম্নে, সড়কের একটু বাঁকের তলে কুণ্ড-চটী নামে চটী প্রাপ্ত হইলাম।

কষ্টের কথা লিখিতে লিখিতে একটা আনন্দের কথা লিখিতে ভুল করিতেছিলাম। ঐ উৎকট পথের ধারে ধারে অনেকস্থানে সুন্দর সতেজ শেফালিকা-বৃক্ষের সারি দেখিতে পাইলাম। এতদূর ব্যাপিয়া এত শেফালিকার শ্রেণী, আর এই উৎকট অগম্য পথ! হায় ভগবান্, এই পথের শরৎ কাহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ? সেই সুখ-সৌন্দর্য্যের শরতে—শরতের সন্ধ্যায়, শারদ সুপ্রভাতে, এই অজস্র অফুরন্ত শেফালীর সৌরভ-ভার কোথায় প্রধাবিত হয়, কোথায় মিলাইয়া যায়?

কুণ্ড চটীও ক্ষুদ্র, দ্রব্যাদিও অতি সামান্যই মিলে। চটীতে ৩ খানি মাত্র দোকান, উচ্চ সড়কের নিম্নক্রোড়ে পর পর অবস্থিত। তাহাতেই যাবতীয় যাত্রীর ঠেসাঠেসি। দোকান হইতে খাড়া নিম্নে কিছুদূর নামিলে একটী ঝরণা পাওয়া যায়। ঝরণাটীর নিকটে দাঁড়াইবার সামান্যমাত্র স্থান, তাহার নিম্নেই গভীর খাদ। তাহা এত গভীর যে তথা হইতে গঙ্গা দেখাও যায় না, গঙ্গার সাড়া-শব্দও পাওয়া যায় না। যাহা হউক, আমরা সড়ক হইতে নিম্নে নামিয়া প্রথম-প্রাপ্ত ও অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিস্থ দোকানখানিতে আশ্রয় লইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে চাউল নাই। আটা যদিও আছে, কিন্তু ঘি নাই; আলুর ত কথাই নাই। নীচের দোকানখানিতে অগত্যা ঐ ঐ জিনিষের খোঁজে আসিতে হইল। নীচের দোকানখানিতে জিনিষগুলি সব আছে, কিন্তু দোকান-

দার বলে যে সব জিনিষ আমার কাছে না লইলে আমি কিছুই দিব না, ইহাও এক বিপদ্। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার উপায় সর্ব্বাগ্রে করা আবশ্যক বোধ হওয়ায় অবিলম্বে আমরা আমাদের সমস্ত আসবাব-পত্র উঠাইয়া দ্বিতীয় দোকানখানিতে আশ্রয় লইলাম। এখানিরও সম্মুখে জায়গা-মাত্র নাই, ভিতরেও পত্নী-পুত্র-পৌত্র-ভৃত্যাদিসমন্বিত এক শেঠজীর অবস্থিতি হওয়ায় স্থানের নিতান্ত টানাটানি। তাঁহাদের বিষম চাপে আমাদের পাকশাকেরও বিশেষ কষ্ট হইল। ভোজনাদি সম্পন্ন হইতে বেলা প্রায় অবসান হইল। অসময়ে ভোজন হওয়ায় ও বেলা অপরাহ্ণ হওয়ায় সকল কষ্ট সহ্য করিয়া অদ্য আমাদিগকে এইখানেই থাকিতে হইল।

সুখের মধ্যে এখানকার ঝরণাটীর জল অতি মিষ্ট ও অতি সুশীতল, কিন্তু ধারাটী ক্ষীণ। তাহাও যাত্রীর ভিড়ে বহুবিলম্বে মারামারি করিয়া লইতে হয়। উপায় কি আছে? দোকানের চালাগুলিও রীতিমত লম্বা নয়। যাহা আছে, আরও ২।৪ খানি ঐরূপ হইলে যাত্রীদের কুলান হয়। কিন্তু স্থান নাই বলিয়া তাহার আর উপায় নাই। অগত্যা এ পথে ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

——৯——

বিজনী ও নাই-মুহানা চটী।

১২ই আষাঢ়।

অদ্য প্রভাতে আরও কিছুদূর আমাদের চড়াই চলিল। ঐ চড়াই হইতে গঙ্গা দৃষ্টিপথে পড়িলেন, তাঁহাকে সামান্য পগারের মত বোধ হইতে লাগিল। পর পর ছোটবড় অসংখ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ বড় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। স্নিগ্ধবায়ুসেবিত প্রভাতে স্নিগ্ধ হইয়া আমরা সব আরও সুন্দর দেখিতে লাগিলাম। তার পরেই চড়াই আরম্ভ, উত্থানের পরই পতন আছে কি না! এ পথের আশে পাশে যথেষ্ট বৃক্ষ, সুন্দর ছায়া; অধিকন্তু

বিল্ববৃক্ষের সারি আরম্ভ হইল। এখানে প্রকৃতির যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। ঐ সকল বৃক্ষতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাকা বেল কতই পড়িয়া রহিয়াছে! আমরা ভালমন্দ বাছিয়া কত কুড়াইলাম, কত ছড়াইলাম। তিন মাইল পরে বিজনী চটী পাওয়া গেল। এ বিজন দেশে ইহা কি আরও বিজন ছিল, তাই ইহার ঐরূপ নাম হইয়াছে? যাহা হউক, চটীটী ক্ষুদ্র হইলেও নিবিড় গাছ-পালায় যেন একটী কুঞ্জবন সাজান রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তেমনি প্রশস্ত একটী বেগবান্ নির্ঝর চটীর পার্শ্বেই ঝর্ঝরশব্দে বৃক্ষ-রাজির স্নিগ্ধচ্ছায়াতলে নিরন্তর প্রবহমাণ রহিয়াছে! আর স্থান ত বিজন বটেই। নিতান্ত কম পথ চলা হইয়াছে বলিয়া আমরা এ চটী ত্যাগ করিয়া চলিলাম। কিন্তু ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় আমার মনে হইল যেন সেই কুঞ্জবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ধীরে ম্লানমুখে আমাদিগের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, আর নীরবে ব্যক্ত করিলেন—তোমরা শুষ্ক-হৃদয় পথিক, তোমাদিগের নিকট কি গুণের আদর কিছুমাত্র স্থান পায় না?

আমাদের তাহাই বটে, আমাদের কেবল পথ অতিক্রম! দেখনা কেন, দেখিতে দেখিতে আমাদের তিন মাইল পথ উতরাই হইয়া গেল! আমরা চলিতেই আসিয়াছি, দেখিতে আসি নাই!

এই তিন মাইলের পর আমরা নাই-মুহানা বা মোহন চটী প্রাপ্ত হইলাম। এখানে একটী সুন্দর প্রশস্ত পাকা ধর্ম্মশালা ও দুই তিন খানি দোকান আছে। নিম্নবাহী সড়ক রাস্তার নিম্নেই ঐ দোকান গুলি। পার্শ্বে কয়েকটী বৃক্ষ আছে, তাহার নিম্নেই হিউন বা হিমল নামে ক্ষুদ্র একটী নদী প্রবাহিত। ইহার শাস্ত্রোক্ত নাম হিরণ্যগঙ্গা। ঝরণা নাই, নদীর জলেই সমস্ত কাজ নির্ব্বাহিত হয়। তবে নদীটীর জল তেমন নির্ম্মলও নহে, শীতলও নহে। কাজেই ঝরণার কথা মনে না পড়িয়া যায় না। আমরা এই স্থানেই মধ্যাহ্নের কার্য্য সম্পন্ন করিলাম।

অপরাহ্নে চলিতে আরম্ভ করিয়াই অদূরে পথিমধ্যে একটী ঝরণা পাইলাম। আহা! আগে জানিতে পারিলে এই জল লইয়া গিয়াই পান করিতাম। যাহা হউক, হিউল নদী আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলিল, আর রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রচুর বন থাকায় ছায়াও প্রায়ই মিলিতে লাগিল। কিন্তু উত্তাপের তেমন হ্রাস বোধ হইল না। প্রতিদিন যত আমরা নীচে নামিতেছি, ততই উত্তাপ বেশি বোধ হইতেছে। আরও এক কথা, গঙ্গার ধার দিয়া চলিলে হাওয়াতেও উত্তাপ একটু কম বোধ হয়, কিন্তু আজি হিউল নদী আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, উভয় দিকে অরণ্যাচ্ছাদিত তাঁহার তীর দিয়া চলিতে হওয়ায়, সে ঠাণ্ডাটুকু পাওয়াও বন্ধ হইল। উত্তাপের আধিক্যে পিপাসাও অধিক বোধ হইতে লাগিল। এ নদীর তট উচ্চ নহে, এক স্থানে অবতরণ করিয়া জল পান করিলাম। জল গরম ও দেখিতে গিরিমাটী-গোলা। বোধ হয় নির্ঝর হইতে এ নদীর উৎপত্তি হয় নাই, পর্ব্বতের উপরের বর্ষণ হইতে ইহার ক্ষুদ্র প্রবাহটুকু জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবে। ক্রমে ইহার পুল পার হইয়া গুলর-চটী নামে একটী চটী পাওয়া গেল। তখন বেলা যথেষ্ট আছে, চটীও তেমন উত্তম নহে। এজন্য তথা হইতে বাহির হইয়া পুনর্ব্বার হিউলনদীর বাম ধারে ধারে চলিতে আরম্ভ করিলাম এই স্থান হইতে তরুলতা পল্লব পর্ব্বত-অঙ্গে এত নিবিড়ভাবে জন্মিতে দেখা গেল যে, পর্ব্বতের গাত্র আর কিছুমাত্র লক্ষিত হইতে লাগিল না। অধিকন্তু রাস্তার পার্শ্বে পার্শ্বে সমতল জঙ্গলময় স্থানও অনেক দেখা যাইতে লাগিল, যেন পল্লীগ্রামের রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। স্থানে স্থানে ফলভরে অবনত পাতিলেবুর গাছ ও অন্যজাতীয় বড়-লেবুর গাছও দেখিতে পাইলাম। বোধ হয়, লেবুর ব্যবহার এখানে কেহ করে না। আমরা যোগ্যের অনাদর করিলাম না, এক কোঁচড় পাতিলেবু পাড়িয়া লইলাম। পথিপার্শ্বে একটী প্রশস্ত ও প্রবল শীতল জলের ঝরণা

পাওয়া গেল। মধ্যে একটী অতিক্ষুদ্র চটীও দেখিলাম। তাহাতে তখন কোন যাত্রী আশ্রয় লয় নাই; লইবে কি না, তাহাও বলা যায় না। কেন না বড় দেখিয়াই লোকে আশ্রয় লয়। আরও কিছু দূর আসিতে আসিতে দেখিলাম, ছিউল নদী ক্রমে আমাদের সঙ্গ ছাড়িয়া একটু তফাত দিয়া গঙ্গায় মিশিতে গেল। সেদিকে আর তখন কে লক্ষ্য করে? অনেক ক্ষণ আমরা গঙ্গাকে হারাইয়াছিলাম, গঙ্গার তরঙ্গ গর্জ্জন শব্দেই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী পাকা ধর্ম্মশালা ছিল, আমরা সেদিকেও লক্ষ্য না করিয়া গঙ্গার তীরে ফুলবাড়ী-চটীর চালা-ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলাম। গ্রীষ্মের সায়াহ্নে, গঙ্গার তীরে, গঙ্গার তরঙ্গ-সঙ্গত পবিত্র পবনের হিল্লোলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আশ্রয় পাইলে, একটু তফাতের সৌধ-শিখরে যাইতেও আর ইচ্ছা হয় না। বিশেষতঃ আমাদের মত ক্লান্ত পথিকের পক্ষে সে স্থানের সে খোলা চালাখানিরই বা আদর কত? চটীর ধারে ধারে সারি সারি কয়েকটী অশ্বত্থ গাছ আছে, তাহাই বা কত সুন্দর বোধ হইতে লাগিল! তাহার নীচেই ক্রম-নিম্ন ক্ষুদ্র বালুকাচরের প্রান্তে গঙ্গার প্রবাহ, আমরা চটীর দোচালায় বসিয়া কত তৃপ্তির সহিত তাহা দেখিতে লাগিলাম! গঙ্গার পারে তট হইতেই উত্থিত ধনুরাকার পর্ব্বতটী দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন পক্ষিরাজ গরুড় বিশাল পক্ষদ্বয় দুই পার্শ্বে প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছেন! আমরা আর কাল অতিক্রম না করিয়া সন্ধ্যা করিতে ঘাটে নামিলাম। নামিবার পথে কতকগুলি গড়ানকাঠ চেরাই হইয়া শ্রেণীচ্যুত অবস্থায় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পরই বাঙ্গালাদেশের গঙ্গার ঘাটের মত বালুকাময় প্রশস্ত ঘাট, তরঙ্গশ্রেণী তথায় মুহুর্মুহুঃ আস্ফালন করিয়া পড়িতেছে! আহা কি সুন্দর, কি পবিত্র! তাহার অদূরে, ঘাটের পার্শ্বে বড় বড় পাথর উচ্চ-নীচ অসমভাবে অশ্রেণীবদ্ধ-রূপে

ছড়াইয়া পড়িয়া পার্ব্বত্য দেশের পরিচয় সূচনা করিতেছে। আমি সাবধান হইয়াও নির্ব্বিঘ্নে বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতে পারিলাম না, মুহুর্মুহুঃ তরঙ্গের আস্ফালন ও উৎক্ষেপে বস্ত্রাদি অনেকাংশে ভিজিয়া গেল। তা যাউক, পার্ব্বত্য প্রদেশের এমন রমণীয় গঙ্গার ঘাট অনেক দিন পাই নাই। সকল রকমে বড় আনন্দে ফুলবাড়ী-চটীতে সে রাত্রি অতিবাহন করিলাম।

১৩ই আষাঢ়।

অদ্য প্রভাতে গঙ্গার ধারে ধারে সুখে চলিয়াছি। কিছুক্ষণ পরে কঙ্করশূন্য বালুকাময় আরামের রাস্তা প্রাপ্ত হইলাম। ক্রমে বালুকা একটু বেশি-বেশি হইল। আর পায় কে? আদরিণী বালিকার মত সে বালুকারাশির আব্‌দার কত? পা ডুবাইয়া ধরিল, কিছুতেই শীঘ্র যাইতে দিবে না। কাজ আছে, শীঘ্র পা উঠাইতে চাই, কে শোনে? কিছুতেই পা ছাড়িয়া দিবে না। এখান হইতে উঠাইলাম ত ওখানে জড়াইয়া ধরিবে! এ পা ছাড়াইলাম ত ও পায়ে ধরিবে। কি উপায়? ধীরে ধীরে তাহাদের অনুগত হইয়াই কিছুদুর চলিয়া তাহাদিগকে ছাড়াইতে হইল। কোমলতারই বন্ধন বেশি কি না!

তার পর এ পথের দৃশ্যগুলির আকর্ষণের কথা বলি। এখন যতই অগ্রসর হই, স্থানে স্থানে একবারেই নিরন্তর বিল্বকানন, কোথাও বা শুদ্ধ আমলকীরই নিবিড় বন! আর অজ্ঞাত অশ্রুত সতেজ-সমুন্নত নানাজাতি বৃক্ষ-লতার ত কথাই নাই; পথের দুই পার্শ্বে গৌরবিণী লতা কোথাও তরু-শীর্ষে মাল্য ঝুলাইয়া, কোথাও নিবিড় আচ্ছাদনে তরুর মস্তকে ক্রীড়াবগুণ্ঠন রচিয়া, কোথাও নিবিড় আলিঙ্গনে তাহার প্রতি-অঙ্গ দৃঢ়-নিবদ্ধ করিয়া, কোথাও কায়-বিস্তারে কুঞ্জবন সাজাইয়া, কোথাও কঠোর পাষাণখণ্ড কোমল পুষ্প-পল্লবের কোমল ক্রোড়ে

লুকাইয়া, কোথাও কন্দরামুখ আদরের অঞ্চলে আচ্ছাদিয়া, গাঢ় হরিত বর্ণে দিগন্ত ভরিয়া রাখিয়াছে, শান্তির সহিত স্নিগ্ধতা ঢালিয়া রাখিয়াছে, পবিত্রতার সহিত রমণীয়তা ছড়াইয়া রাখিয়াছে! এখন কোথায় যাইবে যাও! এ দৃশ্য ছাড়িয়া কি চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয়, না পা বাড়াইতে ইচ্ছা হয়? ফলতঃ হিমগিরির এই সকল আরম্ভ-ভাগ, সেই দুর্গম দেশে প্রবেশের এই তোরণদ্বার সর্ব্বপ্রকার সৌন্দর্য্য-সম্পদে বিভূষিত, ইহা ছাড়িয়া যাইতে প্রকৃতই প্রাণে আকুলতা উপস্থিত হয়।

তার পর ক্রমে প্রশস্ত পথ, বাড়ী-ঘর, বাজার, থানা, ডাকঘর, ধর্ম্ম-শালা, দলে দলে যাত্রী, পালে পালে গবাশ্বাদি পশু দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সম্মুখে গঙ্গার উপর বিশাল ও সুদৃঢ় লৌহ-সেতু দেখিয়া জিজ্ঞাসিলাম, ইহা কোথাকার সেতু? কয়েকটী বাঙ্গালী বাবু এই পর্য্যন্ত বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, জানেন না? ইহা লছমন-ঝোলা।
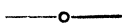
লছমন-ঝোলা।

ইহাই লছমন-ঝোলা? প্রশস্ত গঙ্গার উপর সেই ভয়াবহ ঝোলার নাম ত বরাবর শুনিয়া আসিতেছি। লছমন-ঝোলা নামের সহিত প্রবল বিভীষিকা এখনও জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহারই এই মূর্ত্তি? ইহা ত অতি সুদৃঢ়, সুখগম্য লৌহ-সেতু! ভাল, ভাল, সেতু তুমি প্রাচীন নাম লইয়া নব-কলেবরে চিরস্থায়ী হও, লোকের তীর্থযাত্রার কণ্টক দূর হউক।

লছমন-ঝোলার নাম ভীতিমিশ্রিত দুর্ঘটনার প্রতিমূর্ত্তি ধরিয়া কেন আজিও যাত্রী অযাত্রী সকলের হৃদয়ে জাগিয়া আছে, তাহা পাঠক সেই ঝোলার তৎকালীন অবস্থা অবগত হইলেই সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিবেন। নিম্নে সে সকল কথা কিছু বিবৃত করিতেছি।

আমরা যেমন বাঁশের মৈ প্রস্তুত করি, লম্বা বাঁশ সমভাগে চিরিয়া দুইখান করিয়া তাহা দুই পাশে দিয়া দুই পাশের ঐ বাঁশ দুখানির গায়ে সমান অন্তরে ছিদ্র করিয়া, সেই ছিদ্রে ছিদ্রে কোয়া লাগাইয়া থাকি, সেইরূপ এপার ওপার লম্বা দুই গাছি রশি বা মোটা দড়া, তাহার মাঝে মাঝে বরাবর ঐরূপ ছোট ছোট শক্ত-কাঠের কোয়া লাগান, উহা এপারে মোটা কাঠের খুঁটা পুঁতিয়া তাহাতে অপর পারের প্রোথিত ঐরূপ কাঠের খোঁটাতে লম্বা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং বাঁশের মৈয়ের পরিবর্ত্তে ইহাকে দড়ির মৈ বলা যায়। এই দড়ির মৈ বা দড়ির পুলকে এদেশে ঝোলা বলে। ইহার উপরে উঠিয়া হাত দিয়া ধরিয়া পার হইবার সুবিধার্থ ঐ ঝোলার রশি দুইগাছি হইতে প্রায় এক বুক উর্দ্ধে আর দুইগাছি রশি ঐরূপ এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত লম্বা টাঙ্গাইয়া পূর্ব্বোক্ত খোঁটা দুইটীর সেই পরিমাণ উপরিভাগে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহাতেই তখন পারাপার চলিত। ইহার দোষ এই যে, এই ঝোলার উপর উঠিয়া একটু অগ্রসর হইলেই ঝোলাটী দুলিতে আরম্ভ করে। তখন দূর-নিম্নে পদতলে গভীর গর্জ্জন-কারী প্রখর গঙ্গাপ্রবাহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ভয়ে, বিস্ময়ে, অনবধানে, দোদুল্যমান ঝোলার উপর হয়ত যথানিয়মে পদক্ষেপ করা হয় না, হয়ত এক একবার পদস্খলন হইয়া যায়। পদস্খলন হইলেই বিষম বিপদ্। উপরের রশি অবলম্বন করিয়া তখন ঝুলিতে হয়, নিম্নবর্ত্তী দোদুল্যমান রশি শীঘ্র পায়ে পাওয়া যায় না। তখন হতাশায় হাতের বল লুপ্ত হয়, বুদ্ধি-বিবেচনা অন্তর্হিত হয়, তাহার ফল সঙ্গে সঙ্গে অধঃ-পতন। বহু বহু যাত্রী ঐরূপে রশিভ্রষ্ট হইয়া দূর-নিম্নে গঙ্গাপ্রবাহে পতিত, পতিতাবস্থায় প্রবাহ-তাড়িত হইয়া প্রবাহগর্ভস্থ পাষাণে আহত ও সেই অবস্থায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। এই কারণে লছমন-ঝোলার এই প্রাণসংশয়কর বিভীষিকাময় ঘোষণা সর্ব্বত্র বিস্তার

লাভ করিয়াছে। এই কারণে জীবনে মমতাশূন্য নির্ভীক সাধু-সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কেহ তৎকালে এ পথ উত্তীর্ণ হইতে সাহস করিত না। লছমন-ঝোলা পার হইতে হইবে বলিয়াই যেন বদরীনারায়ণ-যাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন তীর্থযাত্রা বলিয়া গণ্য ছিল। আর সে ঝোলা যিনি পার হইয়াছেন, তাঁহারও মনে মনে যেরূপ সৌভাগ্যগর্ব্ব হইত, বাহিরের লোকেও সেইজন্য তেমনি তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়া মহাপুরুষের সিংহাসনে বসাইত। বাল্যকালে আমরাই দেখিয়াছি, সাধু-সন্ন্যাসী বাটীতে পদার্পণ করিলে, আমরা যখন তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতাম, তাঁহারা নানা তীর্থের ভ্রমণ-পরিচয়ে কেদার-বদরীর নাম উল্লেখ করিলেই আমরা অবাক্ হইয়া তাঁহাদের মুখপানে চাহিয়া থাকিতাম।·বাস্তবিক, সেকালের সেই সকল মহাত্মাদিগের এমনি প্রতিজ্ঞাই ছিল যে নারায়ণ দর্শন করিতেই হইবে, তাহাতে প্রাণ যায় যায়, থাকে থাকে। আবার সাধুদিগের মুখে শুনিয়াছি, যে অতি পূর্ব্বে এরূপ দড়ির ঝোলাও ছিল না। পার্ব্বত্য অঞ্চলে একরূপ লতা জন্মে, তাহা মোটা রশির মত স্থূল ও শক্ত হয় ও বহুদুর লতাইয়া যায়। উভয় পারে এখানে ঐরূপ লতা ছিল। কৌশলে তাহারই ঝোলা রচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত দড়ির ঝোলায় ক্রমে সাধুগণ পারাপার হইতেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ঐরূপেই পার হইয়া বদরীক্ষেত্রে গতায়াত করিয়াছেন। সুতরাং লছমন-ঝোলা পার হওয়া যে কতকাল হইতে কিরূপ বিপজ্জনকরূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছে, পাঠক! ইহাতেই অনুমান করিয়া লউন।

ভগবৎ-কৃপায় লছমন-ঝোলার ঐরূপ সঙ্কট অবস্থা এক্ষণে গল্পের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। মহাত্মা রায় সুরযমল ঝুনঝুনওয়ালা বাহাদুরের পুণ্যবুদ্ধি-সহকৃত বদান্যতায় বর্ত্তমান সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত লৌহসেতু নির্ম্মিত হওয়ায় বদরীনারায়ণ-যাত্রা এক্ষণে নিরাপদ্ হইয়াছে।

ঝোলা পার হইয়া আমরা নিকটবর্ত্তী এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লই-

লাম। নিকটেই সোপানবদ্ধ সুন্দর ঘাট, আমরা ঐ ধ্রুব-ঘাটে নামিয়া স্নানাহ্নিক করিলাম। এখানকার গঙ্গাও প্রশস্ত, গঙ্গার স্রোতও খুব প্রবল, ঘাটও তেমনি সুন্দর। ঘাটের উপর পথটীতে গরু, গাড়ী, ঘোড়ার সর্ব্বদা বড় ভিড় হয়। মালের আমদানী সর্ব্বদাই আছে। আমরা একরূপ করিয়া পাশ কাটাইয়া ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। ধর্ম্মশালার মধ্যে একটী দেবালয় আছে। এখান হইতে একটু উঠিয়া লছমন্‌জীর প্রাচীন মন্দিরে উক্ত দেবদর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আরও অগ্রসর হইয়া সাধু-তপস্বি-নিষেবিত তপোবন বা মুনিকা রেতি নামক পবিত্র স্থান প্রাপ্ত হইলাম। আহা কি সুন্দর স্থান! ধারে ধারে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন, আর উপরেই বিরল তরুগুল্মাদির মধ্যে মধ্যে সাধুগণের আশ্রম! এখানে জন-কোলাহলের পরিবর্ত্তে মাত্র জাহ্নবীরই কল্লোল-কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়, ক্রীড়াকৌতুক-ব্যসনাদির পরিবর্ত্তে মৃগ-পক্ষি প্রভৃতিরই স্বচ্ছন্দ ও সানন্দ সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়, বিলাস-বিভ্রম ও বিপুল বাসনার পরিবর্ত্তে সারল্য, সংযম ও সন্তোষই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ প্রাচীন তপোবনের আভাস যেন এখনও এখানে সুপ্রকাশ রহিয়াছে। অবশ্য আমরা দূরের যাত্রী, মুহূর্ত্তের অতিথি; পলকমাত্র দর্শনে যাহা অনুমান হইয়াছে তাহাই লিখিয়া যাইতেছি। অদূরে আদি-বদরীনাথের মন্দিরে ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই স্থানে কাণ্ডী-ঝাম্পান প্রভৃতির সরকারি মাশুল আদায় হইয়া থাকে। আমরা প্রথমেই গঙ্গোত্তরীর পথে ভাটোয়ারীতে তথাকার সরকারি কর্ম্মচারীকে ঐ মাশুল দিয়া যে রসিদ পাইয়াছিলাম, তাহা দেখাইলে এখানকার কর্ম্মচারী আমাদের কাণ্ডীওয়ালাকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর আমরা সমতল প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া বালুকাময় পথে হৃষীকেশ প্রাপ্ত হইলাম।

—o—

হৃষীকেশ।

হৃষীকেশ উত্তম স্থান। অনেকগুলি দেব-মন্দির, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী, অনেক ধর্ম্মশালা, অনেক সদাব্রত আছে। ঔষধালয়, পুস্তকাগার, পাঠশালা কিছুরই অভাব নাই। এক বাবা কালী-কমলীওয়ালা মহাত্মারই অন্নক্ষেত্র বার মাস এখানে খোলা থাকে। উহাতে পরমহংসগণ রুটী প্রভৃতি প্রস্তুত খাদ্য পাইয়া থাকেন এবং অন্যের জন্য আটা, ডাউল, ঘি, লবণ, মরিচ প্রভৃতি দিবার ব্যবস্থা আছে। বিদ্যার্থী ও সাধুগণের প্রয়োজনমত তৈল, দিয়াশালাই ও গিরি-মাটীও দেওয়া হইয়া থাকে। রোগীর জন্য ঔষধ, পথ্য ও বৈদ্যের এবং বিদ্যার্থীর জন্য অন্ন ও অধ্যাপকের বন্দোবস্ত আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে, তথায় বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস করিয়া অন্নদান করা হইয়া থাকে। অনেক ধর্ম্মাত্মা সম্পূর্ণ মাঘ মাস হৃষীকেশ-ক্ষেত্রে বাস করিয়া থাকেন।

স্থান উত্তম সমতল, বাজারও খুব প্রশস্ত, রাস্তাও সুন্দর। পোষ্ট আপিস্ আছে। একটু দূরে যথেষ্ট ময়দান; হরিদ্বার হইতে ঘোড়া-গাড়ীও এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে। এইরূপে হৃষীকেশ সর্ব্ব-প্রকারেই উত্তম স্থান।

আমরা বাবা কালী-কমলীওয়ালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালার একদেশে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। বাজারের মধ্য দিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলাম। বাজারের শেষেই গঙ্গার প্রশস্ত ঘাট। ঘাটের উপরেই দুইটী ঝরণা আছে, তাহার ধারা গঙ্গায়ই পড়িতেছে। উহা কোন প্রয়োজনেই লাগে না। ঐ ঝরণা এখান হইতে দূরে থাকিলে কত উপকারেই লাগিত। ঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী সড়কের উপরে ঋষিকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড

আছে, উহাতে স্নান করিয়া পশ্চাৎ ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিতে হয়। এখানে গঙ্গার তিনটী ধারা একত্র মিলিত হওয়ায় ত্রিবেণী-সঙ্গম হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বর্ষায় জলবৃদ্ধিবশতঃ ত্রিধারা এক প্রশস্ত ধারায় পরিণত হওয়ায় ত্রিবেণী স্পষ্ট লক্ষিত হইল না। গঙ্গার আকারও এখানে স্বভাবতঃ প্রশস্ত। আমরা গঙ্গাস্নানান্তে ভরতজীর প্রকাণ্ড মন্দির দর্শন করিলাম। রাম-জানকীর মন্দিরও সুন্দর। ভদ্রকালীর ও শিবেরও এক মন্দির আছে।

১৪ই আষাঢ়।

প্রভাতে গঙ্গায় স্নানাহ্নিক করিয়া হৃষীকেশ হইতে রওনা হওয়া গেল। প্রথমে গঙ্গার ধারে ধারে কিয়দ্দূর চলিয়া, ক্রমশঃ আমরা গঙ্গার দূরবর্ত্তী ও ক্রমে পর্ব্বত হইতেও দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড তৃণশস্য-শ্যামল সমতল মাঠের মধ্য দিয়া রাস্তা চলিতে লাগিল। এই মাঠে কুলের গাছ অতি বিস্তর; এক স্থানে এত অধিক কুলের গাছ আর কোথাও দেখি নাই। পথে গরু-মহিষও অনবরত দেখা যাইতে লাগিল। গো-চারণের এমন মাঠ ত এতদিন ছিল না। তা হউক, মাঠ-গোঠ, গরু-বাছুর এখন যতই দেখি, কিন্তু এতদিনের নিত্য-সঙ্গী পর্ব্বত আজি দূরবর্ত্তী দূরদৃশ্য হইল বলিয়া মন কেমন করিতে লাগিল। হায় পর্ব্বতমালা! তোমাদের দেখিবার জন্য কত কাল হইতে লালায়িত ছিলাম, ভবিষ্যতে না জানি আবার কত দিন লালায়িত থাকিব, কিন্তু তখন শত প্রার্থনা করিয়াও হয়ত আর তোমাদের দেখা পাইব না! তাই ভাবিতেছি, আমরা নিতান্ত পর্ব্বতহীন দেশের লোক কি না! কালিদাস-ভারবি-ভবভূতির কাব্যে আমাদের পর্ব্বত দেখা, কিন্তু তাহাতে কি তৃপ্তি হয়? নিয়ত তোমাদিগকে লঙ্ঘন করিতে করিতে এখন না হয় আমরা খিন্ন, অবসন্ন হইয়াছি, আর লঙ্ঘন করিতে হইবে না বলিয়া আশ্বস্তও হইতেছি, কিন্তু একদিন এমন দিন থাকিবে না। নিশ্চয়ই

সে দিন তোমাদের একবার দেখিবার জন্য, তোমাদের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য লালায়িত হইতে হইবে! সৌন্দর্য্যই যে জগতের সার-সম্পত্তি!

এ জন্মে কত স্থানে কতবিধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিলাম, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। সীমা-সংখ্যা দূরে থাক্, সকলের স্বরূপই স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় না। অযত্নে, অনবধানে, অনাদরে, অনাহ্বানে কত সৌন্দর্য্য, কত মাধুর্য্য বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে! যাহারা একবারে নিমগ্ন হয় নাই, তাহাদেরও বহু যত্ন, বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া এখন স্মৃতিপথে দাঁড় করাইতে হয়। দাঁড় করাইতে গিয়া দেখি, তাহাদেরও দশটী হয়ত অবিকল উপস্থিত হইবে, আর শতটী বিকলাঙ্গ হইয়া উদিত হইবে। সেই বিকলতারই বা কি শোচনীয় দশা! কেহ বা শরন্মেঘের মত নানারঙ্গে রঞ্জিত হইতে হইতে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে, কেহ বা জল-বুদ্বুদাবলীর ন্যায় এক হইবে, আর মিলাইবে! কাহাকে ধরি-ধরি করিয়া ধরিতেই পারিব না, যেন গন্ধর্ব্বনগরলেখা, "পশ্যত এব নশ্যতি!" কেহ মনে হয়-হয় করিয়া হইবে না, যেন কি সুখস্বপ্ন! এমন সৌন্দর্য্য, এমন রত্নের কুচি, এমন স্বর্ণ-রেণু কত আছে! কার নাই ভাই? আমি মনে করাইয়া দিতেছি, মনে করিয়া দেখ দেখি, কার নাই? কার এমন ভোগ হয় নাই? কিন্তু আবার কতকগুলি আছে, যাহাদের কেহ স্মৃতিসূত্রে শতগ্রন্থি-জটিল হইয়া পাকে পাকে জড়াইয়া রহে, কেহ বা চিত্তক্ষেত্রে ভিত্তি পত্তন করিয়া প্রকাণ্ড পাষাণ সৌধের ন্যায় নিত্য-উত্থিত, নিত্য-সজ্জিত থাকে, আমি এখন তাহাদেরই কথা কহিতেছি।

স্মৃতি-বিজড়িত সৌন্দর্য্যরাশির অবশ্য প্রকারভেদ আছে, ক্ষুদ্র-বৃহদ্ভাব আছে। তাহা থাক্, তথাপি সে সকলই সুন্দর। সুজন্মার বৎসরে কমলার প্রিয় বাসভূমি রাঢ়ভূমির বিশাল সমতলক্ষেত্রে শ্যামকান্তি-লিপ্ত শারদ-শস্যসম্পদ, রাজসাহী প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলের বিস্তীর্ণ হ্রদাকার

জলপূর্ণ নিম্নভূমির পবন-হিল্লোলিত শ্যামশস্যসমৃদ্ধি, বাঁকুড়া প্রভৃতি কঙ্করময়প্রদেশের স্থানে স্থানে তৃণশস্যশূন্য পাণ্ডুবর্ণ উন্নতানত ভূমি-খণ্ডের নগ্নসৌন্দর্য্য, কোথাও বা উন্নতশির বিশাল শালবনের শৌর্য্য-গাম্ভীর্য্যশোভা, পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে প্রবল বর্ষাবিক্রমকালীন নদনদী-সমূহের শতমুখোচ্ছলিত গ্রাম-গোষ্ঠ-পথ-প্রান্তরাদি-প্লাবনলীলা, দক্ষিণ বঙ্গের যথায়-তথায় ফলপুষ্পসমৃদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষসমূহে উদ্যানলক্ষ্মীর বিলাস-বিভ্রম, যথায়-তথায় চল-চলমূর্ত্তি লতা-পঙ্‌ক্তির নিবিড় শাখা-পল্লবপুঞ্জে কুঞ্জবনশোভা, এ সকলই নয়ন-লোভন, সন্দেহ নাই। আবার শরৎকালীন সায়াহ্ন-গগনে সুরঞ্জিত জলদ-লেখার ক্ষণোজ্জ্বল ক্ষণ-বিশৃঙ্খল ক্ষণ-বিলয়শীল বহুরূপে বিকীর্ণ সৌন্দর্য্যরাশির বিচিত্রতায়ই বা কাহার মতভেদ আছে? তথাপি এই সকল সরল সৌন্দর্য্য গৃহের প্রাঙ্গণ হইতে সুলভ-দৃশ্য ও সতত-দৃশ্য বলিয়া আমাদের বিস্মরণীয় না হইলেও চিত্ত-ক্ষেত্রে তেমন গাঢ়-অঙ্কণে অঙ্কিত হয় না, কোন অপূর্ব্ব অদ্ভুতভাব সঞ্চারে সমর্থ হয় না।

আর হিমাচলের সৌন্দর্য্য? এ সৌন্দর্য্য অদ্ভুত, অপরিমেয়, অফুরন্ত! এই পর্ব্বত-রাজের রাজ্যে প্রবেশ করিলে আর মৃণ্ময়ী পৃথিবীর কথা মনে থাকে না। কি অনন্ত-বিস্তার বিশাল অবয়ব! আকাশ ইহার ঊর্দ্ধসীমা, পাতাল ইহার নিম্নপ্রান্ত! পর্ব্বত-রাজ নিবিড়-বনরাজি-রূপে একখানি সুনীলবস্ত্র যেন নিম্ন অঙ্গে পরিধান করিয়া আছেন! পবন-চালিত শ্বেত-নীলাদি নানাবর্ণের মেঘখণ্ড যেন নানাবর্ণের উত্তরীয়-বস্ত্ররূপে ঊর্দ্ধ অঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন! আর উত্তমাঙ্গে চিরতুষার-তারের অক্ষয় মুকুট ধারণ করিয়া আছেন। আবার মনে হয়, যেন মহাযোগী মহেশ্বর স্থিরাসনে অনন্তকাল উপবেশনপূর্ব্বক সমাধিমগ্ন হইয়া আছেন! মেঘ-মণ্ডলই তাঁহার জটামণ্ডল হইয়াছে, তুষার-সম্ভারই যেন বিভূতিভূষণ হইয়াছে, আকাশই যেন তাঁহার আবরণ-বস্ত্র

ও চন্দ্রসূর্য্যই তাঁহার ঊর্দ্ধনেত্র হইয়াছে! এই অদ্ভুত দৃশ্যের অদ্ভুত সৌন্দর্য্যে ভীতি-ভক্তি ও বিস্ময়ভরে আপনিই কি মনুষ্যের মস্তক অবনত হইয়া পড়ে না?

এই হিমাদ্রির মধ্যে কত স্থানে কত বিচিত্র বস্তু বিদ্যমান রহিয়াছে, কত বিচিত্র ব্যাপার সর্ব্বদা সঙ্ঘটিত হইতেছে, তাহারই বা ইয়ত্তা কি আছে? বিষ্ণুপ্রয়াগের ন্যায় উন্মত্ত পার্ব্বত্য নদীদ্বয়ের মহাসঙ্গম— যথায় উত্তাল-কল্লোলনাদে শব্দান্তরের অবকাশ নাই, কেদারপথের নিবিড়-নীল অরণ্যানী, যথায় চতুর্দ্দিকে আর দৃশ্যান্তরের সত্তা নাই, তথাকার পাতালতলোন্মুখ অনন্ত-গভীর খাত—নিয়ত অবতরণে যাহার সীমা পাওয়া যায় না, অতলস্পর্শ গভীর গহ্বর—সৃষ্টিকাল হইতে যথায় সূর্য্যরশ্মির সঞ্চার নাই, তুঙ্গনাথের ন্যায় উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ—যথায় দণ্ডায়মান হইলে শত শত শৃঙ্গ এককালে নয়নের ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে, আর ইহা ছাড়া কত নির্ঝর, কত প্রপাত, কত স্থান হইতে সর্ব্বদা বিশাল শব্দে নির্গত হইয়া শত শত নদীর সৃষ্টি করিতেছে, কত শত তুষার-শিলা-সঙ্ঘাত স্খলিত হইয়া বিকট বজ্রনাদে ভূকম্প উৎপাদন করিতেছে, কত শৃঙ্গ বিবশ-অঙ্গে বিশাল-নির্ঘোষে স্বস্থান-বিচ্যুত ও নদীগর্ভে বিলুণ্ঠিত হইয়া তাহার প্রবাহরোধপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ হ্রদের উদ্ভব করিতেছে, এ সকল দর্শন করিলে, ধ্যান করিলে, তাহা কি আর মানসপট হইতে অন্তর্দ্ধান করে? তাই বলিতেছিলাম, হিমাচলের সৌন্দর্য্য চিত্ত-ক্ষেত্রে ভিত্তি পত্তন করিয়া প্রকাণ্ড পাষাণ-সৌধের ন্যায় নিত্য-উত্থিত, নিত্য-সজ্জিত থাকে। সে সৌন্দর্য্য অদ্ভুত, অপরিমেয়, অফুরন্ত; তাহা যখন হৃদয়ে উদিত হয়, হৃদয়ের সমগ্র অংশ ভরিয়া ফেলে, আর কাহার তথায় স্থান হয় না?

কিন্তু যাহা নিতান্তই ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে, তাহার কথায় আর কাজ কি? এখন পাঠক ধীরে ধীরে চল, আমাদের পথের কথাই পরিসমাপ্ত করি।

সত্য-নারায়ণ।

হৃষীকেশ হইতে তিন মাইল পরে এক ধর্ম্মশালা দেখা গেল। গ্রাম নিকট, ঝরণাও আছে। আবার এক মাইল পরে আর একটী ধর্ম্মশালা। এখানে আমগাছের ছায়ায় স্থানটী চমৎকার সুশীতল। পানীয় জলের জন্য একটী কূপ আছে। এই কূপের জল দেখিতেও গঙ্গাজলের ন্যায়, খাইতেও গঙ্গাজলেরই ন্যায় মধুর। এখানেও অবস্থিতি করিলাম না। কিন্তু প্রখর রৌদ্র, চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া গেলাম; সিধা রাস্তা আর ফুরায় না। বহুক্ষণ পরে সত্যনারায়ণের অট্টালিকা ধর্ম্মশালা দেখা গেল! দেহড়ী অতিক্রম পূর্ব্বক বাটীতে প্রবেশিয়া দেখিলাম, কি সুন্দর, কি পবিত্র স্থান! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। মন্দির মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তিই বা কি চমৎকার! দেখিয়া প্রাণ শীতল হইল। এখানে যাত্রিগণের অবস্থানপক্ষে বড়ই আরাম। পৃথক্ ধর্ম্মশালায় ও সত্যনারায়ণের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রশস্ত বারান্দায় অসংখ্য যাত্রী সর্ব্বদা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন। রৌদ্র পড়িয়া গেলে বিস্তৃত অঙ্গনেও কত লোক আরাম করিয়া থাকেন। পাকের জন্য পৃথক্ এক সারি ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে, স্নানেরও সুন্দর ব্যবস্থা। সত্যনারায়ণের মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক উত্তম কুণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। স্নানের জন্য তথায় ঝরণার জল এক প্রণালী দিয়া পরিপূর্ণ করা হইতেছে, অন্য পথ দিয়া তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। এই কুণ্ডের পরেই যাত্রি-নিবাসের গৃহশ্রেণী। তাহারই প্রান্তে পাকশালা, পানের জন্য ও পাকের জন্য সর্ব্বদা জল উঠাইয়া দিবার লোক নিযুক্ত আছে। ঐ জল সংগ্রহের জন্য জল-সত্রের পার্শ্বেই উৎকৃষ্ট একটী ইন্দারা আছে। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি—

স্নানাগার ও যাত্রি-নিবাসের পার্শ্বে ও সদাব্রত-ভাণ্ডারের পশ্চাতে ফল-ফুলের একটী উৎকৃষ্ট বাগান আছে। এ দিকে দরজার বাহিরে সড়কের ধারে মুদিখানা ও উৎকৃষ্ট মিষ্টান্নের দোকান। সড়কের অপর পারে জঙ্গল ও ময়দান যথেষ্ট। ফলতঃ কোন বিষয়েরই কষ্ট এখানে দেখিলাম না। স্থানটী ক্ষুদ্র হইলেও ইহা উত্তম স্থান।
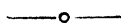
পার্ব্বত্য নদী।

আমরা বৈকালে এই স্থান হইতে রওনা হইলাম। এক পোয়া কি তাহার কিছু বেশি পথ আসিয়াই খরস্রোতা এক পাহাড়ী নদী পাইলাম। নদীর পরিসর অতি সামান্য, কিন্তু স্রোতের ভয়ঙ্কর তেজ, সশব্দে তীরবেগে প্রবাহের পাণ্ডুবর্ণ জলরাশি যেন ঢালিয়া পড়িতেছে। উভয় পারেই যথেষ্ট যাত্রী দলবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস হইতেছে না। দুইটী দুঃসাহসিক লোক পার হইবার জন্য নামিয়াছিলেন, তাঁহারা এক কোমর জলে গিয়াই উলটী পালটী খাইতে খাইতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। পাহাড়ীরা ছুটিয়া গিয়া কোন রকমে টিকি ধরিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়াছে। আমরা নমস্কার করিয়া বলিলাম, আজ আমাদের পারে কাজ নাই। আমাদের ফিরিতে দেখিয়া আরও কতকগুলি হিন্দুস্থানী ও স্থানীয় লোক দল ভাঙ্গিয়া আমাদের সঙ্গী হইলেন। আসিতে আসিতে হিন্দুস্থানীরা আমাদের বলিতে লাগিলেন, বাবুজী, আমরা যে পার হইতে না পারিতাম, এমন নহে। জল ত সামান্যই, এক কোমরের বেশি নয়। কিন্তু যে স্থানটা এক কোমর, সেই স্থানটাই অতি পাজি। এমন ধাক্কা দেয় যে, পায়ের বলটুকু একবারে চলিয়া যায়, পা আপনি উঠিয়া পড়ে। আর যাহাতক পা ওঠা, অমনি গড়ান আর ভাসান। তাই

একটু সবুর করা গেল। কি জানেন, একরাত্রির ওয়াস্তা বই ত নয়, কাল সকালে নদী শুকাইয়া যাইবে। দুজন পাহাড়ীও গল্প শুনিতে শুনিতে আসিতেছিল, তাহারা বলিল, আর যদি রাত্রিতে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে শুকান কি, আবার দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইবে। শুনিয়া আমাদের মহা উদ্বেগ হইল। কি জানি যদি এরূপ দুর্ঘটনা হয়, কত দিন আবার এখানে বসিয়া থাকিব? ভাবিলাম এত পুণ্যাত্মা শেঠ লোক আছেন, এ স্থানে একটা পুল করিতে কাহার মনোযোগ হয় না কেন? বোধ হয়, ইহা একটা নদীর মধ্যে গণ্য নহে, আর অন্য সময়ে ইহার কোন চিহ্নই থাকে না। কাজেই ইহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। যাহা হউক সে রাত্রি সত্যনারায়ণেই বড় উদ্বেগের সহিত যাপন করিলাম।

১৫ই আষাঢ়।

প্রত্যূষে আমাদের ভারবাহক, আমাদের সুপ্রভাত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই খবর দিল, "বাবুজী, নদী শুকাইয়া গিয়াছে, আমি সেখানে গিয়াছিলাম, আপনারা আসুন"। রাম বল, বাঁচা গেল। কিন্তু লোকটার কি তাড়াতাড়ি! আমরা এতদিন পরে বাড়ী ফিরিতেছি, আমাদের যত না হউক, তাহার ত তদপেক্ষাও বেশি। আবার ভাবিলাম, তা হবে, ভার-বাহক কি না, বোঝা ফেলিতে পারিলেই বাঁচে। আমরা তাড়াতাড়ি নদীর সমীপে গিয়া দেখি, নদী আর সে নদী নাই। জল কমিয়াছে, বেগও কমিয়াছে, অধিকন্তু গর্ভস্থ সমবিষম প্রস্তরখণ্ডও কতক কতক দেখা দিয়াছে। আমাদের ভারবাহক কহিল, দেখিতেছেন কি, আর কিছুক্ষণ পরে এ জলও থাকিবে না। কি দুর্দ্দশা! হঠাৎ উন্নতি হইলে ধন-মদে উন্মত্ত অনেক মানুষেরও এইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে! প্রথম-প্রথম তাঁহাদের কাছে ঘেঁসে, কাহার সাধ্য?

কিন্তু দুদিন পরে হয় ত ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে এমনি শোচনীয় অন্তঃসারশূন্য-তাই প্রকাশ হইয়া পড়ে! যাহা হউক, এখনও আমরা খুব ধীরে ধীরে পাথরে পা বাঁচাইয়া নদী পার হইলাম। তখন পার হইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। গাড়ী-ঘোড়া, গরু-মানুষ কতই পার হইতে লাগিল। অবিলম্বে আমরা রায়বালা ষ্টেশন প্রাপ্ত হইলাম। সাধারণে রায়বালা বলিলেও টাইম্ টেবলে ইহার নাম হইয়াছে হৃষীকেশ-রোড ষ্টেশন। এখান হইতে হরিদ্বার পাঁচ, কি সাড়ে পাঁচ মাইল হইবে। এই টুকু হাঁটিয়া যাইবার জন্য আমাদের বাহককে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু সে গরমের ভয়ে কিছুতেই যাইতে সম্মত হইল না। আমাদের এই বাহকটী বড় আহ্লাদে ও বড় উৎসাহশীল লোক ছিল। আগে থাকিতে দূরের চটীর নাম করিয়া কহিত, বাবুজী, আজ আপনাদের এত দূর লইয়া যাইব, আর যাইবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াসও পাইত। শেষে না পারিয়া একমুখ হাঁসিয়া কহিত, বাবুজী, বড় গরম, আর পারিলাম না। তখন আমরা বলিতাম, আচ্ছা আর কাজ নাই। হাসি ছাড়া ইহাকে কখন কথা কহিতে দেখি নাই এবং কখনও কোন অনুরোধ ঠেলিতে দেখি নাই। বরং কোন কাজ করিতে বলিলে লাফ দিয়া গিয়া সেই কাজে হাত দিত। কিন্তু হরিদ্বার যাইতে তাহাকে এত অনুরোধ করিয়াও আমরা কৃতকার্য্য হইলাম না। বলিল, বাবুজী, আমি তাহা হইলে মারা যাইব। কি জানি গরম তাহাদের এতই অসহ্য! অগত্যা আমরা তাহার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া, তাহার আরও কিছু হাসি দেখিবার জন্য আরও কিছু দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম।

ক্ষুদ্র-বৃহৎ, রকম-বিরকম, দুদিনের-দুবৎসরের, যেমনই হউক, কাহারও চরিত্র কাহার পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে বলিয়া আমি বিবেচনা করি। প্রসঙ্গক্রমে আমার দুদিনের ভৃত্যের চরিত্র-সমালোচনা করিয়া আমি প্রীতি পাইতেছি, সেও হয় ত তাহার দুদিনের এই অধম প্রভুর

চরিত্র-কথা কত প্রসঙ্গে তুলিয়া আনন্দ বোধ করিবে। সংসারে ছোট বড় কিছু নাই।

সঙ্গের প্রায় সকল যাত্রীই পদব্রজে চলিয়া গেল। কেবল শেঠজীর মত দুই চারিটী লোকের সহিত আমরাও শেঠজী সাজিয়া ষ্টেশনে পড়িয়া রহিলাম। ট্রেণের বিলম্ব দেখিয়া আমরা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালায় গিয়া বসিলাম ও তথাকার উত্তম একটী ইন্দারা হইতে যথেষ্ট জল উঠাইয়া আহ্নিকাদি সমাপন করিলাম। ক্রমে ৯টা বাজিলে হরিদ্বারের ট্রেণ এখানে উপস্থিত হইল ও এখান হইতে দেরা-দুন অভিমুখে চলিয়া গেল। আর একঘণ্টা পরে দেরাদুন হইতে আমা-দের গাড়ি আসিল, আমরা আনন্দে গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। মধ্যে আর কোন ষ্টেশন নাই। দেখিতে দেখিতে অন্ধকারময় দুইটী টনেল বা সুড়ঙ্গ অতিক্রম করিয়া আমরা পবিত্রতীর্থ হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

——:——

হরিদ্বার।

হরিদ্বারে পহুঁছিয়া তথায় দুই পাঁচ দিন না থাকিয়া কে যাইতে পারে? এমন আরামের স্থান কি আর দুইটী আছে? এখন এত যে গ্রীষ্ম, কিন্তু একবার গঙ্গার ধারে যাইলেই সব শান্তি! একবার গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেই সব শীতল! সে জল সর্ব্বদাই যেন বরফ-মিশ্রিত। কিন্তু জলের আর সে নির্ম্মলতা নাই, বর্ষার আবিলতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যে দিন পাহাড়ে নদী নামে, সেদিন জল একেবারে কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ে। সুখের বিষয়, পাহাড়ে নদীর প্রবাহ দুই এক দিনের জন্য; সেই দুই এক দিন পরে গঙ্গাজল আবার পূর্ব্ববৎ হয়। হইলেও পূর্ব্বের মত মৎস্তের ক্রীড়া এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সময়ে সময়ে বৃষ্টির

জন্যও বেড়াইবার অসুবিধা হইতে লাগিল। হউক, তথাপি আমরা ৫।৭ দিন এখানে অবস্থিতি করিলাম। ক্রমাগত অধিক পরিশ্রমের পর আরাম কিছু অধিক বাঞ্ছনীয় হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ আমরা দুরুহর, প্রাণসংশয়কর হিমগিরির কতকগুলি অত্যুচ্চ শৃঙ্গ নির্ব্বিঘ্নে লঙ্ঘন করিয়া, উত্তরাখণ্ডের সমস্ত দেবভূমি, দেব-বিগ্রহ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া ফিরিয়াছি, আমরা এখন যেন যুদ্ধ-জয়ী বীর। আমাদের মনে স্ফূর্ত্তির যেন সীমা নাই, উদ্বেগের যেন লেশ নাই। এখন আমরা দুদিন বিশ্রাম পূর্ব্বক আনন্দ ভোগ করিব না ত কবে করিব?

পাহাড়ে পাহাড়ে এত দিন কেবলই কাঁচা আম দেখিয়া আসিতেছিলাম, হরিদ্বারে আসিয়া পাকা আম প্রচুর পাইলাম। বৈশাখের আম উৎসর্গ আষাঢ়ের মধ্যভাগে আমাদের সম্পন্ন হইল। আরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখিলাম। পাহাড়ের নির্ম্মল দুগ্ধের পরিবর্ত্তে বর্ণমাত্র রক্ষা করিয়া, জলের সাগরস্বরূপ দুগ্ধের কলস মাথায় লইয়া গোপ-গৃহিণীকে এখানে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে দেখিলাম। তবে ভাল মন্দ সবই এখানে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট দধি, দুগ্ধ, রাবড়ি, ক্ষীর-সরের বাজারে অভাব নাই। এখানে হিন্দুদিগের যেমন একটী ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা আছে, শিখদিগেরও তেমনি একটী নিজেদের ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা আছে। তদ্ভিন্ন স্কুল, ডাকঘর, হাঁসপাতাল, বিচারালয়, পুলিশষ্টেশন, রেলওয়ে ষ্টেশন, প্রভৃতি সহরের সম্পদ সকলই আছে। আমরা এখানকার দেবস্থান সকল এবার উত্তমরূপে দর্শন করিয়া কয়েক দিন পরে এ স্থান হইতে বিদায় লইলাম। প্রকৃত বিশ্রামের নিমিত্ত ৺কাশী ধামে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, প্রতিগমনের পথে আমাদিগের নৈমিষ্যারণ্য দর্শন ঘটিয়াছিল।

কয়েকটী মন্তব্য।

এতদূরে আমি আমাদের ভ্রমণ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত পরিসমাপ্ত করিলাম। এ যাত্রার ভ্রমণে আমাদের প্রায় তিন মাস কাল অতিবাহিত হইয়াছে। যেরূপ দীর্ঘ ও সঙ্কটময় পথ, তাহাতে এ কাল কিছু বেশি কাল নহে। কিন্তু গমনাগমনের পক্ষে ইহা যথেষ্ট হইলেও দর্শনাদি পক্ষে ইহা কখনই যথেষ্ট নহে। কেন না, এই কালের প্রায় সমস্ত অংশ এই তীর্থের দুর্গম পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রমেই অতীত হইয়াছে, অবশিষ্ট অতি অল্পকালই তীর্থাদি দর্শনে ব্যয়িত হইয়াছে। দর্শনাদিতে আরও কিছুকাল ব্যয় করিতে পারিলে তবে যেন মনঃপূত বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু এ ভূমির কোথায়ই বা তীর্থ নহে? কি গঙ্গোত্তরী, কি কেদার-বদরী, ইহার প্রত্যেক স্থানে, এখানকার প্রত্যেক তরু-লতা-গুল্মে যেন দেবভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কত দেখিব? আর কিছুকালে কতই বেশি দেখা সম্ভব? কিন্তু তাহা না হইলেও ইহা অবশ্য বলিব যে এ দেখা আমার মনঃপূত হয় নাই। দেখা মনঃপূত হয় নাই বলিয়া আমার এ লেখাও মনঃপূত হয় নাই। দুর্ভাগ্য আমি, আমার সাধ মিটে নাই, আমার অতৃপ্তি থাকিয়া গেল।

আমার মত বিস্তর যাত্রীকে এ তীর্থে যাইতে দেখিয়াছি। বিস্তর যাত্রীকে দেবদর্শন করিতে ও দর্শন করিয়া ফিরিতে দেখিয়াছি। তাঁহাদের হয় ত আমাদের মত অতৃপ্তি হয় নাই, সম্পূর্ণ তৃপ্তিই হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের ভক্তির গুণে, কি নির্ম্মল নিঃসংশয় মনের গুণে হয় ত সমস্ত পূর্ণ হইয়াছে। অধিক কথা কি, একটা সামান্ত কথা বলি; যাত্রীদিগের পথে পরস্পর দেখা হইলেই "জয় গঙ্গা-মায়ীকি জয়" "জয় কেদার-মহারাজকি জয়" "জয় বদরী-বিশালাকি জয়" এইরূপ জয়ধ্বনি আর তাহার প্রত্যুত্তরে অন্ত সম্প্রদায়েরও শতমুখে, সম্মিলিত শত কণ্ঠ

হইতে উদ্গত, মন্ত্রীভূত ঐ জয়ধ্বনি! ইহাতেই কি প্রগাঢ় প্রেমোল্লাস, কি গভীর ভক্তিভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে? বলিতে কি, দেখিয়া আমার ভক্তি শিক্ষা হইল, কিন্তু তাঁহাদের হয় ত শিক্ষাই ছিল। আবার যাঁহারা দর্শন করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদের দেখিয়া, যাঁহারা দর্শন করিতে চলিয়াছেন, তাঁহাদের যে দৈন্যভাব—"আহা আপনারাই যথার্থ ধন্য!" "আপনারাই প্রকৃত পুণ্যবান।" "আপনাদেরই জন্ম সার্থক, জীবন সার্থক!" এই সকল সখেদ, সবিনয়, হৃদয়-মর্ম্মোত্থিত বাক্য, ইহাতেই বা কত ভক্তি-প্রকাশ! আমি স্বয়ং এ সকল দেখিয়া ত এই অন্তর অনুভব করিয়াছি!

সকল দেখিয়া অনেকাংশে আমি আমার নিকৃষ্টতা অনুভব করিলাম। আমি প্রৌঢ় ও স্বচ্ছন্দ-শরীর, আমার দ্রব্যাদি যাহা কিছু, সবই ভার-বাহকের নিকট, শুদ্ধ হাত-পা লইয়া আমি তীর্থযাত্রা করিতেছি; কিন্তু অনেক বৃদ্ধ, অনেক বিকলাঙ্গ, অনেক রুগ্ন ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য লোক নারায়ণদর্শনে চলিয়াছে; অনেক স্ত্রীলোক কক্ষে শিশু-সন্তান লইয়া এই সুদীর্ঘ সুদুর্গম পথে হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা কি তাহাদের নিকট গণ্য? এ তীর্থযাত্রার যে মহা-পুণ্যরাশি, তাহাতে ঐ সকল লোকেরই যেন বাস্তবিক পূর্ণ অধিকার!

কিন্তু এই যে বাল-বৃদ্ধ, কুমারী-যুবতী, সমৃদ্ধ-দরিদ্র দলে দলে নানাবিধ যাত্রীর স্রোত হিমালয়ের উৎকট পথে অজস্র ধাবিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া কি বোধ হয়? বোধ হয় না কি, যে হিন্দুধর্ম্মের অক্ষয় বটবৃক্ষ আজিও বিপুল শাখা-প্রশাখা-পল্লবাদি বিস্তারে সকলকে সমান আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে, এ ধর্ম্ম যথার্থই সনাতন? এ মহানদের মূল-প্রস্রবণ নিত্যন্তই অক্ষয়? ইহা চিরকালই আশ্রিতের পিপাসা নিবারণ করিয়া আসিয়াছে, চিরকালই পিপাসা নিবারণ করিতে থাকিবে? ইহা একা-এক সেই অনন্ত সাগর-সঙ্গম প্রাপ্ত হইয়া আছে, আশ্রিতদিগকেও

সেই অনন্ত-সঙ্গমে লইয়া যাইবে? বৃথা আমরা ধর্ম্মের গ্লানি সন্দর্শন করিয়া দুঃখিত হই! হে ভীত! হে দুঃখিত! দুঃখভয় দূর কর, এই সকল স্থানে আসিয়া ধর্ম্মের অক্ষয় অমৃত-প্রবাহ দর্শন করিয়া সুস্থ হও, আশ্বস্ত হও।

একটা কথা—অনেকে তীর্থস্থানে, বিশেষতঃ উত্তরাখণ্ডের তীর্থসমূহে হিমালয়ের অরণ্য-গহ্বর-উপত্যকাদি নানা স্থানে অলৌকিক-তপঃ-প্রভাবশালী সাধু-মহাত্মাদিগের দর্শন পাইবেন, আকাঙ্ক্ষা করেন। অবশ্য ঐ সকল স্থানে ঐরূপ মহাত্মাদিগের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করা অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ইহাও সত্য যে—

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥

অর্থাৎ প্রত্যেক পর্ব্বতেই কিছু মণি-মাণিক্য থাকে না, প্রতি গজেই কিছু গজমুক্তা পাওয়া যায় না, প্রত্যেক স্থানে সাধুগণ বিরাজ করেন না, প্রত্যেক বনেই কখন চন্দন মিলে না। প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসী-তপস্বী বাস্তবিক দুর্লভ বস্তু। তাঁহারা পদ-প্রতিষ্ঠাদির প্রত্যাশা রাখেন না যে সংসারীদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে লালায়িত রহিবেন। তাঁহারা আপন কার্য্যেই নিমগ্ন থাকেন। কিরূপে পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে তাঁহাদিগের দর্শন পাওয়া যাইবে? তাঁহারা আপন কার্য্যের নিমিত্ত স্বভাবতঃ নির্জ্জনস্থানপ্রিয়। তবে তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে হয় ত সে সকল স্থানেও আমরা গমন করি ও তাঁহাদিগকে দর্শনও করি, কিন্তু তাঁহারাই যে আমাদিগের দ্রষ্টব্য সাধু, তাহা জানিতে পারি না। বেশ-ভূষার আড়ম্বরে অনেককে প্রকৃত সাধু ভাবিয়া অনেক সময় আমরা যেমন প্রতারিত হই, তেমনি হয় ত একান্ত আড়ম্বরশূন্য, নিতান্ত-সরল, নির্ব্বাক্-নিষ্ক্রিয় সাধু মহাত্মাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার অন্তস্তত্ত্ব কিছু মাত্র না বুঝিয়া, আমরা তথায় উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক যথার্থ সাধু-দর্শনে

পাওয়া যায়। আবার টোটা-আম হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাম-ধারের ফাঁড়িপথ দিয়া নামিয়া গেলে দুই মাইলেই কুমারিয়া-চটী পাওয়া যায়, কিন্তু গাড়ীর সড়কে ঐ কুমারিয়া-চটী পঁহুছিতে ৬ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়।

কুমারিয়া হইতে কৌশল্যাগঙ্গা বা কুশীনদী পার হইয়া ৬ মাইলে গরজিয়া চটী। গরজিয়ার পূর্ব্বেও আর একবার কুশী পার হইতে হয়। গরজিয়া হইতে রামনগর ৭ মাইল পথ। রামনগরেও কুশীনদী, এখানকার বাজার উত্তম, আশ্রয় মিলে।

রামনগরে প্রভাতে এবং মধ্যাহ্নে মোরদাবাদ যাইবার ট্রেণ পাওয়া যায়। মোরাদাবাদ পঁহুছিয়া যাহার যে দিকে যাইবার ইচ্ছা, ট্রেণ পাইতে পারেন।

যাত্রীদিগের প্রতি।

উপসংহারে এই সমস্ত পার্ব্বত্যতীর্থের যাত্রীদিগের প্রতি আমার দুই চারিটী বক্তব্য আছে।

(১) সমতল প্রদেশের তীর্থ অপেক্ষা পার্ব্বত্য প্রদেশের তীর্থ স্বভাবতঃ দুর্গম হইলেও পূর্ব্বকালের তুলনায় এ কালে ঐ সকল তীর্থযাত্রায় সুবিধাসম্বন্ধে আকাশ পাতাল তফাৎ হইয়াছে। অর্থাৎ যে তীর্থগুলির বিবরণ এই পুস্তকে লিখিত হইল, সেইগুলির পথ পূর্ব্বাপেক্ষা এখন সম্পূর্ণ সুগম হইয়াছে। সুতরাং অতি দুর্গম ও নিতান্ত কষ্টকর বোধে কেদার-বদরী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলির যাত্রায় নিবৃত্ত থাকিবার কারণ এখন কিছুই নাই।

(২) তবে পর্ব্বতারোহণে শ্রম ও কষ্ট কিছু অধিক হয় এবং ঐ অধিক শ্রমের কারণে ও নির্ম্মল জলবায়ুর গুণে ক্ষুধাও কিছু অধিক হয়।

তজ্জন্য যাত্রীদিগের দুগ্ধাদি পুষ্টিকর খাদ্যের কিছু প্রয়োজন। নতুবা শরীর দুর্ব্বল হয় ও দুর্ব্বলতার জন্য অসুস্থ হইয়া পড়ে। কেদার-বদরীর পথে খাঁটি ও গরম দুগ্ধের অভাব নাই।

(৩) হিম নিবারণের জন্য শয়নের ও আচ্ছাদনের উপযুক্ত দুইখানি করিয়া মোটা কম্বল ও মোটা গেঞ্জি সকলেরই থাকা উচিত। সম্পন্ন লোকে অবশ্য বেশি রাখিবেন। কিন্তু তাহাতেও অনেক সময় পর্য্যাপ্ত হয় না, হিম লাগিয়া সর্দ্দি, কাশি ও জ্বর উৎপন্ন হয়। তদ্‌ভিন্ন পাহাড়-অঞ্চলে পেটের পীড়া স্বভাবতই বেশি হইয়া থাকে। অতএব সর্দ্দি, কাশি, জ্বর, কলেরা, রক্ত-আমাশয় এবং অজীর্ণের ঔষধ কিছু কিছু সঙ্গে থাকিলে ভাল হয়। উক্ত অঞ্চলে ঔষধ বা চিকিৎসকের একবারেই অভাব।

(৪) বিষ্ণুপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি নদীসঙ্গম-স্থানে অতি ভয়ঙ্কর স্রোত। একটু অসাবধানতায় স্রোতের বেগে জলমগ্ন হইয়া প্রাণনাশের সম্ভাবনা। অতএব প্রচলিত কথা মনে রাখা উচিত যে সাবধানের বিনাশ নাই।

(৫) অধিকাংশ স্থলে আলোর কোন উপায় নাই। তজ্জন্য লণ্ঠন, বাতি, দেশলাই সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য।

(৬) কেহ একবেলা, কেহ দুই বেলাই পথ চলিয়া থাকেন। ফিরিবার সময় যাত্রীদের আরও তাড়াতাড়ি হইয়া থাকে। যাহাহউক, সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী চলিতে নাই, পাহাড়-অঞ্চলে অনেক সময় পথভ্রম হইবার সম্ভাবনা। এবং অপরাহ্ণে একটু বেলা থাকিতেই চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অসময়ে উপস্থিত হইলে অনেক সময় চটি যাত্রীতে পরিপূর্ণ হওয়ায় স্থান পাওয়া যায় না।

(৭) তীর্থযাত্রার অনেক কঠোর নিয়ম আছে। কিন্তু কাল-ধর্ম্মে বলিতে হইতেছে, যাঁহাদের সেরূপ ক্লেশ সহ্য নাই, তাঁহারা জুতা ও ছাতা লইতে যেন সঙ্কুচিত না হন। আর পাহাড়ের পথে লাঠি ও একটা

প্রধান অবলম্বন, তাহা স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেকেরই থাকা চাই। ঐ সমস্ত জিনিষই হরিদ্বারে মিলে।

(৮) শেষ কথা, সকল কার্য্যে দেবতার স্মরণ করিয়া, দেবতার শরণাগত হইয়া চলিতে হইবে, তাহাতে যেন বিস্মরণ না হয়। তাহা হইলেই সকল মঙ্গল। ইতি।

নেপাল-যাত্রা।

১৩১৮। মাঘ।

এবার নিতান্তই পশুপতিনাথ আমায় টানিয়াছিলেন, তাই মাঘের শেষে তাড়াতাড়ি প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভযোগে স্নানপূর্ব্বক কাশীধাম হইয়া কোনরূপে নেপাল পহুঁছিয়া শিব-চতুর্দ্দশীতে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছি। ইহার পূর্ব্ববর্ষেই এই দর্শন করা কর্ত্তব্য ছিল। কেননা, কেদারনাথ দর্শন করিয়া পশুপতিনাথ দর্শন না করিলে উক্ত দর্শন সম্পূর্ণ হয় না। তাহার বৃত্তান্ত এই—কুরুক্ষেত্র-সমরে অতিপ্রভূত জ্ঞাতিবন্ধু-হত্যাজনিত ঘোরতর পাপে লিপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণ যখন পাপক্ষয়ার্থ নানাতীর্থ-পর্য্যটনাদি করিয়াও নিষ্কৃতি বা চিত্তে শান্তি পাইলেন না, তখন প্রত্যাদেশ হইল যে ভগবান কেদারনাথকে দর্শন করিলেই তোমাদের সমস্ত পাপ নিঃশেষে অপগত হইবে। এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা বহুক্লেশ ও বহুশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক হিমালয়গর্ভে কেদারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় বহু অন্বেষণেও সেই অদৃশ্য দেবতার দর্শন না পাইয়া তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইলে করুণাময় দেবদেব সহসা কতকগুলি মহিষের আকারে সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সেই প্রাণিসঞ্চারশূন্য হিমাচ্ছন্ন প্রদেশে অকস্মাৎ ঐরূপ মহিষযূথের সমাগম দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তাহা মায়াবী মায়া বলিয়া বিচার-বিতর্ক করিতেছেন, এই অবসরে মহিষগুলি

ক্রমে অদৃশ্য হইয়া একটী মহিষে পরিণত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেটীও অন্তর্দ্ধানের উপক্রম করিলে মহাবল মধ্যমপাণ্ডব প্রাণপণে ধাবমান হইয়া ঐ বিলীয়মান মহিষমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করিলেন। তাঁহার স্পৃষ্ট ঐ পশ্চাদ্ভাগ তৎক্ষণেই প্রস্তরীভূত হইয়া গেল। অবশিষ্টভাগ পাতাল-প্রবিষ্ট হইয়া প্রস্তরময় মূর্ত্তিতে নেপালে উত্থিত দৃষ্ট হইল। পাণ্ডবগণ দৈব-বাণীতে স্বরূপ অবগত হইলেন যে ঐ অদ্ভুত মহিষমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগ কেদারনাথ ও সম্মুখভাগ পশুপতিনাথ। এবং উক্তমূর্ত্তি দর্শনেই কেদার-নাথ-দর্শনের ফল হইবে। এক্ষণে একমূর্ত্তি ঐরূপ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই স্থানে অবস্থিত হইয়া আছেন, এই কারণে, ঐ উভয়মূর্ত্তি দর্শন না করিলে উক্ত জ্যোতির্লিঙ্গমূর্ত্তির পূর্ণদর্শন সিদ্ধি হয় না বলিয়া শিষ্টেরা বিবেচনা করেন। ব্যবহারও সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে। তন্নিমিত্ত কেদারনাথ-দর্শনের পর বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতেই আমাদের পশুপতিনাথ দর্শন করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু সকলদিক্ রক্ষাকরা বড় কঠিন কাজ। কেদারদর্শনের বৎসর গঙ্গোত্তরী হইতে আমরা যে গঙ্গাজল আনিয়া-ছিলাম, সংবৎসরের মধ্যে তাহা রামেশ্বরের মস্তকে চড়াইবার বিধান আছে। কেননা, সংবৎসর অতিক্রান্ত হইলে গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য থাকে না।* তদনুসারে কেদারদর্শনের পরবর্ত্তী চৈত্রে আমাকে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে যাইতে হইয়াছিল, পশুপতিনাথে যাওয়ার অবসর ঘটে নাই। এবার অবসর হইয়াছিল। কিন্তু অবসর হইলেই ত অভীষ্টসিদ্ধি হয় না, তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহার দর্শন মিলে না। তাই বলিতেছিলাম যে এবার

---

* ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিস্তুথ যামুনম্।
নার্ম্মদং দশভির্মাসৈ গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্য্যতি।

অর্থাৎ সরস্বতীর জল তিনমাসে, যমুনার জল সাতমাসে, নর্ম্মদার জল দশমাসে ও গঙ্গার জল সংবৎসরে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

তিনি নিতান্তই এ অধমকে টানিয়াছিলেন, তাই এবার বিনা উদ্‌যোগে অকস্মাৎ তাঁহার দর্শন পাইয়াছি।

কিরূপে তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার দর্শন পাইবার জন্য কিরূপে সে দুর্গমদেশের দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইলাম, পথ উত্তীর্ণ হইয়াও কত কষ্টে নিজ মনোরথ পূর্ণ করিলাম, কেমন সে দেশ, কিরূপই বা তথাকার অধিবাসী, সকল কথা পাঠকবর্গকে জানাইবার জন্য আমার এ প্রবন্ধের অবতারণা। কেদারযাত্রীর পক্ষে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রবন্ধটী এই গ্রন্থেরই অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম।

নেপাল অন্যান্য নূতন দেশের ন্যায় আমাদের পক্ষে নূতন ত বটেই, অধিকন্তু রাজশাসনে নেপাল সাধারণের পক্ষে দুষ্প্রবেশ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত। কেবল শিবরাত্রির সময় ছয়দিন মাত্র কাল সর্ব্বসাধারণ তীর্থযাত্রীর সম্বন্ধে ইহা অবারিতদ্বার হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এই রাজ্য অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত বলিয়া এখানে যাতায়াত সর্ব্বথা কষ্টকর ও সর্ব্বদা শঙ্কাপূর্ণ।

সেই নেপালযাত্রার সঙ্কল্প মনে বদ্ধমূল হইবামাত্র উক্ত মহামহিমান্বিত দেশ সম্বন্ধে আরও কত কথাই যে মনে উদিত হইতে লাগিল, তাহা লিখিয়া কি জানাইব? মনে হইল, সেই নেপাল—যাহা কত দীর্ঘকাল হইতে ভারতবর্ষের মধ্যে যথার্থ একটী স্বাধীন হিন্দুরাজ্য, লুপ্তপ্রায় কত তন্ত্রজ্যোতিষ একমাত্র যে-নেপালেই আজিও অলুপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় বলিয়া আমরা গর্ব্ব-গৌরব অনুভব করিয়া থাকি, সেই নেপাল—যথায় গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা, দেব-দ্বিজে ভক্তি, শাস্ত্রে বিশ্বাস, শাস্ত্রনির্দেশে অনুরাগ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের সারভূত সংস্কার ব্যবহারাদি আজিও অক্ষুণ্ণ আছে, শত শত দেবালয়ে যথায় দেবভক্তির মন্দাকিনী আজিও পূর্ণপ্রবাহে প্রবাহিত, যাহার আসন্ন পুণ্যভূমিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব আত্মমাহাত্ম্য

বিশ্বব্যাপ্ত করিলেও একমাত্র যে-নেপালেই তদীয় ধর্ম্মের পূর্ণপ্রভাব এখনও বর্ত্তমান, যে-নেপাল-অধীশ্বরের কত গৌরবগাথা কত কাব্য-সাহিত্যে, কত কবিতায় উপকথায় সর্ব্বদা কীর্ত্তিত*, যথাকার অধিবাসী সেই দেশের শালতরুর ন্যায়ই যথার্থ সারসম্পন্ন, বিশেষতঃ যে-নেপালের দুর্দ্ধর্ষ গোর্খাসৈন্য ও তাহারই অদূর-প্রতিবেশী পঞ্জাবী শিখসৈন্য লইয়া প্রবল-প্রতাপ ইংরেজরাজ আজি প্রকৃতপক্ষেই † জগজ্জয়ী, সেই দুর্গম-রাজ্যে আজি আমরা গমনে উদ্যত হইয়াছি! আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের সহিত কত আতঙ্কও মনে উদিত হইল। কিন্তু দেবদর্শন-লালসা প্রবল হইলে তাহার নিকট অন্য আশঙ্কা কতক্ষণ মনে স্থান পাইতে পারে? অবিলম্বে আমার আত্মীয়, বহুদিনের কাশী-প্রবাসী শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথের নিকটে গিয়া নেপালের পথ ঘাট জানিবার উপায়ের জন্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন, একটু বিলম্ব করুন, এখনি আমি আপনার জ্ঞাতব্য বৃত্তান্ত আপনাকে সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

বস্তুতঃ তাঁহার অনুসন্ধানশক্তি অদ্ভুত। দুইঘণ্টার মধ্যেই তিনি নেপালের পথের বৃত্তান্তপূর্ণ একখানি পত্র আমায় আনিয়া দিলেন।

পত্রখানিতে এইরূপ লেখাছিল;—(১) রেলপথে বেনারস হইতে ভাট্নি, ভাট্নি হইতে শোণপুর, শোণপুর হইতে মজঃফরপুর, তথা হইতে সিগৌলি, সিগৌলি হইতে রক্সৌল। এইখানেই রেলওয়ে শেষ।

---

* রম্যাণি স্থল-সৌষ্ঠবেন কতিচিদ্ বস্তূনি কস্তূরিকা
নেপালক্ষিতিপাল-ভালতিলকে পঙ্কে ন শঙ্কেত কঃ? ইত্যাদি।

অর্থাৎ স্থানমাহাত্ম্যে কতকগুলি অসার-অপদার্থ রমণীয়পদার্থে পরিণত হয়। যেমন নেপাল-ক্ষিতিপালের ভালদেশে যদি একবিন্দু পঙ্ক কোনরূপে লাগিয়া থাকে, তাহা মৃগমদের তিলক বলিয়া কাহার না ধারণা হয়?

† অর্থাৎ মোগল-বাদশাহ অরঙ্গজীব যে আলমগীর বা জগজ্জয়ী উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আড়ম্বরমাত্র।

রক্সোল হইতে ১৷৷০ মাইল যাইয়া বীরগঞ্জ। বীরগঞ্জে পাশ লইতে হইবে।

(২) বীরগঞ্জ হইতে প্রত্যুষে দশ মাইল পথ গিয়া সিমিরাবাসা বাজারে স্নানাহার। পরে ৪ ঘণ্টা বেলা থাকিতে যাত্রা করিয়া আট মাইল পথ যাইতে হয়। এই পথে ভয়ঙ্কর জঙ্গল পার হইয়া ভিসাখুরী নামক স্থানে ধর্ম্মশালায় বা দোকানে রাত্রিবাস।

(৩) প্রাতে স্নানাহার করিয়া ৯টা ১০টার মধ্যে যাত্রা। আন্দাজ ১২ মাইল যাইয়া সুপারিটাঁড় নামক স্থানে দোকানে রাত্রিবাস।

(৪) প্রাতে স্নানাহারপূর্ব্বক দশ মাইল পথ গিয়া ভীমফেড়ী নামক স্থানে সন্ধ্যার পূর্ব্বে পঁহুছিতে হইবে। তথায় ধর্ম্মশালা বা দোকানে রাত্রিবাস।

(৫) পরদিন প্রাতে স্নানাহারপূর্ব্বক দুই মাইল বিষম চড়াই পথে পর্ব্বতারোহণ। গড়ি নামক স্থানে সঙ্গের দ্রব্যাদি পরীক্ষা। তথা হইতে এক মাইল উতরাই। পরে কুলিখানী বা চেৎলঙ্গ্ নামক স্থানে অবস্থিতি। উভয় স্থানেই ধর্ম্মশালা আছে। তথা হইতে আর একটা পাহাড় পার হইয়া নেপাল-উপত্যকা পাহাড়। ঐ পাহাড় পার হইয়া ৬ মাইল গিয়া নেপাল-রাজধানী। রাজধানী হইতে পশুপতিনাথ দুই মাইল। ইতি।

পত্রখানি পাইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। নিতান্ত অজ্ঞাত পথের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা মোটামুটি একরূপ দূর হওয়ায় চিত্ত যেন কতই গ্লানিমুক্ত হইল। পত্রখানির বৃত্তান্তগুলিও ঠিক্‌ঠিক্ লিখিত ছিল। তবে শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে নিত্য যিনি যতদূর চলিতে পারেন, না পারেন, সে পৃথক্ কথা। কেবল দোকানে বা ধর্ম্মশালায় রাত্রিবাসের কথা ঐ পত্রে যে কয়েক বারই লিখিত আছে, ঐটীই ভুল। নেপালের পথে কোনও দোকানদার কাহাকেও রাত্রিবাসের স্থান দেয় না। তবে বুদ্ধি-কৌশলে

কেহ কোথাও কদাচিৎ স্থান পাইয়া থাকেন, সে তাঁহার ভাগ্য। তাহা রীতির ব্যতিক্রমই বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মশালাও যাহা আছে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। তাহাতে কত জনের জায়গা হইতে পারে? তবে সহরে প্রবেশিয়া অবশ্য যথেষ্ট ধর্ম্মশালা পাওয়া যায়, নিজ পশুপতিনাথে ত কথাই নাই। কিন্তু দীর্ঘ পথখানি অতিক্রম করাই যে বড় বিষম কথা। এই সঙ্কট পথের মধ্যে প্রায়ই জঙ্গলে, মাঠে, নদীতটে সহস্র সহস্র যাত্রী মিলিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়।

যাহা হউক, আমরা ২৬শে মাঘ শুক্রবার সপ্তমী, রাত্রি ৮টার সময় বেনারস-ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া তথা হইতে একবারে রক্‌সৌল পর্য্যন্ত টিকিট করিলাম। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ২।০ দুই টাকা চারি আনা। বিস্তর যাত্রী ট্রেন বোঝাই হইল। বাবা পশুপতিনাথের বিপুল জয়ধ্বনির সহিত তখনি ট্রেন ছাড়িয়া দিল। আমরা আপাততঃ নিশ্চিন্ত হইলাম। তবে দর্শনলাভ সম্বন্ধে তখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই। কেন না, আমরা বড় সময় অতীত করিয়া রওনা হইয়াছি। তবে এখনও যাত্রী যাইতেছে এবং আমরা ট্রেনে উঠিতে পারিয়াছি, এই ভাবিয়াই আপাততঃ কিয়ৎপরিমাণে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম। আশা ও উৎসাহ আসিয়া দুশ্চিন্তার স্থান অনেকটা অধিকার করিয়া বসিল।

বোধ হয় রাত্রি ৩টায় ভাট্‌নি ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিয়া ছাপরা-অঞ্চল-গামী গাড়িতে উঠিতে হইল। ভাট্‌নি হইতে অন্য পথে অর্থাৎ গোরখপুর দিয়াও রক্‌সৌল যাওয়া যায় এবং সেই পথই বোধ হয় অধিক সুবিধাজনক। কিন্তু গোরখপুরে তখন অত্যন্ত প্লেগ হইতেছে শুনিয়া কেহ সে পথের দিকে অগ্রসর হইলেন না, আমরা ত সে পথের নামও করিলাম না। প্রত্যুষে ছাপরার বৃহৎ ষ্টেশন হইয়া বেলা ৯টায় আমাদের গাড়ী শোণপুর ষ্টেশনে পঁহুছিল। এইখানে আমাদিগকে ট্রেন বদল করিয়া মজঃফরপুর-গামী ট্রেনে উঠিতে হইল।

যাঁহারা কলিকাতা হইতে পশুপতিনাথ রওনা হয়েন, তাঁহারা লুপ লাইনে মোকামাঘাট পঁহুছিয়া ষ্টীমারে গঙ্গা পার হইয়া সিমিরাঘাটে নামেন। ঐ স্থানে তাঁহাদিগকে বি. এন. ডবলিউ. রেলে উঠিতে হয়। কলিকাতা হইতে রক্সৌল তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীভাড়া ৪॥৴০ চারি টাকা নয় আনা।

বেলা ১টার সময় মজঃফরপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তথায় একরূপে আহ্নিক করিয়া লইলাম, স্নানের অবসর হইল না। এই সময়ে মজঃফরপুরে ট্রেন বদল করিয়া আমাদিগকে বেতিয়া-গামী ট্রেনে উঠিতে হইল। কলিকাতা-অঞ্চলের যাত্রীদিগেরও এই ট্রেন। মজঃফরপুর বৃহৎ জেলা, সহরও বৃহৎ, পাটনার নীচেই। লোকের মুখে শুনিলাম, উহা ছোট-কলিকাতা। কিন্তু দেখা কিছুই হইল না। আজি-কালিকার রেলে তীর্থযাত্রা ঐরূপই হইয়া থাকে। মজঃফরপুর হইতে সমানভাবে লিচুর বাগান মতিহারী জেলা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম। মজঃফরপুরের লিচু যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহা সকলেই জানেন। মতিহারীও একটী বড় ষ্টেশন। তার পর সিগৌলি-জংশন। এখান হইতে গাড়ি বরাবর বেতিয়ায় যায়। সুতরাং আমাদিগকে এখানে ঐ গাড়ি বদল করিয়া পৃথক্ গাড়ীতে উঠিতে হইল। সিগৌলি হইতে মাঝে একটা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়াই আমরা রক্সৌল পঁহুছিলাম। এ পথের ট্রেন এখানেই শেষ।

সন্ধ্যা হয় হয় বলিয়া, আমরা তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইয়াই আগের যাত্রীর দল সহসা স্থগিত হইল। ক্রমে মধ্যের, শেষে আমাদেরও গতিনিবৃত্তি হইল। কারণ জিজ্ঞাসিয়া জানা গেল, আগে বীরগঞ্জ নামক স্থানে অসংখ্য যাত্রী বৈকালে পাশ পায় নাই, তাহারা ঐ স্থানেই জমায়েত আছে। আর অধিক যাত্রীর তথায় স্থান হইতেছে না। সরকারি লোকেও আর যাইতে দিতেছে না। এই

সংবাদ পাইয়া যাত্রীরা পথিমধ্যেই যে যেখানে পাইলেন, এক একটা আড্ডা গাড়িয়া বসিলেন। আমরা আরও একটু অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলাম, রাস্তার ধারে ধারে দলে দলে লোকারণ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-হাতি একটী ক্ষুদ্র নদী চলিয়াছে। শুনিলাম, ঐ নদীটীই দো-সীমানা, ও পার ইংরেজের অধিকার, এ পার নেপালের। দো-সীমানা বলিয়া চোর-ডাকাতেরও কিছু ভয় আছে। অর্থাৎ সীমানার গোলে কোন পক্ষই ঐ সকল শাসনে বিশেষ মনোযোগ দেন না। উপায় কি আছে? সকলেই এক একটা গাছতলা দেখিয়া আশ্রয় লইয়াছেন দেখিয়া আমরাও একটা গাছতলায় আশ্রয় লইলাম। প্রচণ্ড শীতে এরূপ নিরাশ্রয়ে গাছতলায় রাত্রিযাপন আর কখনও হয় নাই, এবার তাহা হইল। গাছতলাটীর একদিকে গৃহস্থ আমরা কয়েকজন, অপর দিকে সাধু কতকগুলি থাকিলেন। আজি উভয় পক্ষই যেন উভয় পক্ষের আশ্রয়। সাধুরা ধুনী জ্বালাইলেন, কিন্তু তাহাতে সে কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রির অন্ধকার যেন আরও ভীষণ দেখাইতে লাগিল। সেই অন্ধকারে, লক্ষ্যালক্ষ্য উচ্চ-নীচ অজ্ঞাত পথ দিয়া নদীগর্ভে নামিয়া জল সংগ্রহ করা যে কত কষ্টকর এবং ঐরূপ পথে ক্ষণে ক্ষণে কুক্কুর-তাড়িত হইয়া দোকান হইতে চা'ল ডা'ল আহরণ করা যে কিরূপ ক্লেশকর, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিতে পারিবে না। দিনে অনাহার ও পরদিনে আহার সম্বন্ধেও ঐরূপ অনিশ্চয় বলিয়া অতদূর কষ্ট সহ্য করিতে হইল। অদূরবর্ত্তী একজন গৃহস্থ সাধুদিগকে ও আমাদিগকে শয্যার জন্ম অনেক-গুলি বিচালি দিয়াছিল। আমরা কিন্তু সেগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই, উনন ধরাইতে কতকগুলি নষ্ট করিয়াছিলাম। অবশিষ্ট শয্যার কাজে লাগিয়াছিল।

আমি প্রত্যূষে জাগিয়া দেখিলাম, সাধুরা কেহ কেহ স্নানের উদ্‌যোগ করিতেছেন, কেহ স্নানান্তে বিভূতি মাখিতেছেন। নিজেদের দিকে

চাহিতেই দেখিলাম, সকলেই জড়-সড় হইয়া নিদ্রিত, কেবল আমার উজ্জ্বল করোয়াটী যেন উপেক্ষিত হইয়া শয্যা হইতে একটু দূরে পড়িয়া আছে। সাধুদিগের মধ্যে একজন তাহা দেখাইয়া বলিলেন, বাচ্চা, ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র রাত্রিকালে ঐরূপ অনাবৃত অবস্থায় ও ঐরূপে ছড়াইয়া রাখিতে নাই, বিশেষ পথে-ঘাটে। যাহা রক্ষণীয়, তাহা চিরকাল রক্ষাই করিতে হইবে। ঐগুলির প্রতি একেবারে চক্ষু বুজিয়া থাকিলে তাহা রক্ষা হইবে কেন? তবে এ ক্ষেত্রে আমরা অবশ্য রাত্রে জাগিয়াছিলাম, দুষ্টলোক এদিকে ভিড়িতেই সাহস পায় নাই।

শুনিয়া আমি শিক্ষা পাইলাম, ত্রুটি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তা ছাড়া আরও একটু আমার মনে উদয় হইল। সাধু ত সামান্য দ্রব্যরক্ষাচ্ছলে আমাদের নব্যদের স্ত্রীস্বাধীনতার উপর কটাক্ষ করেন নাই?

যাক্, একটা মোটা কথা বলিতে ভুলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু সেটা ভুলিবার উপযুক্ত নয়, তাই ভুলিয়াও ভুলিলাম না। বাঙ্গালীর প্রতিজ্ঞার কথা সকলেই জানেন, আরও একটু সামান্য পরিচয় ইহাতে হইবে। কথা এই ;—আমাদের প্রত্যেকের নিকট যে সামান্য জিনিষপত্র আছে, তাহা আমরা নিজে নিজেই এবার লইয়া চলিব, তাহার জন্য আর গণ্ডায় গণ্ডায় লোক করিব না, ইহাই আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। বাস্তবিক, সামান্য এক একটা ব্যাগ বই ত নয়, অন্যেরা যে বুকে-পিঠে এক একটা মোট লইয়া পথ চলে। তাহারাই মানুষ, আর আমরা কি মানুষ নহি? দেখিয়া শুনিয়া ত ঐরূপ প্রতিজ্ঞা হইবারই কথা, হইয়াছিলও তাই। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল কতক্ষণ? রক্সৌল ষ্টেশনে নামিয়া কয়েক পদ দ্রুতবেগে চলিবার সময় প্রতিজ্ঞাটী ষোল আনা খর-খর রক্ষা হইয়াছিল! আর কয়েক পদ অগ্রসর হইতেও প্রতিজ্ঞাটী বজায় রহিল, কিন্তু দোলায়মান হইল। তখন হাতে ঝোলান ব্যাগ কখন কাঁধে, কখন পিঠে উঠিতেছে। আরও কয়েক পা আসিয়া ম্লানমুখে পরস্পর

তাকাতাকি আরম্ভ। তার পর কুলি লোক দেখিয়াই লজ্জা খোওয়াইয়া হাঁকাহাঁকি উপস্থিত! কেন না, তখন "সখি আমায় ধর ধর" গোচ অবস্থা হইয়াছে। অধিক বিস্তার করিব না। এক ঘণ্টারও ভর সহিল না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের দুর্জ্জয়-উৎসাহজনিত প্রবল প্রতিজ্ঞাটী মচ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া দুখানা হইয়া গেল!

অন্যেরাও মানুষ, আমরাও মানুষ বটে, কিন্তু কেবল আকারে এক হইলেই ত হয় না, অন্তঃসার বলিয়া একটা জিনিষ আছে। সেটা অন্তরে থাকে, বাহিরে দেখা যায় না। তবে এইরূপ কোন কাজে হাত দিলে বাহিরেই সেটা স্পষ্ট দেখা যায়, আর মানুষে মানুষে পার্থক্যও তখন প্রত্যক্ষ হয়।

আমাদের দুই জনের ভাগে যে কুলি হইয়াছিল, তাহার নাম শিবরাম মাহাতু। মতিহারী জেলায় তাহার ঘর, ছোকরাটী নিতান্ত নিরীহ।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি, এখানকার কুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া, দেখিয়া শুনিয়া নিযুক্ত করিতে হয় ও নিযুক্ত করার পর বরাবর তাহাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। কেন না, অনেক কুলি ভিড়ের সুযোগে, কি মালিকের একটু অমনোযোগে মোট লইয়া অন্তর্দ্ধান করে বলিয়া একটা অখ্যাতি আছে। আমরা কিন্তু আমাদের শিবরামটীকে সেরূপ না বাছিয়া উপস্থিতমত লইলেও, সে যে অতি ভদ্র ছিল, তাহার পরিচয় পদে পদে পাইয়াছি।

---o---

বীরগঞ্জ।

২৮শে মাঘ।

প্রভাতে বীরগঞ্জ পঁহুছিয়াই পাশের জন্য হুড়াহুড়ি। পূর্ব্বদিনের বিস্তর যাত্রী এখানে জমা হইয়াছিল, তাহার উপর আমরাও বিস্তর যাত্রী

আসিয়া পঁহুছিলাম। কাজেই লোকে লোকারণ্য, তাহাদের ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি ও তজ্জন্য বিষম কলরব। কিরূপে পাশ পাইবার উপায় হইবে, সহসা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ক্রমে দেখিলাম, কতকগুলি সরকারি লোক যাত্রীদিগকে খুব দুর লম্বা লম্বা সারি দিয়া বসাইয়া দিতে লাগিল। অনেক যাত্রী নির্ব্বোধ, তাহারা সারি ভঙ্গ করিয়া, কেহ বা আগন্তুক উপস্থিত হইয়া, উভয় সারির মধ্যের ফাঁক দেখিয়া বসিয়া পড়ে। নিয়ত ঐ সকল লোককে উঠাইয়া নূতন সারিতে বসাইতেও বিলক্ষণ গোলযোগ। এইরূপে শ্রেণীবন্ধনে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। আমাদের সমীপবর্ত্তী একটী হিন্দুস্থানী যাত্রী ঐরূপ বিলম্ব দেখিয়া একজন নেপালী পাহারাদারকে কহিল, ভাই, আমাকে জল্‌দি পাশ দিয়া দিতে পার? আমি তোমাকে দুই আনা পয়সা দিতেছি। পাহারাওয়ালা ক্রোধকম্পিত মূর্ত্তিতে পায়ের জুতা খুলিয়া তাহা উম্‌কাইয়া কহিল, ফের ঘুসের কথা কহিবি কি জুতায় মুখ ছিঁড়িয়া দিব। এ কি তোর ইংরেজের মুলুক, তাই কথায় কথায় ঘুন্ চলিবে ভাবিতেছিস্? আমি নেপালীটার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। যাহা হউক, আর অধিকক্ষণ আমাদিগকে এ সকল ভোগ করিতে হইল না। অবিলম্বে বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু হাস্যমুখে দেখা দিলেন। একে একে যাত্রীদের হাত দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটী বাবু পাশ দিতে দিতে গেলেন। আমি ডাক্তারবাবুকে বলিলাম, এত আড়ম্বরের পর এই আপনাদের পরীক্ষা হইল? ডাক্তারবাবু কহিলেন, "আপনি দেখিতেছি বাঙ্গালী। তা এই পরীক্ষা আর কি? পাশ দিবার জন্য পরীক্ষার কড়াকড়ি করিব কেন? পরীক্ষা যাহাতে সহজে হয়, তাহাই ত কর্ত্তব্য। আর সেইরূপে করিবারই আমাদের রাজার হুকুম আছে।" আমরা শুনিয়া বড় সুখী হইলাম। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে পাশ পাইতে লাগিল। আমরা পাশ পাওয়ার পরই পাহারাওয়ালাদের নির্দ্দেশক্রমে অপর রাস্তা দিয়া নির্গত হইয়া পুনর্ব্বার সদর রাস্তায় আসিয়া

মিলিত হইলাম। তখন বেলা ৮টা হইয়াছে, অথচ অদ্য অনেক পথ চলিতে হইবে। কি করা যায়, পাকের পরিবর্ত্তে ফলাহার করাই কর্ত্তব্য স্থির হইল। দোকানে গুড়, চিড়া প্রভৃতি কেনা হইল। চিড়ার সের /০ এক আনা ও গুড়ের সের ৴১৫ তিন পয়সা করিয়া পাওয়া গেল। দোকানদার কহিল, এখান হইতে আরও চিড়া সংগ্রহ করিয়া লউন, আগে বড় মাঙ্গা (মহার্ঘ) হইবে। আমরা তাহা বুঝিলাম না। বুঝি নাই বলিয়া আগেকার চটীতে ঐ চিড়াই কাঁচি সের /১৫ সাত পয়সা করিয়া কিনিতে হইয়াছিল।

বীরগঞ্জ বেশ সহরের মত স্থান। অনেক পাকা মোকাম দেখিলাম। প্রকাণ্ড বাজার, দুইধারে অসংখ্য দোকান। গাড়ীতে ছাতা হারাইয়াছিলাম, এখানে একটী কিনিয়া লইলাম। একটা স্থানে ইন্দারা হইতে জল উঠাইয়া স্থান পরিষ্কার পূর্ব্বক আহ্নিক সারিয়া লইলাম। তার পর ফলাহার করিয়া রওনা হইতে আর বিলম্ব হইল না।

—o—
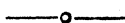
প্রান্তরের পথে।

সারি দিয়া অবিচ্ছেদে যাত্রী চলিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালী যাত্রী একটীও চক্ষে পড়ে না। পাশ দেওয়ার সময় যে ডাক্তারবাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম, গতকল্য কতক ও তাহার পূর্ব্বদিন বিস্তর বাঙ্গালী যাত্রী রওনা হইয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হইল। কেন না, বাঙ্গালীরা আপন শক্তি-সামর্থ্য বুঝে, অসময়ে রওনা হইয়া সামলাইতে পারিবে কেন? তাই আগেই রওনা হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা আজি হিন্দুস্থানী, মৈথিলী, মারাঠী প্রভৃতি নানাদেশীয় স্ত্রী-পুরুষ যাত্রীর সহিত মিশিয়া পরমানন্দে পথবাহন করিতে লাগিলাম। পথও বেশ বিস্তৃত, কিন্তু বিস্তৃত হইলেও আমরাও তাহা জুড়িয়া চলিয়াছি। নানাদিক্ হইতে

ঝরণার জল আসিয়া আমাদের পথের সাঁকোর নীচে দিয়া বহিয়া যাইতেছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে পগার দিয়াও বহিয়া যাইতেছে। দুই দিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। ঐ বিশাল ক্ষেত্র যব, গম প্রভৃতি নানা শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ও কমনীয় হরিতবর্ণে সুশোভিত। রাস্তার উপর স্থানে স্থানে চিড়া, গুড়, ছাতু, বেগুন ও কড়াইস্‌্ঁটী প্রভৃতি বিক্রয় হইতেছে। বামধারে একস্থানে কি সতেজ, সমুন্নত ও ঘনপল্লবাবৃত একটী বিল্ববৃক্ষ দেখিলাম! বিল্ববৃক্ষ ঐরূপ সতেজ ও ঐরূপ নিবিড়-শাখাপল্লবে সমাচ্ছাদিত আমি আর কোথাও দেখি নাই। সাক্ষাৎ দেব-দেব যেন তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন বলিয়া বোধ হইল!

কিছু পরে একটা নদী পাইলাম, নদীর নাম সরিসোওয়া। নদীটীর উপর লোহার টানা দেওয়া একটা পুল আছে। ঐ নদীর তীরবর্ত্তী গ্রামটীর নাম পরোয়ানিপুর। গ্রামে কয়েকখানি দোকান আছে। আরও কিছু-দূরে আর একখানি গ্রাম পাইলাম, নাম জিৎপুর। গ্রামের ধারে যে নদী আছে, তাহার নামও জিৎপুর। বোধ হয় গ্রামের নামানুসারে নদীর নাম হইয়া থাকিবে। গ্রামটীতে একটী ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা ও একটী ইন্দারা আছে। এ সকল সামান্য সামান্য দানেও পথবাহী লোকের সময়ে সময়ে যে কত উপকার হয়, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এ পথে লোকও অতি বিস্তর। যাত্রীর ত কথাই নাই, তদ্‌ভিন্ন দলে দলে ভুটিয়া, নেপালী ও পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ কুলীরা রক্‌সৌল ষ্টেশন হইতে নানাবিধ মাল পিঠে করিয়া অনবরত নেপালে লইয়া যাইতেছে। ঐ সকল মালের মধ্যে টিনের চাদর, সুতার বস্তা, কেরোসিন তৈল, তামার পাত, নানারূপ কল প্রভৃতি দেখিতে পাইলাম। কতক মাল বয়েল-গাড়ীতে যাইতেছে। ঐ সকল গাড়ী ভীমফেড়ী পর্য্যন্ত যায়। তথা হইতে ঐ সকল কুলিরা ঐ মাল সমস্ত পিঠে করিয়া পাহাড়ে উঠে। অনেকে দুই মণ পর্য্যন্ত মাল পিঠে লইয়া ঐ দুর ও উৎকট পাহাড়ী পথ

ভাঙ্গিয়া চলে। সাধারণতঃ নেপালী, ভুটিয়া ও উভয় স্থানের পাহাড়ী স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী। বর্ণ গোলাপফুলের ন্যায় অতি চমৎকার। তবে কুলিগিরি করিয়া অনেকেরই বর্ণ তামাটে হইয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল কাঠকুড়ানীর মধ্যেও আমাদের দেশের রাজরাণীর মত বা তদপেক্ষাও সুন্দরী অনেক আছে। তবে ভাষা অবোধ্য। কেহ কেহ হিন্দী কতক অধিক বুঝে, তাই রক্ষা। নূতন দেশ ও তাহার নূতন সৌন্দর্য্য এবং নূতন অধিবাসী ও তাহাদের নূতনতর চাল-চলন, এই সকল দেখিতে দেখিতে বহুদূর পথ অতিক্রম করিয়া প্রান্তরের প্রায় শেষভাগে উপনীত হইলাম। স্থানটী অতি রমণীয়, যেন ইচ্ছা করিয়াই ঐ বিস্তৃত স্থানটী কর্ষণ না করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। পরে শুনিলাম, উহা বাস্তবিকই তাহাই। নেপালের অধীশ্বর কদাচিৎ এদিকে আগমন করিলে ঐ স্থানে তাঁহার তাম্বু পড়ে বলিয়া উহা ঐরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার পরই অরণ্যের প্রান্তভূমি, প্রাচীরের ন্যায় উহা যেন আমাদিগের দৃষ্টিপথের সমস্ত সম্মুখভাগ স্নিগ্ধশ্যাম শোভায় বেড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হইল। আবার উহারই মধ্যে মধ্যে কতকগুলি পলাশগাছ পল্লবহীন, অথচ কেবল প্রফুল্ল-রক্তপুষ্পময় শাখায় তীক্ষ্ণোজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়া আমাদিগের দৃষ্টিকে একবারে মোহিত করিয়া দিল। রমণীয়তায় আকৃষ্ট হইয়া স্থানটীর নাম জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, উহার নাম রামবন।

——o——

সিমিরাবাসা।

ক্রমে আমরা বনেরও নিকটবর্ত্তী হইলাম, সিমিরা-চটীও সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হইলাম। প্রথমে একটা ইন্দারা দেখা গেল, তার পরই চটী। চটীতে দুইধারে বিস্তর দোকান। দোকানগুলি সমাপ্ত হইলেই একটা জলের পাইপ ও তাহার সংলগ্ন বৃত্তাকার একটা বাঁধান জলাধার স্থান। তাহার

মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত একটা ফোয়ারা হইতে অনবরত জলধারা সবেগে উদ্‌গত হইয়া বৃত্তস্থানটীকে জলপূর্ণ করিতেছে। যাত্রীরা অন্যান্য কাজ সেই জলেই সম্পন্ন করিতেছে, কেবল পানীয় জলের কার্য্য ঐ জলযন্ত্রের উদ্গত ধারাজলে নির্ব্বাহ করিতেছে। জলশূন্য অরণ্য প্রদেশে ঐরূপ জলদান-কার্য্য নিতান্ত প্রশংসনীয় ও পুণ্যপরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ কি? শুনিলাম, ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী মহারাজ দেব-সামশের জঙ্গ্‌বাহাদুর স্বকীয় স্বর্গীয়া পত্নী মহারাণী কর্ম্মকুমারী দেবীর স্মরণার্থ পিপাসার্ত্ত পথিকগণের পানীয়ক্লেশ নিবারণোদ্দেশে এই সকল জলের কল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। জঙ্গলের মধ্যে দুই দুই মাইল অন্তর ঐরূপ জলের কল আছে। সকলই ভাল, কেবল যাত্রীদের রাত্রিবাসের উপযুক্ত আশ্রয়স্থান নাই। তাহার পরিবর্ত্তে ঐ জলের পাইপের নিকটে কতকদূর জঙ্গলের গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অসংখ্য যাত্রী সেই স্থানে পড়িয়া আছে, তথায়ও স্থান সমাবেশ না হওয়ায় অবশিষ্ট যাত্রী জঙ্গলের মধ্যে বৃক্ষমূলে স্থান করিয়া তথায় পাক-শাক, শয়ন-ভোজন করিতেছে। তাহাদের কলরবে দিগ্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে। সে বনে যদি বাঘ ভালুক থাকে, তাহারাও নিশ্চয় ঐ প্রচণ্ড কলরবে একদিকে পলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু দিবাভাগ না হয় সে স্থানে একরূপে কাটে, সূর্য্যদেবের অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিলে, বিশেষতঃ হিমালয় প্রদেশের পুঞ্জীভূত প্রচণ্ড শীত চতুর্দ্দিক্ ছাইয়া ফেলিলে সেই নিরাশ্রয় প্রান্তরে ও জঙ্গলে রাত্রিযাপন যে কি ভীষণ কষ্টকর, তাহা লিখিয়া অনুভব করান যায় না। এরূপ কষ্ট আমি কখনও ভোগ করি নাই। আমরা শয়ন করিলে আমাদের প্রত্যেকের নীচের কম্বল, গাত্রে গাত্রবস্ত্র ও তাহার উপরিস্থিত ১খানি কম্বল সব যেন জল হইয়া গেল। সাধুরা ধুনী জ্বালাইলেন, হিন্দুস্থানী যাত্রীরাও জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করিয়াছিল, এখন সেই কাঠে আগুনের উদ্‌যোগ করিল, আমরা ভদ্র বাঙ্গালী,

(অথচ সকলের সঙ্গে সমান হইতে চাই) কাঠ কুড়াইতে জানি না এবং শীতের এতদূর মর্ম্মও জানা ছিল না, আমাদের কেনা কাঠ পাক-শাকেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এখন চক্ষুঃস্থির! হাঁতড়াইয়া কিছু পাতা জড় করিলাম ও দেশালাই দিয়া তাহা জ্বালিলাম, কিন্তু সে উত্তাপ ত ক্ষণিক, বরং ঐরূপ করিয়া তার পর যে ঠাণ্ডা বোধ হয়, তাহা যেন দ্বিগুণ হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত করে! আর সে অন্ধকারে পাতাই বা পাইব কোথায়? অন্যেরও ত সেই প্রয়োজন। অগত্যা হাত-পা গুটাইয়া কেবল অন্ধকারই দেখিতে হইল! হায় রে, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার কথা কত বার যে গীতায় শুনিয়াছি, শুধু শুনিয়াছি কেন, শত সহস্রবার তাহা আবৃত্তিও করিয়াছি এবং ঐ আবৃত্তির বলে যোগী হইয়াছি বলিয়াও কখন কখন মনে অভিমান পোষণ করিয়াছি, সে সকল কি এখন কোন কাজেই লাগিল না! ফলতঃ এত আবৃত্তি, এত বক্তৃতাতেও যদি অভ্যাসযোগে সিদ্ধ না হওয়া যায়, তবে ত বাঙ্গালী নাচার! এই সকল যতই ভাবি, ততই যেন থর-হরি কম্প আসিয়া উপস্থিত হয়, আমার কথাগুলি যেন ঠেলিয়া ফেলে, বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠে। নিতান্ত অনুপায়ে যথাসাধ্য গাত্রবস্ত্রগুলি টানাটানি করিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদনপূর্ব্বক চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিলাম। এত যে আমার স্বাভাবিক গাঢ়নিদ্রা, তাহাও আজি দুর্লভ হইল। পথশ্রান্তিতে একটু নিদ্রাবেশ হয়, আর থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ কি কারণে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দারুণ শীতের যন্ত্রণা অনুভব করাইয়া দেয়। অমনি, সন্ন্যাসীরা বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন, কাণে আওয়াজ আসে। ভাবিলাম এই জন্যই পশুপতিনাথের যাত্রা এত কঠিন বলিয়া লোকে বিখ্যাত। আবার শেষরাত্রি হইতেই সেই দুর্জ্জয় শীতে যাত্রীদিগের রওনা আরম্ভ! আমার ত সে সময় শীত আরও জমাট বাঁধিয়াছে বলিয়াই বোধ হইল। কিন্তু কি করা যায়, বহুক্ষণ ভাব্য-ভাবনা করিতে করিতে আমাদিগকেও ক্রমে উঠিতে হইল।

জঙ্গলের পথ—ভিসাখুরী।

অদ্য ২৯শে মাঘ সংক্রান্তি। বন প্রথম পাইয়া কল্য তাহার মধ্যেই রাত্রিবাস করা গিয়াছে। চিঠীর লিখনানুসারে কল্য আমরা ১৮ মাইল পথ হাঁটিতেও পারি নাই, জঙ্গলও অতিক্রম করিতে পারি নাই। অদ্য তাহার বাকি ৮ মাইল জঙ্গল অতিক্রম করিতে হইবে। প্রত্যুষেই তাহা আরম্ভ করা গিয়াছে। সম্পূর্ণ প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত দল ছাড়া হইয়া চলিতে সাহস হইল না। ক্রমে আলোক পরিস্ফুট হইল। চারিদিকের বন এখন দুই পার্শ্বে বোধ হইল। কি নিবিড় বন! উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসকল সরলভাবে অনবরত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, আর শাখা-পল্লবে নিবিড়ভাবে উপরিভাগ একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে! সূর্য্যরশ্মির তথায় প্রবেশাধিকার নাই! সূর্য্যদেব কতদুর উঠিয়াছেন, তাহাও বুঝিবার যো নাই। কেবল অন্ধকার-ভার দুর হইয়াছে ও সঙ্গে সঙ্গে আলোকের সঞ্চার হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহার উদয় যতদুব বুঝিতে পারা যায়। এ রাজ্যে তাঁহার এইটুকুমাত্র আধিপত্য! সেই অগাধ জঙ্গলের মধ্য দিয়া আমরা ক্রমাগতই চলিয়াছি। জঙ্গলেরই ইহা অবাধ অনন্ত সাম্রাজ্য! এত যাত্রীর সঙ্গে না হইলে এ পথ অতিবাহন কি ভীষণই হইত! এত দল বলের মধ্যে থাকিয়াও যখনই দুই পার্শ্বে দৃষ্টি করা যাইতেছে, তখনি আতঙ্কিত হইতে হইতেছে। আবার জঙ্গলের তলদেশ স্থানে স্থানে বেশ পরিষ্কার। মধ্যে মধ্যে যাত্রীরা ঐ সকল স্থানে যাইতেছে, আর দাঁতন ভাঙ্গিয়া আনিতেছে। সে যাহা হউক, এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়াও আমাদের যাত্রীর রাস্তাটী বেশ প্রশস্ত। এ প্রশস্ততা এই পশুপতিনাথ-যাত্রা উপলক্ষেই রাজাজ্ঞা অনুসারে হইয়া থাকে। অন্য সময়ে জঙ্গল, রাস্তার উপর যথাসাধ্য আপন অধিকার বিস্তার করে। গুল্ম-লতাদি যেন তাহাদের সুকুমার হাতগুলি চারিধারে যথাশক্তি বাড়াইয়া বক্ষপথের

কঠোর-কর্কশ অঙ্গ অনেকাংশে ঢাকিয়া ফেলে। পথ যেন তখন বহু-ভাগে বিভক্ত হয়। গাড়ীর চক্ররেখার মত কতকগুলি সঙ্কীর্ণ রেখা পথের সূচনা করে মাত্র। এ সকল পথে মাল-বোঝাই বিস্তর গো-গাড়ী দুই তিন সারি দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করে। সুখের বিষয়, এ পথে এক ক্রোশ অন্তরই জলের নল আছে। ঐরূপ স্থানে কোথাও দোকান আছে, কোথাও তাহা নাই। ঐরূপ একটা স্থানে দোকানও আছে, পুলিশের আড্ডাও আছে। ঐ স্থানটার নাম শুনিলাম আধাভাত। আরও একটা নল অতিক্রম করিয়া বনের প্রান্তে আমরা ভিসাখুরী নামক চটী প্রাপ্ত হইলাম। এখানে ধর্ম্মশালা, দোকান, জলের নল সবই আছে। দেখিয়া এখানেই স্নান-ভোজনাদি সম্পন্ন করা গেল। ইহার নিকটে একটা উন্নত স্থানে উচ্চ পাড়যুক্ত একটা পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীর পাড়ে কয়েকটী কোঠা দেখা গেল। সেই স্থান অতিক্রম করিয়া নিম্নভাগে কতকগুলি পাহাড়ী বস্তি ও ২।৩ খানি দোকান আছে। দোকানের পাশ দিয়া নামিয়া এখন আমাদিগকে নদীগর্ভের নিম্নপথে পড়িতে হইল।

—o—
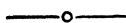
নদীগর্ভের পথ।

পার্ব্বত্য নদীর প্রবাহশূন্য গর্ভদেশ, তাহাই এখন আমাদের পথ হইয়াছে। জলপ্রবাহের পরিবর্ত্তে এখন জনপ্রবাহ সেইরূপ কলরব করিয়া সেই স্থান বহিয়া চলিয়াছে। নদীটার নাম সিমিরা। এই নদীগর্ভে চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বিকীর্ণ, মধ্যে মধ্যে ঝির ঝির করিয়া ক্ষুদ্র-ধারা যেন তাহার মধ্যে আপন অঙ্গ লুকাইয়া তাহারই এক স্থান দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহিয়া যাইতেছে। ঐ ধারার জলে পায়ের পাতা মাত্র ডুবে। ঐ ধারা মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ দুই একবার লঙ্ঘন করিতে হইতেছে মাত্র,

নতুবা প্রায় সমস্ত নদীগর্ভ ও নদীগর্ভের পথই শুষ্ক। ঐ পথ প্রথমে নদী-গর্ভের ঠিক্ মধ্যভাগ দিয়া চলিয়াছিল, ক্রমে কখন দক্ষিণধার, কখন বাম-ধার ঘেঁসিয়া চলিতে লাগিল। এতদূর পর্য্যন্ত আমরা পাহাড়ের দেখা পাই নাই, এবার পাহাড় দেখিতে পাইলাম। নদীগর্ভের দুই ধারেই পাহাড় আরম্ভ হইল। পাহাড়ের অঙ্গ বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন। কোন ধারে পাহাড়ের কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ভাঙ্গনে গঙ্গার উচ্চতট ভাঙ্গিলে যেমন স্থানে স্থানে খাঁটি বালুকাময় তীর বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি ধ্বস্ খাওয়া স্থানে পাহাড়ের বালুকাময় শুভ্রবর্ণ অঙ্গ দেখা যাইতে লাগিল। এ সকল পাহাড় বেলে-পাহাড়। আরও লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, যে ধার দিয়া নদীর ধারা অধিকতর প্রবলবেগে প্রবাহিত হওয়ার চিহ্ন রহিয়াছে, নদীগর্ভ কিছু গভীর হইয়াছে, সেই ধারের পাহাড়ই ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। অন্য ধারের পাহাড়প্রান্ত পর্য্যন্ত কেমন অক্ষুণ্ণ ও তরুলতায় কেমন নিবিড় আচ্ছন্ন! পাহাড়ের অবয়বের সহিত কত বড় বড় বৃক্ষও ধ্বসিয়া নদীগর্ভে পড়িয়াছে। পার্ব্বত্য নদীর প্রবাহ-বেগ কি সাধারণ? এখন যেন আমরা অম্লানমুখে, অকাতর চিত্তে এই নদীর গর্ভদেশ দুই পায়ে দলিত করিয়া চলিয়াছি, কিন্তু বর্ষাকালে ইনি যখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বাহির হন, তখন ইঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গিয়াও চকিতভাবে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে হয়। সেই অতুল বিক্রমের চিহ্ন এখন কোথাও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিয়াছে বই ত নয়! ক্রমে উভয় তীরেই ঐরূপ পাহাড় ধ্বস্ খাওয়ার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। আমাদের রাস্তারও ঐরূপ একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। অর্থাৎ রাস্তাটা নদীগর্ভের এক প্রান্ত দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে সেই তীরবর্ত্তী বনভাগে উঠিয়া পড়িল, কিন্তু কিছু দূর ঐরূপ বনের মধ্যে চলিতে চলিতে পুনর্ব্বার নদীগর্ভে আসিয়া নামিল। নদীগর্ভে পুনর্ব্বার সেই বিকীর্ণ প্রস্তরখণ্ডময় রাস্তা, শূন্য পায়ে ত সে পথ উত্তীর্ণ হইবারই যো নাই। জুতা পায়ে দিয়াই বা সে পথে আর কতদূর

চলা যায়? কিন্তু উপায় কি আছে? উভয় তটে দুর্গম পর্ব্বত, মাঝে এই অস্থিকঙ্কালময়ী জীবনশূন্যা পার্ব্বত্য নদী, ইহা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। অগত্যা এই সুদীর্ঘ নদীগর্ভের পথ দিয়াই চলিতে হইবে। আমি নেপাল-যাত্রার এই কয়েক প্রকার পথ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। প্রথম প্রান্তর, তারপর জঙ্গল, তৎপরে এই নদীগর্ভের পথ, সে পথ ছাড়িয়া কিছুদূর নদীতীর, অতঃপর দুর্গম কয়েকটী পর্ব্বতের বিষম চড়াই ও উতরাই। এইগুলি পার হইতে পারিলে তবে নেপাল-উপত্যকা। ইহার মধ্যে নদীগর্ভের রাস্তাই যেন বেশি। সেই রাস্তা অতিক্রম করিতে করিতেই আজি এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। যাহা হউক, বহু ক্লেশে অপরাহ্নে আমরা চিড়িয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটী বেশ উন্নত। শুনিলাম, ভিসাখুরি হইতে এই স্থান ছয় মাইল।
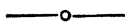
চিড়িয়া।

চিড়িয়া স্থানটী উন্নত বটে, কিন্তু জলকষ্ট বিলক্ষণ। যে সামান্য জল আছে, তাহা ব্যবহার্য্য নহে। ১ খানি মাত্র দোকান আছে, তাহাতেই চাউল, চিড়া, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি যাহা পাওয়া যায়। নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই যাত্রীরা এখানে আশ্রয় লইয়া থাকে। তথাপি চিড়িয়া-চটীর নামটী প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধির কারণ, এই উন্নত স্থানটীর পরই যে নিম্নপথে অবতরণ করিতে হয়, গো-যানের পক্ষে তাহা বড়ই বিপজ্জনক। এ জন্য ঐ উচ্চস্থানের সমীপবর্ত্তী পাহাড়ে যে চিড়িয়া-মায়ীর অধিষ্ঠান আছে, গাড়োয়ান মাত্রেই তথায় তাঁহার পূজা দিয়া থাকে। নির্ব্বিঘ্নে এই স্থানটী পার হইতে পারিলেই এ পথে গাড়ীর আর কোন ভয় নাই। তাই সকলেই এ চটীর নাম মনে করিয়া রাখে। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে এ স্থান উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন ব্যাপার। আমি দেখিলাম, শত শত বোঝাই

গাড়ী এখানে আসিয়া জমা হইয়া আছে। গাড়োয়ানগণ পরস্পর ধরাধরি করিয়া বহু কষ্টে একে একে তথায় গাড়ি উঠাইতেছে। তার পর তাহারা গাড়িগুলি একে একে ঐ উচ্চভূমি হইতে নিম্নপথে অতি সাবধানে, সাবধানে হইলেও অনিচ্ছাকৃত অতি দ্রুতবেগে অবতরণ করাইয়া লইতেছে। ইহার মধ্যে আবার পথবাহী লোকও অনেকে নিম্নদিক্ হইতে উপরে উঠিতেছে। তাহাদিগকে রক্ষার জন্য গাড়োয়ানেরা গাড়ী নামাইবার সময় নিরন্তর বগল-বগল বা পাঁজর-পাঁজর শব্দে চীৎকার করিতেছে। তাহাতে পথবাহী লোক সাবধান হইয়া, আশে-পাশে দাঁড়াইয়া বা দ্রুত পলাইয়া কোনরূপে রক্ষা পায়, কিন্তু গাড়ী, বিশেষতঃ গরু অনেক সময়ে রক্ষা পায় না। বোঝাই গাড়ী নিম্ন গড়ান-পথে দ্রুত-বেগে নামিবার সময় ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া গরুশুদ্ধ বিপন্ন হয়। আমরা আমাদের সাক্ষাতে এইমাত্র ঐরূপে দুইটী গোহত্যা হইতে দেখিয়া দ্রুতপদে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলাম, কিন্তু বহুক্ষণেও মনঃক্ষোভের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। হায়, ধার্ম্মিক নেপালরাজ কোনরূপে কেন এ বিপদের প্রতিবিধান করেন না!
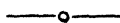
নদীগর্ভ ও নদীতীরের পথ।

চিড়িয়া পার হওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমাদের পথ একটু বাঁকিয়া নদীগর্ভ ত্যাগ করিয়া বামপার্শ্ববর্ত্তী পরস্পর আসন্ন দুইটী পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী একটা নিম্ন খাত দিয়া চলিল। কিছুদুর ঐরূপ চলিয়া আবার নদীগর্ভে উপস্থিত হইল। এ নদী একবারে শুষ্কগর্ভ, কেবল বালি ও নুড়ির মত শিলাখণ্ড। কিছুক্ষণ পরে এ নদীগর্ভও ত্যাগ করিয়া আমরা নদীকে পার্শ্বে রাখিয়া তীরের উপর দিয়া চলিলাম। ঐ ভাবে কতকদুর চলিতে চলিতে কুক নামে একটী ক্ষুদ্র নদী পাওয়া গেল। নদী ক্ষুদ্র হইলেও

তাহার উপরিস্থিত পুলটী বেশ উচ্চ ও মজবুত। এখানে দোকান নাই। যাঁহাদের আটা, চাউল প্রভৃতি সংগ্রহ ছিল, তাঁহারা জলের সুবিধা দেখিয়া নদীর ধারেই পাক-শাক আরম্ভ করিয়া দিলেন। বিচালী-বোঝাই বিস্তর গাড়ীও ঐ স্থানে আশ্রয় লইয়াছে দেখিলাম। এই স্থানে নদীর একটু উপরে একটী পাকা বাড়ীতে সদাব্রত আছে। তথায় সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে চাউল, মাসকড়াই ও ঘৃত বিতরণ করা হইতেছে, কিন্তু রাত্রিতে আশ্রয় দিতে তাঁহারা কিছুতেই সম্মত নহেন। আমাদের ভোজ্য বস্তু সংগ্রহ নাই, বিশেষতঃ রাত্রির দুর্জ্জয় হিম-নিবারণের কোন উপায় নাই দেখিয়া আমরা সে অপরাহ্নেও আমাদের গতি বন্ধ করিলাম না। কিন্তু তাহাতে সুফলই হইয়াছিল, অনতিদূরেই একটী সুন্দর চটী পাওয়ায় আমাদের অদ্য রাত্রিকালের বিষম কষ্ট একবারেই ভোগ করিতে হয় নাই।

হাথৌরা-চটী।

আমরাও হাথৌরা-চটীতে পঁহুছিলাম, সন্ধ্যাও অন্ধকার লইয়া উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড লম্বা চটী, দুই ধারে সারি সারি অসংখ্য ঘর, মধ্য দিয়া প্রশস্ত গাড়ীর রাস্তা। ঘরগুলি বিচালি দিয়া ছাওয়া খাওড়া লম্বা দোচালা। আমাদের যে ঘরখানি মিলিয়াছিল, তাহার মধ্যভাগে লম্বালম্বি বেড়া ব্যবধান দিয়া ঘরখানিতে সদর-অন্দর দুইভাগে বিভক্ত করা ছিল। অন্দরে দোকানদার সপরিবারে থাকে। সদরের একধারে যাত্রীদিগের আশ্রয়স্থান, অন্য ধারে দোকান। মাঝে রাস্তা অন্দর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাত্রিতে ঝাঁপ দিয়া উহা সম্মুখে ও মধ্যে বন্ধ করা হয়। অবশ্য অন্যান্য ধারেও বেড়া দিয়া ঘেরা। অধিকন্তু যেটুকু যাত্রীদিগের আশ্রয়-স্থান, তাহার তলে বিচালি বিছান আছে। এ নিরাশ্রয়ের দেশে যে

এমন আশ্রয় পাওয়া যাইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু ইহা আমাদের অনেক খুঁজিয়া, অনেক জিজ্ঞাসিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল। আমরা সেই বিচালির উপর কম্বল বিছাইয়া অদ্য কি আরামই উপভোগ করিলাম! এখানকার প্রচণ্ড শীতে নদীর ধারে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া থাকিতে হইলে দেহে প্রাণ থাকিত না, ইহাই মুহুর্মুহুঃ বিবেচনা হইতে লাগিল। অতঃপর আহারাদির উদ্‌যোগ করা কর্ত্তব্য বোধ হইল। শীতকালের রাত্রির কেমন একটা দোষ যে একটু বিশ্রাম কি আরাম করিতে আরম্ভ করিলে আর উঠিতে ইচ্ছা করে না, খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত মনে থাকে না। কিন্তু এখানে আমাদের আপনা-আপনিই চৈতন্য উদয় হইল যে ইহা বাড়ী নহে, কেহ ডাকিয়া খাওয়াইবে না; বরং বদরী-নারায়ণের চটীওয়ালার মত বলিতে পারে,—না খাও ত এই বেলা পথ দেখ। পথ চলিয়া চলিয়া আমাদের এইরূপ ধরণের অনেক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে কি না! একবারকার রোগী, আরবার কার রোজা! এখন আমরা আপনারাই আপনাদের মুরুব্বি হইয়াছি। সুতরাং মুরুব্বির মত আরাম ছাড়িয়া চটপট উঠিয়া পড়িলাম। দোকানে দোকানদার বা তাহার স্ত্রী কেহ-না-কেহ সর্ব্বদা উপস্থিত আছে, তাহাদের নিকট কেরোসিনের ডিবা লইয়া জ্বালিয়া দিলাম। চাল, ডাল, আলু, লবণ, তৈল, কাঠ সকলই সেই এক দোকানেই পাওয়া গেল। অতঃপর ভৃত্য ও জল-পাত্র লইয়া আমি নদীতে চলিলাম। বাজারটী যে ভাবে লম্বালম্বি বিস্তৃত, একটু তফাতে, তাহারই সমান্তর ভাবে দিব্য একটী খরস্রোতস্বতী অপর পার্শ্বের পাহাড়ের গা ধুইয়া প্রধাবিত হইয়াছে, অন্ধকারেও তাহা অনুভব হইল। ভৃত্যটী তাহার নির্ম্মল জল ঘড়া ভরিয়া উঠাইয়া লইল।

এইবার একটা কথা বাদ দিলেই হইত। অর্থাৎ জল লইয়া বাসায় আসিবার সময় বাসা চিনিতে যে কিছু ফেরা-ফেরি ও কিছু দেরি হইয়াছিল, এ কথাটা না লিখিলেই হইত। তাহা হইলে আমি যে আগা-

গোড়া সকল বিষয়ে সমান কর্ম্মঠ, তাহা বেশ সপ্রমাণ থাকিত। কিন্তু এই একটা কথাতেই বোধ হয় সব কাঁচিয়া গেল, পাঠকবর্গের নিকট আমি ধরা পড়িলাম। মূল কথা, এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া মুরুব্বিয়ানা করা বেশ সহজ, কিন্তু ঘরের বাহির হইলেই মস্কিল, নানা ত্রুটি আসিয়া উপস্থিত হয়। আর গোড়া দেশের দোচালাগুলাও কি সবই এক রকম? ঐরূপ শতাবধি ঘরের মধ্যে একখানা ঘর কি করিয়া সহসা ঠিক্ করা যায়? ইহাতে আমার, কি আমার ভৃত্যেরই বা বিশেষ এমন দোষ কি?

যাহা হউক, আমাদের পাক-ভোজনের কোন কষ্টই হয় নাই। তৎপরে বিচালির বিছানায় রাজার মত নিশ্চিন্তে শয়ন করিলাম। যতদুর পা ছড়াই, ততদুরই বিচালি! আর কি চাই? পাঠক হাসিবেন না, সময়ে ইহাও পরম সম্পদ্ বলিয়া বোধ হয়।

এখানকার সকলই সুখের ও সুবিধার বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু একটা যে বিশেষ অসুখের ও অসুবিধার ব্যাপার আছে, তাহা বলা হয় নাই। যাইবার সময় যদিও তাহা আমাদের ঘটে নাই, ফিরিবার সময় ঐ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের গাড়োয়ান পূর্ব্বাহ্নে ঐ বিষয় আমাদিগকে অবগত করায় নানা কৌশলে আমরা উহা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। এই স্থলেই উহা পাঠকবর্গকে অবগত করান কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি।

ব্যাপার এই, এখানে একটা কাঠ-চেরাই কারখানা আছে। ঐ কাঠ বা অন্য কোন মাল বহনের জন্য সরকারি লোক এই পথে পথিকদিগের গাড়ী ব্যাগার ধরিয়া থাকে। সরকারের কোন হুকুম নাই, অথচ সরকারি লোক যাত্রীদিগকে নামাইয়া দিয়া তাহাদের ভাড়া-করা গো-গাড়ী বল-পূর্ব্বক খাটাইতে লইয়া যায়। গাড়ীর আরোহী বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, রুগ্ন হউক, অপটু হউক, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং তাহাদের কাতর উক্তিতে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া আপন কাজে নিযুক্ত করিয়া

দেয়। অথবা তাহাদিগের নিকট কিছু আদায় করিয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। এই অত্যাচার বিদেশী যাত্রীদিগের পক্ষে যে কতই ক্ষতিজনক ও ভয়াবহ, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান বাহুল্য মাত্র। এই বিষয় রাজ-গোচরে উপস্থিত করিয়া ইহার প্রতিবিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—-০—

নদীতীরের পথ—সুপারিটাঁড়।

১লা ফাল্গুন।

প্রত্যূষে নেপালী দোকানদারণী আমাদিগকে জাগাইয়া দিল। আমরা ল্যাম্প জ্বালিয়া বিছানা-পত্র গুছাইয়া তাহা মুটের মাথায় দিয়া রওনা হইলাম। বাজারের পার্শ্বের নদীটী একটু তফাতে ছিল, ক্রমে কাছে হইল। ক্রমে অতিনিকট হইলে তাহা পার হইতে হইল। নদীর নাম শামরি নদী, উহার উপর উত্তম পুল আছে। পুলের এ পারে একখানি দোকান, পার হইয়াও দুখানি দোকান। নদী পার হইয়াই একটু চড়াই আরম্ভ। তার পর একটু অগ্রসর হইয়া দেখি, একটা চমৎকার প্রশস্ত চটী। দুই ধারে অসংখ্য দোকান, সব জিনিষই মিলে। চটীও খুব বিস্তীর্ণ, চটীর নাম সুপারিটাঁড়। চটীর পার্শ্বেই নদী, স্থান উত্তম বটে। আমাদের চিঠীতে এই স্থানে রাত্রিবাসের কথা লেখা ছিল। কিন্তু লেখা অনুসারে চলিতে পারা গেল না। অগত্যা এখানে রাত্রিবাস কেন, মধ্যাহ্নবাসও হইল না। অগ্রসর হইয়া পথের মাঝে এক স্থানে নদীতে স্নান এবং বৃক্ষমূলে আহ্নিক ও আহার হইল। আহার বলিতে এখানে চিড়ার ফলাহার। এ পথে সর্ব্বত্র চিড়াই সুপ্রাপ্য।

—০—

নদীতীরের পথ।

মধ্যাহ্নের ধূপে পথ চলিতে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কি করা যায়, শিবরাত্রি আসন্ন। কষ্ট করিয়াও যাত্রীর দলের অনুগামী হইতে হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে এক-আধটুকু বিশ্রাম না করিয়া পারি নাই। নদীতীরে গুলফিন্‌ব্যাসী নামক একটা স্থানে পাষাণ-বেদীমধ্যস্থ একটী বিল্ববৃক্ষমূলে ঘনচ্ছায়াতলে উপবেশন করিয়া নদীপ্রবাহ-শীতল বায়ু-হিল্লোলে ক্ষণকাল কি আনন্দই অনুভব করিলাম! কিন্তু ঐ ক্ষণকাল পরেই আবার উত্থান ও দ্রুত গমন। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অনুভব করিবার অবকাশ কই? নতুবা পথিপার্শ্ববাহিনী বিবিধ ভঙ্গ-রঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলগামিনী প্রখর পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীরই কি কম সৌন্দর্য্য! এক স্থানে ঐ স্রোতস্বতীর দুরবস্থাতেই বা কি মাধুর্য্যের মুক্তাবলী ছিন্ন-ভিন্ন বিকীর্ণ দেখিলাম! সে স্থানে অনন্ত শিলাখণ্ড উহার সর্ব্বাঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে। যেন বঙ্গদেশের শুষ্কপ্রায় বিলের গর্ভে বক-পঙ্‌ক্তির আবির্ভাব হইয়াছে! ধারার আর এতটুকু গভীরতা নাই যে সে ঐ বিকীর্ণ শিলাসকলকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে। অধিকন্তু ধারাগুলি তথায় নানাভাগে বিভক্ত হইয়া কত আঁকিয়া-বাঁকিয়া, কত শিলাখণ্ডকে আশে-পাশে রাখিয়া, যেন কত আকুলি-বিকুলি করিয়া তাহাদের মধ্য দিয়া চলিয়াছে! কোথাও কত পাষাণ-খণ্ডকে বেষ্টন করিয়া, কতকগুলিকে বা অর্দ্ধসিক্ত করিয়া ধাবিত হইয়াছে! আর নিজের সমোচ্চ সারি-সারি শিলাখণ্ডগুলিকে লঙ্ঘন করিবার সময় তাহাদের অঙ্গে ঈষৎ বাধা পাইয়া স্রোতোবেগে কি সুন্দর শ্বেত-কান্তিচ্ছটাই বিকীর্ণ করিতেছে! যেন সমুদ্রের বড় বড় চাঁদামাছগুলি আপন বিস্তৃত শ্বেত অবয়বের আবর্ত্তনে সম্বর্দ্ধিত শ্বেত প্রভাপুঞ্জ বিকীর্ণ করিয়া তথায় উজাইয়া যাইতেছে! দেখিয়া পুনঃ পুনঃ ঐরূপ ভ্রমই উপস্থিত হইতে লাগিল। কোথাও ঐ ধারাগুলি সম্মিলিত ও সংযত

হইয়া অগ্রে স্থিত দুইখানি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া বর্দ্ধিত বেগসহকারে নির্গত হইতেছে, আর তাহাতে যেন সেই স্থানে স্থইাদেবের একখানি রজতময় রমণীয় গৌরীপট্ট রচনা করিয়া রাখিয়াছে! নদীর ধারের রাস্তাগুলিও খুব প্রশস্ত। এই পথে যাত্রীর গতিবিধির ন্যায় গাড়ী-চলাচলেরও বিরাম নাই। পথের পার্শ্বে পাহাড়; আর কি কি পাহাড়ের নিম্নগাত্রে, কি নদীর তটক্ষেত্রে অসংখ্য পুষ্পিত বাসকগাছ। সেই পুষ্পিত গুল্মলতা-বৃক্ষাদি সহিত শ্যামশোভাচ্ছন্ন ঐ পাহাড় সম্মুখবর্ত্তী মোড়ে প্রত্যেক বারই যেন আমাদের গন্তব্য পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে চলিতে চলিতে কত চটী অতিক্রম করিলাম বলিতে পারি না। একটা চটীর নাম শুনিয়াছিলাম ভঁইসা চটী। ঐ চটীর পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের নামও ভঁইসা পর্ব্বত। ঐ স্থানের লোহার টানা দেওয়া পুলটীর নামও ভঁইসা পুল। সকল স্থানের নাম আমার মনে নাই। ফলতঃ অদ্য আমরা বহু পথ অতিক্রমপূর্ব্বক অপরাহ্ণে পার্শ্ববর্ত্তিনী একটা নদীর পুল পার হইয়া ভীমফেড়ী নামক প্রসিদ্ধ স্থান প্রাপ্ত হইলাম।

——o——

ভীমফেড়ী।

ভীমফেড়ী নানা কারণে বিখ্যাত। প্রথমতঃ ইহার বাজার অতি বিস্তৃত, বিস্তর মালের আমদানি এখানে হইয়া থাকে ও সেই সমস্ত মাল বোঝাই লইয়া অসংখ্য গাড়ী এই স্থান পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া থাকে। কেননা এই পর্য্যন্ত সমতল পথের সীমা। অতঃপর দুর্গম পাহাড় আরম্ভ। আরও এক কারণ, এখানে প্রথম-পাশ বদলাইয়া নূতন পাশ লইতে হয়। সেই পাশ ভিন্ন আর অগ্রসর হইবার যো নাই। এতদ্ভিন্ন জলকষ্টের জন্য ইহা বিখ্যাত বলিলেও চলে। ইহার মধ্যে প্রয়োজনীয় কথাগুলি ক্রমে বলিতেছি।

আমরা পঁহুছিয়াই টিকিট পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু যাত্রীর এমন অসম্ভব ভিড় যে আমরা তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেই পারিলাম না। টিকিট পরিবর্ত্তনের স্থানে যাহাতে ঐরূপ ভিড় হইতে না পারে, তজ্জন্য সরকারি লোকে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভিড় থামাইতে না পারিয়া অনবরত ঐ জনতার উপর লাঠী চালাইতেছে; তাহাতে যাত্রীদিগের বিশেষ দৃষ্টিপাত নাই। মার খাইয়া যেমন একটু হটিতেছে, তেমনি আবার দলে দলে অগ্রসর হইয়া স্থান পূর্ণ করিতেছে। সে যাত্রীর চাপে কত লোক পড়িয়া যাইতেছে, কত লোক পিষিয়া যাইতেছে, কত লোক প্রহারে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ঐরূপ যন্ত্রণা সহিবার শক্তি নাই, তথাপি অগ্রসর হইবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলাম। কেন না এতদুর আসিয়া দেবদর্শনে বঞ্চিত হওয়া কি সাধারণ কষ্ট? কিন্তু দুর্ব্বলের তথায় বৃথা চেষ্টা, বহুক্ষণ বহু ধাক্কা খাইয়া চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইলাম। বহুপরিশ্রমে পিপাসা বোধ হইয়াছিল, জলের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এ স্থানের পার্শ্বে যে নদীটী আছে, তাহা একবারে শুষ্কগর্ভ। এজন্য সরকার হইতে এখানে কয়েকটী জলের পাইপ বসান হইয়াছে। সেখানেও জলের জন্য তেমনি ভিড়, তেমনি মারামারি। সকলেই লোটা-হস্তে নলের সমীপে অগ্রসর। যাহার বল বেশি, তাহার লোটাই সে জলের ধারায় কতক ভরিতেছে, কিন্তু সে বল-পরীক্ষার সময় লোটায় লোটায় ঘর্ষণে বিষম ঠোকাঠুকি, হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইতেছে। আমরা সেরূপ করিয়া জল লইতেও কৃতকার্য্য হইলাম না। সকল নলের নিকটই ঐরূপ যুদ্ধবিগ্রহ। এখানকার সরকারি লোকগুলি কি এমন অকর্ম্মণ্য, কোন শৃঙ্খলাবিধানেই সমর্থ নহে? সে যাহা হউক, এই সময়ে আমাদের আর এক বিপদ্ উপস্থিত, আমাদের মুটিয়া শিবরাম এই গোলের মধ্যে হারাইয়া গেল। মোটের মধ্যেই গাত্রবস্ত্র, পরিধানবস্ত্র, বগুনা ও জলপাত্র, সুতরাং শিবরামের অভাবে আমাদের যে কি বিপদ,

তাহা লেখাই বাহুল্য। সেই প্রকাণ্ড বাজারের মধ্যে, প্রবল জনতার ভিড় ঠেলিয়া কতবার ঘুরিলাম, কতই উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বেড়াইলাম, তাহা আর কি বলিব! সেই জনতার বিশাল কোলাহলে কে কাহার কথা শুনে? সকলেই আপন আপন লইয়া ব্যস্ত। সহসা কাশীর সমীপবাসী শ্রীযুক্ত হরশঙ্কর দুবে নামক এক মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গত রাত্রিতে চটীর মধ্যে ইহাঁর সহিত আলাপ হইয়াছিল। ইনি সপরিবারে পশুপতিনাথ দর্শনে যাইতেছেন। এইমাত্র ইনি বহু কষ্টে টিকিট পরিবর্ত্তন করিয়া বাসায় ফিরিতেছেন। ইনি আমাদের ভৃত্যটী হারান'র কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। কহিলেন, কল্য আমি আপনাদের সঙ্গে তাহাকে দেখিয়াছি, আমিও তাহার জন্ম চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু অপরাহ্ন হইয়াছে, অদ্য পাশ দেওয়া বন্ধ হইল। আজি আর সে চেষ্টা করিবেন না, এক্ষণে একটা আশ্রয় চেষ্টা করুন। এখানে আশ্রয় দুষ্প্রাপ্য। নিতান্ত তাহা না পান, নীচের বাজারে ভীমফেড়ী মায়ীর থানায় গিয়া আমার সন্ধান করিবেন, আমি তথায় একটু আশ্রয় পাইয়াছি। এই বলিয়া লোকটী সত্বর চলিয়া গেলেন।

আমরা এই সদাশয় ব্যক্তির কথাবার্ত্তায় বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম। বিদেশে এরূপ সৎপরামর্শদাতাও দুর্লভ। এখন আর একবার পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে অন্বেষণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল, কিন্তু কোন ফলই হইল না। অধিকন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া ঐরূপ নিষ্ফল অন্বেষণে, নিষ্ফল আহ্বানে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইল। সূর্য্যও অস্তগত হইলেন। তখন বিশ্রামের জন্ম আশ্রয় চেষ্টা। কিন্তু সে চেষ্টায়ও কোন কাজ হইল না, কোন দোকানেই কোনরূপ আশ্রয় পাওয়া গেল না। কোন যাত্রীই বোধ হয় সেরূপ আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। অসংখ্য যাত্রী, দেখিলাম বাজারের মধ্যের পথে, বাজারের আশে-পাশে, দূরস্থ ভূমিতে, যে যেখানে একটু ফাঁক পাইয়াছে, তথায়ই পড়িয়া আছে বা বসিয়া আছে।

অগণ্য লোকারণ্য আজি অন্ধকারে ভূলুণ্ঠিত! দেখিয়া হৃৎকম্প হইল। সহস্র সহস্র মনুষ্যের এই চরম দুর্দ্দশার কি কোন প্রতিকার নাই? আশ্রয়ের জন্য একটা গাছতলাও কি এখানে নাই? কিন্তু দেবদর্শনের জন্য এ কষ্টও ইহাদের মনে স্থান পায় না, তাহাদের জন্য আবার দুঃখ কি? তখন আমার নিজের দুঃখভার লঘু বোধ হইল। নেপালরাজ্যের এই অব্যবস্থার জন্য অনুশোচনা দূরগত হইল। আমরা ভূলুণ্ঠিত হইতেই স্বীকার। কিন্তু শুদ্ধ আকাশের তলে এরূপ নিতান্ত নিরাবরণ স্থানে শীতত্রাণের জন্য যে গাত্রবস্ত্রের প্রয়োজন, তাহাও যে আমাদের নাই! সর্ব্বনাশ, এ প্রচণ্ড শীতে কিরূপে প্রাণরক্ষা হইবে! অগত্যা পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটীর সন্ধানে আমাদিগকে নীচে নামিতে হইল। সেও যেমন-তেমন নিম্নদেশ নহে, যেন পাতালে নামিতে হইল। সেই নিম্ন-ভূমিতে ঠিক্ পর্ব্বতের পাদ-মূলে একটী বাজার আছে। বাজারেও রীতিমত বিস্তর দোকান, সেখানে জলের নলও আছে, একটা বাড়ীতে সদাব্রত—চা'ল, ডা'ল প্রভৃতি বিতরণও আছে, কিন্তু আশ্রয়ের ব্যবস্থা নাই। যাহা হউক, অনুসন্ধান করিতে করিতে বাজারের প্রান্তে ভীমফেড়ী মায়ীর থানায় আমরা উপস্থিত হইলাম। সে একটী দেবালয়। তথায় উক্ত ভদ্র-লোক হরসেবক দুবে-জী সপরিবারে আশ্রয় লইয়া আছেন। তিনি নিজের সমীপেই আমাদিগকে আশ্রয় দিলেন, নিজেদেরই সঙ্গের গাত্রবস্ত্র আমা-দিগকে ব্যবহার করিতে দিলেন, হারান' ভৃত্যটী প্রভাতে দিবাভাগে চেষ্টা করিলে নিশ্চয় পাওয়া যাইবে বলিয়া অনেক আশ্বাস দিলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই নিষ্কারণ-বন্ধু মহাত্মা ব্যক্তির ব্যবহারসমস্ত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, মানুষের মনুষ্যত্ব কি অপূর্ব্ব বস্তু! ইহা দেখিতেছি দেবত্বেরই নামান্তর! ইহা শৌর্য্য-বীর্য্যাদিরও মুকুটমণি! ইহার অভাবে সে সকল ব্যাঘ্র-ভল্লুকের ক্রূর চেষ্টিত মাত্র! এই সকল রত্ন সৃষ্টি করিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিপ্রয়াস সার্থক হইয়াছে!

২রা ফাল্গুন।

প্রত্যূষে দুবে-জী রওনা হইলেন। রওনা হইবার সময় আমাকে গাত্রবস্ত্র ও নিতান্ত ব্যবহার্য্য বাসন-পত্র লইতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। আমি আর কত ঋণে আবদ্ধ হইব ? কিন্তু উপায় নাই, অগত্যা নিতান্ত-প্রয়োজনীয় বোধে উক্ত মহাত্মার নিকট একটী জলপাত্র মাত্র লইলাম। তাঁহারা চড়াইএর পথে দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন।

আমরা বাজারের দিকে পুনর্ব্বার অন্বেষণে বাহির হইলাম। পূর্ব্বদিনের মত উপরের বাজারে উঠিয়া যথায় পাশ পাইয়াছিলাম, সেই স্থানে গিয়াই শিবরামের সাক্ষাৎ পাইলাম। সেও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদিগকে খুঁজিয়াছে। কোন সন্ধান না পাইয়া এক স্থানে বসিয়া বসিয়া বহু কষ্টে সমস্ত রাত্রি আমাদের মোটের দ্রব্যাদি রক্ষা করিয়াছে। কারণ, এখানে চোরের বড় উপদ্রব, নিদ্রিত যাত্রীদের মোট চুরি করা তাহাদের কার্য্য, শিবরামকে সেই উপদ্রব ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমাদের দেখিয়া সে যেন প্রাণ পাইল, আমাদের অবস্থাও তাই। তখন আর বিলম্ব মাত্র না করিয়া পাশের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। শিবরাম আমাদের নিকট মোট রাখিয়া প্রথমে নিজে পাশ আদায় করিল। পরে আমরা চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আজিও সেই কষ্ট। বহু কষ্টে কাঁদিয়া-কাটিয়া আজি পাশ পাইলাম। প্রথম দিনের পাশ-দাতাও বাঙ্গালী, আজিকার পাশ-দাতাও বাঙ্গালী। কিন্তু উভয়ে কত অন্তর !

—o—
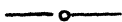
পর্ব্বতারোহণ।

কিছু ভোজ্য বস্তু সংগ্রহপূর্ব্বক বাবা পশুপতিনাথের নাম উচ্চারণ করিয়া এবার প্রফুল্লচিত্তে আমরা রওনা হইলাম। পুনর্ব্বার নামিয়া

দ্বিতীয় বাজারে ভীমফেড়ীর থানার নিকট আসিয়া তথা হইতে পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা ধরিলাম। সে পথে অসংখ্য যাত্রী আমরা একসঙ্গে উঠিতেছি। সকলেই এখন দ্রুতবেগে চড়াই উঠিতেছে, আমরাও সেই-রূপ বেগে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু কি বিষম চড়াই ও কি বিষম সেই ছোট-বড় নোড়া-নুড়ি-সাজানো পাহাড়ের রাস্তা! সে রাস্তা দিয়া উঠিবার সময় প্রতি পদে নোড়া-নুড়িগুলা খসিয়া পড়িতেছে। আর সেই চড়াই রাস্তা যেন খাড়া সোজা হইয়া ক্রমেই আকাশে উঠিতেছে! পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে সেই উচ্চস্থান হইতে সঙ্কিপ্ত ও সূক্ষ্মাকারে ভীমফেড়ীর বাজার ও বাজারের গৃহশ্রেণী, রাস্তা প্রভৃতি কি সুন্দরই দেখায়! কিন্তু তখন সে সকল দেখিবার অবকাশ কোথায়? শীঘ্র শীঘ্র চড়াই পথ অতিক্রম করিতে পারিলে হয়। সকলেরই তখন সেই একমাত্র চেষ্টা, ক্রমাগত তাহাই হইতে লাগিল। ক্রমে বহু উর্দ্ধে উঠিলাম, তথা হইতে বাজার প্রভৃতি সকলই অদৃশ্য হইয়াছে, অথচ চড়াই শেষ হয় না। জিজ্ঞাসিলে জানা যায় যে এখনও চড়াই বহুদূর আছে। কিন্তু পা আর তেমন উঠে না, সকলেরই গতির বেগ খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অজ্ঞাতে অশক্তিতে গতি বন্ধও হইতেছে, আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া চড়াই করিতে হইতেছে! এ চড়াই সর্ব্বসম্মত অতি কঠোর। এজন্য এ দেশের প্রবাদই আছে যে "শিশাগড়িকা চড়াই, চন্দ্রাগড়িকা ওড়াই"। তেমনি প্রখর রৌদ্র, সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাক্ত, পদদ্বয় একবারে ক্লান্ত, কোন আশ্রয় নাই! ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক, বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে, তথাপি সে উৎকট পথ লঙ্ঘনের বিরাম নাই। সে চড়াই অতিক্রম করিতেই হইবে। নহিলে কোথায় দাঁড়াইব? বিশ্রামের যে স্থান নাই! বড় কষ্টে বাবা পশুপতিনাথকে স্মরণ হইল। প্রাণের মধ্য হইতে ডাকিয়া বলিলাম, প্রভু, এ অক্ষম অসমর্থকে একবার দর্শন দাও! আর চরণ যে চলে না প্রভু! কত প্রান্তর-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া চলি-

তেছি, ছুটিতে ছুটিতে কত পাথরে-কঙ্করে পা রক্তারক্তি করিতেছি, দিন-রাত্রি জ্ঞান নাই, একবার দেখা দেও প্রভু! কি সঙ্কট পথ প্রভু তোমার! এ যেন কিছুতেই খাটো হইতে চাহে না, কিছুতেই একটু কোমল হইতে চাহে না, কিন্তু পাহাড় ভাঙ্গিতেও যে আর পারিয়া উঠি না, সর্ব্ব শরীর অবশ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, এ সময় একবার হাত ধরিয়া উঠাও প্রভু! দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ, এ জগতে তুমিই ত বাবা পশুপতিনাথ! *

বাবা বুঝি এবার আমাদের কথা শুনিলেন, আর অধিক দূর আমাদের চড়াই ভাঙ্গিতে হইল না। কিছুক্ষণ পরেই আমরা শিশাগড়ি পর্ব্বতের শিখরদেশে উপস্থিত হইলাম। আমাদের ৩ মাইল খাড়া চড়াই পথ লঙ্ঘন করা হইল। স্থানটী খুব উচ্চ এবং উচ্চ বলিয়া অতি রমণীয় ও বিলক্ষণ শীতল। এখানে শত্রুপক্ষের প্রতিরোধার্থ নেপালরাজের এক দুর্গ আছে ও তাহাতে সর্ব্বদা সৈন্যসন্নিবেশ আছে।

* বস্তুতঃ আমার এই হৃদয়ের বিলাপ তখন একটা অব্যক্ত সঙ্গীতেই প্রকাশ পাইয়াছিল ও বহুক্ষণ ব্যাপিয়া তাহার অনুবৃত্তি চলিয়াছিল। তাহাতে সে পথক্লেশে বড় সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম। সে সঙ্গীতটী এইরূপ,—

কেদারা— একতালা।

দরশন মুঝে দীজে। প্রভু পশুপতিনাথ হো!
ধ্যাওয়ত তুমে, তুয়া রাহমে, ঘুমত অগম গিরি কানন,
ক্ষীণ-প্রাণ ইয়ে পাতন, দিন-রয়ন না সুঝে।

সঙ্কট তুয়া বাট, নহি ঘটত জনি তনিক,
নিরবলকো বল প্রভু মেরা হাত পাকড়' লীজে।

মো-সম অগেয়ানী, পশুজন নহি কহিঁমে,
তুহি পশুপতিনাথ, ইয়ে পাতকী ত্রাণ কীজে॥

——০——

পার্ব্বত্যপথ—গড়ি ও কুলিখানি।

মধ্যপথে গড়ি-নামক স্থানে সঙ্গের দ্রব্যাদি ও পাশ পরীক্ষা হইল। পাশ পরীক্ষায় কত যাত্রী স্ত্রীলোক, কত যাত্রী পুরুষ, তাহারও নির্ণয় হইতেছে দেখিলাম। এখানে সুশীতল পানীয় জল দানের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে আজি আমরা বড়ই উপকার বোধ করিলাম। সুবিধামত একটা স্থানে মধ্যাহ্নের কার্য্য সারিয়া লইলাম। তৎপরেই আবার পথ-বাহন। এবার কিছুদুর চলিতে চলিতে উতরাই আরম্ভ হইল। সেই সময় উচ্চদেশ হইতে নিম্নভাগে একটী অতি সুন্দর প্রখর পার্ব্বত্য নদী ও তাহার গর্ভদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই নদীগর্ভে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ বড় বড় প্রস্তরখণ্ড স্বেচ্ছায় উপবিষ্ট হস্তিযূথের মত গুরুগম্ভীর আকারে অনুভব হইতে লাগিল। ক্রমে নিম্নে নদীর ধারে নামিয়া আসিলাম। গর্ভস্থ অগণ্য শিলাখণ্ডে স্খলিত হইয়া সেই পার্ব্বত্য নদীর প্রবলপ্রবাহ কি উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই ধাবিত হইয়াছে! তাহার অশ্রান্ত উচ্চ কলনাদ, অনন্তস্ফূর্ত্তিশীল চঞ্চলগতি জড়পদার্থকেও যেন সজীব করিতেছে! অত্যুচ্চ তট দিয়া অতৃপ্ত চক্ষে আমরা তাহাই দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এই নদীতীরের নিম্নপথের ধারে ধারে অনেক দোকান ও বসতি আছে, মধ্যে মধ্যে ঘনচ্ছায় বড় বড় গাছও আছে, জল অতি নিকট বলিয়া পথিকদিগের সেখানে পাক-ভোজনের বড়ই সুবিধা। এই রমণীয় স্থানের নাম কুলিখানী। আরও কিছুদুর যাইয়া এখানে একটী পুল আছে। পুল দিয়া এখানকার এই অশান্ত নদীটী পার হইয়া অপর পারের উচ্চতটে সন্নিবিষ্ট একটী উত্তম ধর্ম্মশালা প্রাপ্ত হইলাম। ধর্ম্মশালা হইতে নদীতট পর্য্যন্ত সুন্দর সিঁড়ি আছে। ধর্ম্মশালাটাও একটী উৎকৃষ্ট দ্বিতল অট্টালিকা। ভিতরে প্রাচীরে বেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পার্শ্বেই দেবালয়। ধর্ম্মশালার সম্মুখের প্রাঙ্গণ

ঠিক উচ্চ নদীতটের উপরে। তথা হইতে নদীর প্রবাহ সুন্দর লক্ষ্য হয়। ফলতঃ নেপালের পথে কুলিখানীর এই ধর্ম্মশালার মত সুন্দর স্থান আর দ্বিতীয় আমি দর্শন করি নাই। এখানে সদাব্রতও আছে। এখানে একরূপ অতিমিষ্ট কুমড়া ফালা দিয়া এই ধর্ম্মশালায় বিক্রয় করিতে আইসে। ঐ কুমড়ার ফালা খুব পুরু ও তাহা শস্তাও বটে। এই ধর্ম্ম-শালার অট্টালিকাতলে আজি বহু যাত্রীর সহিত আমাদের পাক-ভোজন ও রাত্রিযাপন হইল।

—০—

পার্ব্বত্যপথ—বুড়িয়া মায়ীকা খোলা ও লহরী-নেপাল।

৩রা ফাল্গুন, ত্রয়োদশী। প্রভাতে নদীর নিম্নতটের পথ দিয়া কিছুদূর গমন করিতে করিতে সম্মুখে একটা সিধা ও একটা চড়াই রাস্তা দেখা গেল। জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, সিধা পথে তিন মাইল চলিলে যথায় পঁহুছান যাইবে, চড়াই পথে দুই মাইল হাঁটিয়া তথায় পঁহুছান যায়। অর্থাৎ চড়াই পথটা পাকদণ্ডির পথ। ঐ পথে বুড়িয়া মায়িকা খোলা নামক পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। আমরা পাকদাণ্ডির পথে অভ্যস্ত আছি, সুতরাং ঐ পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইলাম।

ঐ পথ যেমন উচ্চ তেমনি সঙ্কীর্ণ,স্থানে স্থানে পথের চিহ্ন মাত্র নাই, প্রতিপদে পদস্খলনের সম্ভাবনা, অতি সাবধানে চলিতে হয়। কিন্তু যাহারা বিপদে অভ্যস্ত, তাহারা বুঝি বিপদই ভালবাসে। তাই আমরা কেদারের পাকদাণ্ডি পথে চলিয়াও আবার এখানকার সেইরূপ বিপথে চলিতে কৌতুকী হইয়াছি। এক পা এক পা করিয়া উঠিতে উঠিতে কত দুর উর্দ্ধেই উঠিলাম! কিন্তু এই সুদূর উর্দ্ধস্থান হইতে একটা বড় সুন্দর

দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল। এই ঊর্দ্ধ স্থানের পাশে একটা অতি গভীর খাত আছে। সেই সুদূর নিম্নবর্ত্তী খাতের সমীপে কয়েকখানি সুন্দর হরিতবর্ণ শস্যক্ষেত্র দেখা গেল। সেগুলি যেন অসংখ্য শুকপক্ষীর পুঞ্জীকৃত শ্যাম-পক্ষপ্রভা বিকীর্ণ করিয়া তথায় পড়িয়া রহিয়াছে! সে প্রভা কি কোমল, অথচ কি সমুজ্জ্বল! তাহার স্নিগ্ধচ্ছটায় চক্ষু যেন জুড়াইয়া যায়! সে স্থানে যেন শস্যক্ষেত্র নাই, শুধু স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি তথায় লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে! যেন নির্ম্মল নীল রং কে তথায় অজস্রধারে ঢালিয়া রাখিয়াছে! আবার তাহারই পার্শ্বে তৃণশস্যশূন্য রুক্ষভূমিগুলি কি কদর্য্য মূর্ত্তিতেই দেখা গেল! বাস্তবিক সকল বস্তুরই যেন একটু আবরণ প্রয়োজনীয়। মেদিনীরও সকল অঙ্গ ঐরূপ উলঙ্গ হইলে কখনই তাহা শোভনদৃশ্য হইত না। তাই বুঝি তৃণ-শস্য, তরু-গুল্ম, লতা-পল্লব তাঁহার অঙ্গের স্বাভাবিক আচ্ছাদন! কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত প্রাণী আত্মপ্রয়োজনে সর্ব্বদা সেইগুলির উচ্ছেদ করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ অপ্রিয়দর্শন করিয়া ফেলে।

উচ্চপথে চলিতে চলিতে একটা সঙ্কীর্ণ খাত পাইলাম। সাবধানে তথায় নামিয়া দেখিলাম, সেটা একটা নিঝরের গতিপথ। নির্ঝরের এক অঞ্জলি শীতল জল পান করিয়া লইয়া আবার অপর পার্শ্বে সেইরূপ সাবধানে উচ্চপথে উঠিলাম। কিন্তু ধন্য নেপালী কুলি! আমরা হাত পা মাত্র লইয়া এত সাবধানে উঠিতেছি নামিতেছি, কিন্তু তাহারা অতি গুরুভার লোহা-লক্কড় প্রভৃতির বোঝা লইয়া অটল-অঙ্গে অসঙ্কুচিতচিত্তে সেই পথে তেমনি উঠিতেছে নামিতেছে!

এবার আমরা বুড়িয়া মায়ীর পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে উঠিলাম। এই স্থান যেমন উচ্চ, তেমনি বিস্তৃত, যেন বৃক্ষলতাশূন্য একটা প্রকাণ্ড প্রান্তর, যেন এখানে ঘোড়-দৌড় করা যায়। আর এই অত্যুচ্চ স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের উন্মুক্ত দৃশ্যই বা কি সুন্দর! ফলতঃ এই স্থানে আসিয়া আমরা পাকদাণ্ডি পথের ক্লেশভোগ সার্থক বলিয়া মনে করিলাম।

এই প্রশস্ত ভূমির এক স্থানে ঘর নির্ম্মাণের উপযুক্ত কয়েকটা খুঁটি পোঁতা রহিয়াছে দেখিলাম, অবশ্য ঘরের আর কোন চিহ্ন দেখিলাম না। কিন্তু আমরা উহা ঘর নির্ম্মাণেরই পূর্ব্ব আয়োজন মনে করিয়া সেই ব্যক্তির পছন্দের যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না!

অতঃপর আমাদের সিধা পথে মিলিতে আর বেশী বিলম্ব হইল না। অগ্রবর্ত্তী পথে বহু পার্ব্বত্য বস্তি, বহু দোকান-পাট, বহু ক্ষেত-খামার অতিক্রম করিতে করিতে লহরা-নেপাল নামক স্থানে মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইয়া স্নান, আহ্নিক, আহারাদি করিয়া লইলাম। এখানে ইটের মোকাম অনেকগুলি আছে। বসতিও অনেক, দোকানও কয়েকখানি আছে। স্থানটী মন্দ নহে। আহারান্তে এখানে একটু বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিশ্রামের অবসর কোথায়? অগত্যা পূর্ব্ববৎ অভ্যস্ত পথের পথিকই হইতে হইল।

—o—
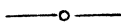
চন্দ্রাগড়ির উতরাই।

আগেকার পথে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এমন কিছু নাই, তবে চন্দ্রাগড়ির উতরাই একটা বিষম ব্যাপার বটে। শিশাগড়ির চড়াই পথ যেমন খাড়া-চড়াই, চন্দ্রাগড়ির উতরাই তেমনি একবারে খাড়া-উতরাই। সে যেমন উর্দ্ধমুখে নিয়ত আকাশ পানেই উঠিতেছি, এ পথেও তেমনি অধোমুখে নিয়ত পাতালেই নামিতেছি বলিয়া বোধ হয়। এ সকল পথে কাণ্ডী ও ঝাম্পানে যাইতেও আরোহীরা ভয় পান। আমাদের চরণই সম্বল, কিন্তু তাহাও সেই শ্রীপাদপদ্মের কৃপাগুণে। তিনিই চালাইতেছেন, নহিলে এ পথে চলিতেছি কেন? চলিতেছিই বা কিরূপে? কষ্ট হইতেছে, সংসারে কোন্ কার্য্যে কষ্ট নাই? কষ্ট পাইয়াও ত চলিতে পারিতেছি? চালাও প্রভু, শেষ পর্য্যন্ত এইরূপেই চালাও! যেন জল-জঙ্গলের বাধা

না জানিতে হয়, পাহাড়-পর্ব্বতের প্রতিবন্ধ না মানিতে হয়,আপদ্-বিপদের আপত্তি না শুনিতে হয়, তুমিই চালাইতেছ জানিয়াই যেন শেষপর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকি।

চন্দ্রাগড়ির এই উত্তরাই পথ প্রায় ৪ মাইল হইবে। এই পথের দুই পার্শ্বে আগাগোড়া নিবিড় অরণ্য। বৃক্ষগুলি সেই ঊর্দ্ধ হইতে অতদূর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত এমন নিবিড়ভাবে সজ্জিত হইয়া আছে যে তাহাতে পর্ব্বতের অঙ্গ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে নেপাল-উপত্যকা দৃষ্টিগোচর হয়। উক্ত উপত্যকার অভিমুখে বিস্তর কুলী, অতি বিস্তর যাত্রী এই পথে অবতরণ করিতেছে। বহুক্ষণ অবতরণের পর আমরা নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম। এই স্থানের নাম থানকোট। এখানে দোকান-পাট আছে, জলের নল আছে। বিস্তর লোক এখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। ইহার পর বালকদিগের ক্রীড়াযোগ্য, ঈষৎ ঢালু একটী সুন্দর স্থান আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইল। এখান হইতে নেপাল-রাজধানী ৩ ক্রোশ পথ হইবে।

নেপাল-উপত্যকা।

থানকোট হইতে কিছু নামিয়াই প্রশস্ত সমতলভূমির মধ্য দিয়া সুন্দর সিধা রাজপথ নেপাল-রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এখন এই পথে চলিতেছি। পথের ধারে মধ্যে মধ্যে দোকান ও বসতি। স্থানে স্থানে নানা ফল-মূল, গাদা গাদা আক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রহিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। রাই-সরিষার ভূমিও অনেক স্থান হরিদ্রাবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে কত পাহাড়ী বস্তিই দেখা যাইতে লাগিল। রাস্তার পার্শ্বে বহুদূর ব্যাপিয়া সতেজ শস্যপূর্ণ শস্যক্ষেত্র নেপালের কৃষিসম্পদের উজ্জ্বল নিদর্শনরূপে প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল।

বাস্তবিক এরূপ প্রশস্ত ও উর্ব্বর উপত্যকাভূমি পার্ব্বত্য-দেশে অতি অল্পই দেখা যায়। বহুদূর অতিক্রম করিয়া একবার পশ্চাদ্ভাগে ফিরিয়া দেখিলাম। দেখিলাম সারি সারি পর্ব্বতগুলি যেন অত্যুচ্চ প্রাচীরের মত সেই প্রকাণ্ড প্রান্তরকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া আছে। শৃঙ্গগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত বলিয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, ঠিক্ যেন পর্ব্বতশ্রেণী পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতের দৃশ্যে আমার মনোনিবেশ দেখিয়া আমার সঙ্গী আমাকে সতর্ক করিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি আগেকার দৃশ্যে একবার মনোনিবেশ করুন। দেখুন আমাদের সঙ্ঘের সঙ্গীরা কত অগ্রসর হইয়া গেলেন। এদিকে সময়ও নিতান্ত অপরাহ্ন।" আমি দেখিলাম কথা সত্য, কিন্তু আমরাও নগরের আসন্ন হইয়াছি। তবে বিদেশ, রাত্রি-যাপনের একটা আশ্রয় স্থির করিতে হইবে, সুতরাং সবেগে চলিয়া সঙ্গীদের সমীপস্থ হইতে হইল।

সায়াহ্নেই আমরা লোকালয়ে পঁহুছিলাম, কিন্তু তখনও পশুপতিনাথ ২।৩ মাইল পথ আছে শুনিয়া আমরা অদ্য বিশ্রামের চেষ্টায় নিকটবর্ত্তী একটা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।
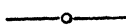
রাজধানী কাঠমাণ্ডু ও পশুপতিনাথ।

৪ঠা ফাল্গুন, শিব-চতুর্দ্দশী।

নেপাল-রাজধানীর নীচেই বিষ্ণুমতী নদী। ইহা সামান্য পার্ব্বত্য নদী হইলেও ইঁহার পুলটী দেখিলাম বিলক্ষণ দৃঢ়। বোধ হয় বর্ষায় উহা অত্যন্ত বেগবতী হয় বলিয়াই পুলের ঐরূপ ব্যবস্থা। এই পুল পার হইয়াই গত রাত্রিতে আমরা ধর্ম্মশালায় ছিলাম। অদ্য ভোর ৬ টায় আমরা এখান হইতে রওনা হইলাম। রাস্তায় তখনও বৈদ্যুতিক আলো

(বিজলীকা বাত্তি) জ্বলিতেছে। কলে জল আসিয়াছে, লোকে কলসী পুরিয়া লইয়া যাইতেছে। ঝাড়ুদার রাস্তা পরিষ্কার করিতেছে। রাস্তার দুই ধারে নিবিড় অট্টালিকাশ্রেণী গম্ভীর-মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে শিবমন্দির, অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি দেবগৃহ উন্নতমস্তকে বিরাজ করিতেছে। নেপালী সৈন্য বন্দুক ঘাড়ে করিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছে। তাহারাও প্রত্যেক দেবমন্দিরে প্রণাম করিয়া যাইতে ভুলিতেছেন না। এখানে সে গুর্খা সৈন্যের বীরত্বের সহিত ঔদ্ধত্য দেখিলাম না। নেপাল নামের সহিত যে কি এক রকম ভয় মিশ্রিত আছে, তাহাও কিন্তু কিছুই অনুভব করিলাম না। এ সহরে গাড়ী-ঘোড়ার বাহুল্য নাই। শুনিলাম, রাজা বা রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য লোকের গাড়ী-ঘোড়া নাই। সহরের অনেকদূর অতিক্রম করিতে করিতে একটী সুন্দর পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইলাম। উহার নাম রাণী-পুকুর। রাণীপুকুরের মধ্যস্থলে একটী দেবমন্দির আছে, পশ্চিম তীর হইতে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত সেতুদ্বারা ঐ মন্দিরে যাইবার উপায় আছে। ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণধারে হস্তিপৃষ্ঠে পূর্ব্বকালীন রাজা প্রতাপমল্ল ও তাঁহার মহিষীর প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহারই নিকটের পথ দিয়া আমাদের যাইতে হইল। উহারই সংলগ্ন, গড়ের মাঠের মত প্রকাণ্ড কুচ-কাওয়াজের মাঠ আছে, উহাকে টুনিখেল কহে। পুষ্করিণীর পশ্চিমধারে যে প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা আছে, তাহা প্রথমে ব্যারাক বা সেনানিবাস বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল, পরে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম যে উহা স্কুলগৃহ। পুষ্করিণীর পূর্ব্বধারে রাস্তার অপর পার্শ্বে চতুস্তল সুবৃহৎ ঘড়ীখানা। ইহা অতিক্রম করিলে দুই ধারে প্রাচীরের মধ্য দিয়া রাজপথ চলিতে লাগিল। আরও কিছুদূর যাইয়া সহরের সীমা প্রাপ্ত হইলাম। তারপর দুই ধারে বালুকাময় উচ্চভূমি, তাহার মধ্যের বালুকাময় কিঞ্চিৎ নিম্নপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। পরে পুনর্ব্বার বস্তি আরম্ভ হইল। ক্রমে ঘণ্টার শব্দ ও

ঘড়ির শব্দে বাবা পশুপতিনাথের মন্দির আসন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। জনতাও ক্রমে দুর্ভেদ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। রাস্তায় কেবলই নরমুণ্ড, আর কিছুই দেখিবার নাই। কোথাও তিলার্দ্ধ স্থান নাই। আমরা সেই চলন্ত লোকারণ্যের সহিত বাগ্‌মতী নদীর তীরবর্ত্তী নেপাল-মহারাজের বিশাল ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। ধর্ম্মশালা অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসী ও যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মশালার ঘর, বারান্দা ও প্রাঙ্গণের কোন স্থান যাত্রিশূন্য নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও স্থান না দেখিয়া আশ্রয়ার্থ স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করায় বলভদ্রজী নামে এক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশালার ভিতর মহলের পার্শ্ববর্ত্তী এক দোতালায় একটী প্রকোষ্ঠে আমাদিগকে জায়গা দিলেন। এই ধর্ম্মশালাটীর বৃহত্ত্বের পরিচয় আর কি দিব? ধর্ম্মশালাটী তিন মহলে বিভক্ত। আমরা তাহার তৃতীয় মহলে স্থান পাইয়াছিলাম। প্রথম মহলের বিশাল প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ৬টী শিবমন্দির, চারিধারে বারান্দাযুক্ত ঘর। দ্বিতীয় মহলের মধ্যস্থলে একটী ও তৃতীয় মহলে দুইটী ঐরূপ শিবমন্দির ও চতুর্দ্দিকে ঘর। বাগ্‌মতীর তীরের দিকে তিন মহলেরই দরজা আছে ও তীরব্যাপী ধর্ম্মশালার লম্বা বারান্দা আছে, তাহাও অসংখ্য যাত্রীতে পূর্ণ। এমন কত ধর্ম্মশালা রহিয়াছে। ফলতঃ নেপালরাজ্যের এই সকল উদার ব্যবস্থার তুলনা নাই।

স্থান পাইয়াছি, এক্ষণে স্নান ও দেবদর্শন করিতে না পারিলে সুস্থির হওয়া যাইতেছে না। ভৃত্যটীর উপর দ্রব্যসামগ্রী রক্ষার ভার দিয়া কমণ্ডলু-হস্তে আমরা স্নানে বাহির হইলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বাগ্‌মতীর তীরে ধর্ম্মশালার লম্বা বারান্দা আছে, ঐ বারান্দার নীচেই নদীতীরের পথ। পথের পরই স্নান-ঘাট। ঐ ঘাটে নামিতে পথ হইতে নদীর জল পর্য্যন্ত বহুদূর বিস্তৃত সিঁড়ির কয়েকটী ধাপ। এইরূপ বাঁধা ঘাট পশুপতিনাথের মন্দিরের নিম্ন পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। নদীতে স্রোত আছে, স্রোতে তলদেশের বালুকা সরিয়া সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু জল কোথাও এক

বিঘতের অধিক আছে বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু জল অল্প বলিয়া তাহার শীতলতা অল্প নহে। অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী, গৃহী নর-নারী সমস্ত নদীগর্ভ ব্যাপিয়া সেই তীক্ষ্ণ-শীতল জলে স্নানাহ্নিক করিতেছে। আমরাও স্নানাহ্নিক সারিয়া বাসায় আর্দ্র বস্ত্রাদি রাখিয়া দেবদর্শনে বাহির হইলাম ও বিপুল জনতা-প্রবাহে মিশিয়া অবিলম্বে দেবদ্বারে উপনীত হইলাম।

পশুপতিনাথের ভবন অতি বৃহৎ। ভবনে প্রবেশ করিতে প্রথম যে মহল পাওয়া যায়, উহার কিয়দংশ চত্বর নিম্ন, উহাতে অসংখ্য মন্দির। উচ্চ চত্বরাংশেও কয়েকটী মন্দির আছে। ইহা ভিন্ন একদিকে কেবল চত্বরের উপরেই পাষাণময় শত শত শিবলিঙ্গ সারি সারি সন্নিবিষ্ট আছে। ঐ সকল দেবমূর্ত্তির উপরে কোনরূপ আচ্ছাদন নাই। দ্বিতীয় মহলে মধ্যস্থলে বাবা পশুপতিনাথের উচ্চ মন্দির। ঐ মহলের চারি ধারেও নানা দেবস্থাপনা আছে। প্রধান মন্দিরের চারিধারে প্রশস্ত ও উচ্চ রোয়াক। সম্মুখবর্ত্তী বা দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী রোয়াকের দুই ধারে প্রস্তর-স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘণ্টা লম্বমান আছে। রোয়াকের নিম্নে আরও ঘণ্টা আছে। প্রাঙ্গণে পশ্চিমধারে উচ্চ পাথরের চৌতারার উপর গণ্ডশৈলাকার পিত্তলময় প্রকাণ্ড বৃষভ মূর্ত্তি। মন্দিরের সম্মুখভাগে মন্দিরের দিকে সম্মুখ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট ৬।৭টী পাষাণময় সুগঠিত মূর্ত্তি আছে। জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, উহা পূর্ব্বতন মহারাজগণের কয়েক পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি। এই সকল দেখিতে দেখিতে ক্রমে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মন্দিরের চারিটী দ্বারের প্রত্যেকের সম্মুখে সোপানশ্রেণী আছে। তাহা দিয়া বহু কষ্টে মন্দিরের দ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছিলাম। কিন্তু অত্যন্ত জনতায় ও তাহার নিয়ত ধাক্কায় ভিতরের দ্বারের সমীপস্থ হওয়া অসাধ্যপ্রায় হইয়া উঠিল। বহুধাক্কা খাইয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া একবার সুযোগ পাইলাম, সেই মুহূর্ত্তে দর্শনলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। রীতিমত পূজা সম্পাদনের উপায়ই নাই।
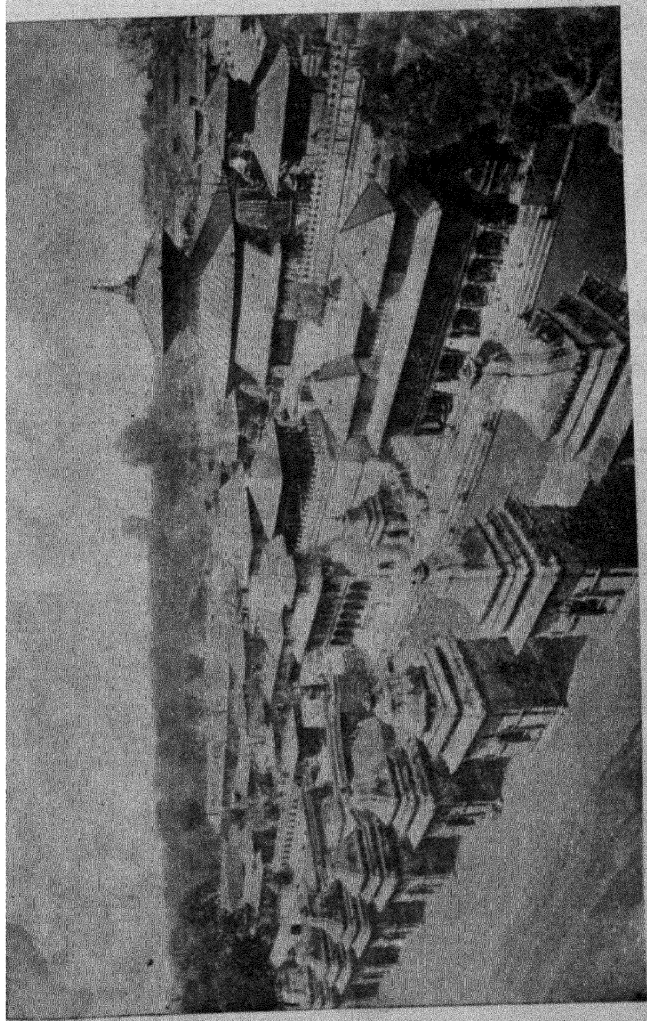
পশুপতিনাথের মন্দির।

পূজার দ্রব্যাদি পশুপতিনাথের মস্তকে স্পর্শ হইল কি না, ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না। অনেক যাত্রীর দুধ, গঙ্গাজল, পঞ্চামৃত প্রভৃতি দেবদেবের মাথায় না চড়িয়া অগ্রবর্ত্তী যাত্রীদিগের মাথায়ই চড়িয়া গেল। একটী যাত্রী বহুক্ষণ ও বহুবার চেষ্টা করিয়াও দর্শন পান নাই। আমার সঙ্গী তাহার কাতরতায় তাহাকে আপন স্থানে দাঁড় করাইয়া সেই বেচারার যে কতই আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলেন বলা যায় না। আপাততঃ আমাদের এই পর্য্যন্তই হইল। কিন্তু অপরাহ্নে আমাদের দুঃখ দূর হইয়াছিল, যথেষ্ট ভিড় সত্বেও সময়ে সময়ে সুযোগ হওয়ায় মন্দিরের চারি দ্বার দিয়াই আমরা দর্শন ও পূজা করিতে পারিয়াছিলাম। মন্দিরের বাহিরে প্রাঙ্গণে যেমন প্রকাণ্ড বৃষভ মূর্ত্তি আছে, মন্দিরের মধ্যেও তেমনি পশ্চিমধারে ক্ষুদ্র আকারে একটী বৃষ আছে। দেব-দেবের সুন্দর পঞ্চ-মুখ বসান চমৎকার মূর্ত্তি, মস্তকে স্বর্ণময় মুকুট, তদুপরে চারিদিকে চারিটী ও মধ্যস্থলে সকলের উপরে একটী বৃহৎ স্বর্ণময় ছত্র আছে। মস্তকের উপরে কয়েকটী সর্প আছে। মূর্ত্তি স্পর্শ করিবার নিয়ম নাই, উপায়ও নাই। দ্বার হইতেই দর্শনাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে হয়। সন্ধ্যাকালে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দেবোদ্দেশে দীপদানাদি অগ্নিক্রীড়া দেখিতে অতি সুন্দর বোধ হইল। বলা বাহুল্য যে, রাত্রিকালেও ভিড়ের নিবৃত্তি হয় নাই।

বৈকালে আমরা গুহ্যেশ্বরী মাতার দর্শন করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ পশুপতিনাথের ভবনের উত্তরে এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে উপনীত হইলাম। তথা হইতে চতুর্দ্দিক্ সুন্দর দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ স্থানকে কৈলাস বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পার্শ্বে স্রোতস্বতী বাগ্‌মতী কি সুন্দর আকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে! কিন্তু শুদ্ধ এই স্থান কেন, সমগ্র পশুপতিনাথ ক্ষেত্রের প্রায় তিন দিক্ই উক্ত নদী দ্বারা বেষ্টিত আছে। যাহা হউক, উক্ত স্থান হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাগ্‌মতীর তীরে গৌরী মাতার শিলাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া প্রকাণ্ড উচ্চভূমির উপর কিরাতেশ্বর

মহাদেবের দর্শনলাভ হইল। ঐ স্থান হইতে গুহ্যেশ্বরী মাতার মন্দির পর্য্যন্ত বৃক্ষশ্রেণীতে সজ্জিত বিশাল ভূমিখণ্ড অতি রমণীয়দর্শন। ঐ স্থানের নাম মৃগস্থলী। ঐ অত্যুন্নত ভূমিখণ্ডের গড়ানের নিম্নদেশে পথ ও পথের নিম্নদেশেই বাগ্‌মতী প্রবাহিতা রহিয়াছে। এই স্থানের রমণীয়তা বোধ হয় কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। ফলতঃ ইহা প্রকৃতই যেন কৈলাসভবন! এবং এতগুলি দেবতার অধিষ্ঠানভূমি যে দেব-পাটন নামে কথিত হইয়া থাকে, তাহাও যথার্থ উক্তি বটে।

বাগ্‌মতীর পূর্ব্ব তীরে গুহ্যেশ্বরী মাতার মন্দির। এখানেও যাত্রীর অত্যন্ত ভিড়। পূজা, পাঠ প্রভৃতির এক দণ্ডও নিবৃত্তি নাই। এস্থান যেমন প্রাচীন, তেমনি রমণীয়। আমরা মুহূর্ত্তের জন্য দেবতার দর্শন ও স্পর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। তৎপরে একটী সেতুর উপর দিয়া পশুপতিনাথের পারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পশুপতিনাথ দর্শনান্তে বাগ্‌মতী পদব্রজে পার হইয়া ৩ ক্রোশ পূর্ব্ব দিকে ভাতগাঁও নামক গ্রামে গুরু দত্তাত্রেয়ের পীঠস্থান ও মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। সিধা পথ। পথের মধ্যে দুইটী সহর পড়ে। মধ্যে মধ্যে ঝরণা আছে। যদিও পাহাড় আছে, কিন্তু তাহা মেটে-পাথরের পাহাড়। রাস্তা কঙ্করময় বা কষ্টকর নহে, বেশ মসৃণ। আর চড়াই উতরাই পথ যাহা আছে, তাহাও বেশ ঢালু। মধ্যে সৈন্যের প্যারেডের জন্য ময়দান আছে। তারপর ভাতগাঁও সহর, উহার আকার ঠিক্ শঙ্খের ন্যায়। ইহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে হনুমান্‌মতী এবং উত্তরে ও পশ্চিমে কংসাবতী নদী। এখানে একটী রাজবাটী আছে, ৪।৫ তলা অট্টালিকাও অনেক আছে। এখানে গুরু দত্তাত্রেয়ের দর্শন হয়। দত্তাত্রেয়ের ৩ মস্তক, ৩ হস্ত ও ৩ পদ। পাণ্ডাজী বলিলেন, উহা শিবেরই মূর্ত্তি। এখানে পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে ভীমের মূর্ত্তি প্রকৃত ভীমেরই ন্যায় বিশাল। কালী-মাতার পাষাণময়ী মূর্ত্তিও আছে।

নেপালের সীমা।

যে বিশালকায় হিমালয়পর্ব্বত ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর সীমা ব্যাপিয়া আছে, তাহার মধ্যভাগে এই নেপালরাজ্য। পূর্ব্বে গড়োয়াল, কুমায়ুন, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি প্রদেশ এই রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় ইহার সীমা অধিকতর বিস্তৃত ছিল। ইংরেজরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে এক্ষণে ঐগুলি ইংরেজ-অধিকারে আসায় বর্ত্তমান নেপালরাজ্যের পশ্চিম সীমা কুমায়ুন ও রোহিলখণ্ড প্রদেশ, পূর্ব্বে ইংরেজ-করদ সিকিমরাজ্য, দক্ষিণে ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষ, পশ্চিমে তিব্বতরাজ্য। নেপাল পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত, এই পূর্ব্ব-পশ্চিমের দৈর্ঘ্য ২৫৬ ক্রোশ হইবে। উত্তর-দক্ষিণে স্থানে স্থানে ৩৫ হইতে ৭৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাজ্যের পরিমাণফল মোটামুটি ৫৭ হাজার বর্গ মাইল। অধিবাসীর সংখ্যা নেপালী রাজ-দরবারের তালিকা অনুসারে ৫২ বাহান্ন লক্ষ হইতে ৫৬ লক্ষের মধ্যে। নেপাল ভারতের একমাত্র হিন্দু স্বাধীনরাজ্য। নেপালের রাজবংশ ক্ষত্রিয়, রাজপুত।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে নেপালের সীমা এইরূপ লিখিত আছে,—জটেশ্বরং সমারভ্য যোগেশান্তং মহেশ্বরি। নেপাল-দেশো দেবেশি সাধকানাং সুসিদ্ধিদঃ॥

———o———
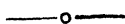
প্রাকৃতিক বিভাগ।

নেপালরাজ্য স্বভাবতঃ পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব এই তিনটী বৃহৎ উপত্যকায় বিভক্ত। ৪টী অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর এই তিনটী উপত্যকা-

* এই স্থান হইতে নেপালের বিশেষ বিবরণগুলির অধিকাংশই বিশ্বকোষের "নেপাল" শব্দে নেপালের যে অতি বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে উদ্ধৃত হইল। কুতূহলী পাঠক বিশ্বকোষের ঐ স্থান দেখিলে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন।

বিভাগের প্রধান কারণ। নন্দাদেবী-শিখর, ধবলগিরি, গোসাঁইথান ও গৌরীশঙ্কর (মাউণ্ট এভারেষ্ট) নামে নেপালের এই চারিটী পর্ব্বতশিখরই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ।

১। পশ্চিম-উপত্যকা।

কুমায়ুন প্রদেশে অবস্থিত নন্দাদেবী-শিখর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী নদী মিলিত হইয়া যে কালীনদী বা সরযূনদী নাম ধারণ করিয়াছে, ঐ নদীই বর্ত্তমান নেপালরাজ্যের পশ্চিম উপত্যকার পশ্চিম সীমা। নন্দা-দেবী-শিখর হইতে ১০০ ক্রোশ পূর্ব্বে ধবলগিরি। এই ধবলগিরি মধ্য উপত্যকার পশ্চিম সীমা। অর্থাৎ নন্দাদেবী-শিখর ও ধবলগিরি-শিখর এই উভয়ের মধ্যে পশ্চিম-উপত্যকা অবস্থিত।

২। মধ্য-উপত্যকা।

ধবলগিরি হইতে ৯০ ক্রোশ পূর্ব্বে গোসাঁইথান-শিখর। ধবলগিরি ও গোসাঁইথান-শিখরের মধ্যে মধ্য-উপত্যকা। ইহাকে সপ্তগণ্ডকী উপত্যকা বলে। কেন না, গণ্ডকনদের উপাদানস্বরূপ ৭টী উপনদী ধবলগিরি ও গোসাঁইথান-শিখরের চিরতুষার ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া এই উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

৩। পূর্ব্ব-উপত্যকা।

গোসাঁইথান-শিখর হইতে [illegible] ক্রোশ পূর্ব্বে গৌরীশঙ্কর। এই স্থানকে পূর্ব্ব-উপত্যকা বা সপ্তকৌশিকী উপত্যকা বলে। যে ৭টী নদীর যোগে কৌশিকী নদীর উৎপত্তি, তাহারা অত্রত্য গিরি-শিখরের চিরহিমানীমণ্ডিত প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া একত্র-সম্মিলনে কুশী বা কৌশিকী নাম ধারণ পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া রাজমহল-পর্ব্বতের নিকট গঙ্গায় মিলিয়াছে।

—০—

নেপাল-উপত্যকা।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী বৃহৎ উপত্যকা ছাড়া গোসাঁইথান পর্ব্বতের দক্ষিণে, সপ্তগণ্ডকী ও সপ্তকৌশিকীর মধ্যে প্রসিদ্ধ নেপাল-উপত্যকা অবস্থিত। এই উপত্যকা ত্রিকোণাকার। ইহার পশ্চিমে ত্রিশূলগঙ্গা, পূর্ব্বে ইন্দ্রাণী নদী। এই উপত্যকা চতুর্দ্দিকেই উন্নত পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। ঐ সমস্ত পর্ব্বতশিখর পরস্পর সংযুক্ত থাকায় অতিসঙ্কট গিরিপথ ও নদী-নির্গমপথ ব্যতীত অন্য কোন দিক্ হইতে এই উপত্যকায় প্রবেশ করা যায় না। এখানে বাগ্মতী নদী প্রবাহিত। এই নদী মুঙ্গেরের সম্মুখে গঙ্গায় মিলিয়াছে।
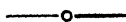
তরাই প্রদেশ।

পার্ব্বত্য-নেপালের দক্ষিণাংশে নেপালের অধিকারে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে, তাহা তরাই নামে আখ্যাত। এই প্রদেশের বিস্তার প্রায় ১১০ ক্রোশ।

নদী।

(১) কালী বা সরযূ, (২) ঘর্ঘরা বা কর্ণালী, (৩) কুশী বা কৌশিকী, (৪) রাপ্তী, (৫) গণ্ডকী এই কয়েকটী নেপালরাজ্যের প্রধান নদী। তদ্ভিন্ন নেপাল-উপত্যকায় বাগ্মতী প্রভৃতি ও অন্য উপত্যকায় অন্যান্য ক্ষুদ্র নদী আছে।

প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানাদি।

গণ্ডকনদের শালগ্রামী, শ্বেতগণ্ডকী, ত্রিশূলগঙ্গা প্রভৃতি যে সপ্ত উপনদী আছে, তন্মধ্যে ত্রিশূলগঙ্গার উৎপত্তিস্থলের নিকটে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ২২টী হ্রদ আছে। ঐ হ্রদগুলির মধ্যে গোসাঁইথান-শিখরে গোসাঁইকুণ্ড বা নীলকণ্ঠকুণ্ডই বৃহৎ। এই গোসাঁইকুণ্ড-হ্রদের নামানুসারে সমস্ত পর্ব্বতটীকেই গোসাঁইথান বলে। এই হ্রদের নামান্তর যে নীলকণ্ঠকুণ্ড, তাহার বিবরণ এই ;—এই বিশাল হ্রদের তলমধ্য হইতে ঈষৎ নীলবর্ণ ডিম্বাকৃতি এক পর্ব্বতশিখর উত্থিত হইয়াছে। এই শিখর হ্রদের জল ভেদ করিয়া উপরে উঠে নাই, বরং জলের সমতল হইতে এক ফুট নিম্নেই আছে। জল অত্যন্ত স্বচ্ছ বলিয়া তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই পর্ব্বত-শিখরই নীলকণ্ঠ-মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তিরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে এখানে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া নীলকণ্ঠের পূজা করে। কিন্তু এ পথ যেমন দুর্গম, তেমনি ভয়াবহ। পথে খাদ্য বা আশ্রয় কিছু মাত্র নাই, অধিকন্তু দুর্জ্জয় শীত। পথক্লেশে অনেকের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে, তথাপি দলে দলে তীর্থযাত্রী কাঠমাণ্ডু হইয়া এখানে আসিয়া থাকে।

নীলকণ্ঠ-কুণ্ডের উত্তর তীরে একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের চূড়া হইতে ৩টী নির্ঝর নিঃসৃত হইয়াছে। ঐ ৩টীর জলধারা ত্রিশ ফিট্ নিম্নে পতিত হইতেছে। এই ত্রিধারার নাম ত্রিশূলধারা। প্রবাদ এই, সমুদ্রমন্থনকালে মহাদেব যে কালকূট বিষ পান করিয়াছিলেন, তাহার জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া তিনি এই হিমালয় প্রদেশে আগমন করেন। এখানে তিনি পর্ব্বতগাত্রে ত্রিশূল আঘাত করায় যে ত্রিধারা উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম ত্রিশূলধারা। মহাদেব এই তুষার-শীতল স্থানে শয়ন করিয়া উক্ত ত্রিধারা-পানে তৃষ্ণা দূর করেন ও বিষ-জ্বালা হইতে মুক্ত হয়েন। ঐ স্থানেই নীলকণ্ঠহ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। হ্রদ-গর্ভস্থ নীলবর্ণ পর্ব্বতখণ্ডই

সেই শয়িত মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া গণ্য হয়। তীর্থযাত্রীরা বলেন, হ্রদের তীরে দাঁড়াইয়া দেখিলে দেখা যায়, যেন ভগবান্ নীলকণ্ঠ হ্রদ-গর্ভে সর্প-শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। ইহার সমীপে একটী পাষাণময় বৃষ আছে।

উক্ত নীলকণ্ঠকুণ্ড হইতে ত্রিশূলগঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যকুণ্ড হইতে উৎপন্ন টাড়ী বা সূর্য্যবতী নদী দেবীঘাট নামক স্থানে উক্ত ত্রিশূল-গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। এই দেবীঘাট একটী তীর্থস্থান, ইহা নয়াকোট (নবকোট) নামক উপত্যকায় অবস্থিত। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভৈরবীর মন্দির নবকোট সহরে আছে।

নেপাল-উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী ফুলচোয়া বা ফুলচক নামক ৮ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতশিখরে সুন্দর সিন্দুরবনের মধ্যে দেবী ভৈরবীর মন্দির ও মহাকালের মন্দির আছে। উহার সমীপে বৌদ্ধদিগের মঞ্জুশ্রীর মন্দিরও আছে। এই স্থান হইতে নেপাল-উপত্যকার সমতলক্ষেত্র ও হিমালয়ের চিরতুষারাবৃত শিখর অতি রমণীয় দৃশ্য।

নেপাল-উপত্যকার উত্তরস্থ ৮ হাজার ফিট্ উচ্চ শিবপুরী পর্ব্বতের শাল ও সিন্দুরবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন শিখরদেশে গোকর্ণ নামক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র আছে।

পশুপতিনাথ ভারতবিখ্যাত পবিত্র শৈবতীর্থ। নেপাল-উপত্যকার রাজধানী কাঠমাণ্ডু হইতে ৩মাইল উত্তর পূর্ব্ব দিকে দেবপাটন নামক স্থানে বাগ্‌মতী নদীর পশ্চিমতীরে বাবা পশুপতিনাথের মন্দির। প্রবাদ, নেওয়ার-রাজ ধর্ম্মদত্ত পশুপতিনাথের সর্ব্বপ্রথম মহাদেব-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমানে নেপালরাজ্যে যে কিছু-কম তিন সহস্র দেবমন্দির আছে, তন্মধ্যে এই মন্দির সর্ব্বপ্রধান। বর্ত্তমান মন্দিরটী ত্রিতল, ৫০ ফিট্ উচ্চ। নূতন নেপালী ধরণে কাঠ ও ইষ্টকদ্বারা ইহা নির্ম্মিত ও অতি সুদৃশ্য। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এই উচ্চ মন্দির অবস্থিত, মন্দিরের

চারিদিকে চারিটী দ্বার। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মশালা। মন্দিরের ছাদ স্বর্ণনির্ম্মিত। গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে পাষাণময় মহাদেবমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী উচ্চে ৩।০ ফিট, চতুর্ম্মুখ ও অষ্টভুজ। দক্ষিণের চারি হস্তে চারিটী রুদ্রাক্ষমালা ও প্রত্যেক বামহস্তেই কমণ্ডলু। সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ-মণিমাণিক্যের অলঙ্কার। এই দেবতার অসীম ঐশ্বর্য্য, ইহা কখনও বিধর্ম্মিকর্তৃক অত্যাচারে উপদ্রুত হয় নাই।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, অর্জ্জুন গোকর্ণতীর্থে আসিয়া পশুপতিনাথ দর্শন করিয়াছিলেন। তদ্‌ভিন্ন, ইহা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কেদারনাথ-বিগ্রহের অর্দ্ধাংশ। নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ এ সকল না জানিয়া শুনিয়া পশুপতিনাথের মন্দিরকে বৌদ্ধ-মন্দির বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ঐরূপ নির্দ্দেশের কারণও এই প্রদর্শন করেন যে "বৌদ্ধ-মন্দির না হইলে পশুপতিনাথের বিগ্রহে মহাদেবের কোন বিশেষত্ব নাই কেন ?" কিন্তু তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই যে হিমালয়পৃষ্ঠের অন্যত্র সুপ্রসিদ্ধ কেদারনাথের বিগ্রহেও ঐরূপ মহাদেবমূর্ত্তির কোন বিশেষত্ব নাই। তাঁহারা এই সকল মন্দির সম্বন্ধে আরও এইরূপ যুক্তি সহকারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "বর্ত্তমান ভারতের অনেক তীর্থ, অনেক দেবমন্দির এক সময়ে বৌদ্ধদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সম্রাট্ অশোক যে ৮৪০০০ হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ স্তূপই যে এখন দেবমন্দিরে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি ? নচেৎ সে সকল কোথায় অন্তর্হিত হইল ?" দুঃখের বিষয়, এই সকল লোক নিজ দেশের সকল সত্য নির্ণয় করিতেও পরের মুখে ঝাল খাইয়া থাকেন। বিজিত জাতির ধর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিতে বিজেতা জাতির অবশ্য ভাল না লাগিতে পারে সুতরাং হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন বলিতে তাঁহাদিগের আন্তরিক আপত্তি হওয়া সঙ্গত। কিন্তু ঐ বিজেতারা

আমাদিগের চিত্তকেও কি এইরূপ জয় করিয়াছেন? আমাদের দেশবাসী লেখকেরাও কি জানেন না যে অন্যধর্ম্মীর দেবমন্দিরে হিন্দুরা কখনই আপন দেবমূর্ত্তি স্থাপন করেন না? ইহা নিতান্তই হিন্দুর স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁহারা মস্‌জিদে কোন হিন্দুকে শিবস্থাপন করিতে শুনিয়াছেন কি? আবার উক্ত লেখকগণ ইহাও স্বীকার করিয়া থাকেন, "এখনও নেপালে অত্যন্তপ্রাচীন বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-মন্দিরসকল অতি সুন্দর অবস্থায় আছে।" কেন, সেগুলি ভাঙ্গিয়া হিন্দুরা হিন্দু-মন্দিরে পরিণত না করিবার কারণ কি? বাস্তবিক, সেরূপ করিবার যে কোন কারণ নাই। কেন না, পরবর্ত্তী উপধর্ম্মই মূলধর্ম্মকে লুপ্ত করিয়া আপন অধিকার বিস্তৃত করিতে চাহে ও সেইরূপই করিয়া থাকে।

এই সম্প্রদায় ইহা অপেক্ষাও আর একটা উৎকট মত প্রকাশ করিয়াছেন। নেপালে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি ও বৌদ্ধদিগের দুর্গতির প্রসঙ্গে তাঁহারা লিখিয়াছেন,"সূর্য্যবংশের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। তিনি তর্কযুদ্ধে সমুদয় ভারতবর্ষস্থিত বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া নেপালে আগমন করেন। কিন্তু বৌদ্ধগণ কেহই তাঁহার সহিত তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর শঙ্করাচার্য্য নেপালে বৌদ্ধদিগের প্রতি অতিশয় নির্যাতন করেন, অনেক বৌদ্ধকে হত্যা করেন। তিনি বৌদ্ধদিগকে জীবহিংসা করিতে বাধ্য করেন। বিহারসকল ধ্বংস করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদিগের বিবাহ দেন। প্রায় ৮৪০০০ হাজার বৌদ্ধগ্রন্থ ধ্বংস করেন। দেবমন্দিরে বলি আরম্ভ হয়, নেপালে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে শৈবধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়।" হায় হায়! কুমার-ব্রহ্মচারী, সর্ব্বত্র সমদর্শী, অদ্বয়-ব্রহ্মবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উপরি সেই ভারতেরই একজন অধিবাসিকর্ত্তৃক কি অকথ্য কলঙ্কের আরোপ! "ভূতদয়াং বিস্তারয়" অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আমার দয়াকে বিস্তারিত কর, ইহাই যাঁহার ভগবৎসমীপে প্রার্থনা, "ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ" "ভব

সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং” অর্থাৎ তোমাতে, আমাতে বা অন্যত্র একই ভগবান্ আছেন, অতএব সর্ব্বত্র সমচিত্ত হও, এই সকল যাঁহার উপদেশ, তাঁহার কি অন্যধর্ম্মীর ন্যায় একহস্তে ধর্ম্মপুস্তক অন্যহস্তে তরবারি সাজে? তর্কযুদ্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহার সম্বন্ধে এতদূরই কুৎসিত কল্পনা করিতে হইবে? একমাত্র ব্রহ্মের নিত্যতা-প্রতিপাদনের নিমিত্ত নৈয়ায়িকসম্মত পরমাণুর নিত্যতাবাদও যে তিনি খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাতে দোষ কি? তাহা বলিয়া অক্ষর যাঁহাদিগের শব্দব্রহ্ম ও সেইজন্য অক্ষরনামে অভিহিত, সেই বর্ণমালাময় ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি দগ্ধ করিবেন? সংসারাসক্তির দোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক বৈরাগ্যপ্রবর্ত্তনই যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি বিহারগুলি ধ্বংসপূর্ব্বক ভিক্ষু-ভিক্ষুকীদিগকে বিবাহ দিয়া দিবেন? জানি না, ইহা অপেক্ষা অসম্ভব ও অসঙ্গত উক্তি কি হইতে পারে!

* নব্যদিগের ঐরূপ ও অন্যরূপ নানা লিখনভঙ্গিতে আমরা বুঝিতে পারি যে হিন্দুধর্ম্ম যেন তাঁহাদিগের বিবেচনায় অনেকটা হেয় ও বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকটা উপাদেয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ঐ উপাদেয়তাবোধের কারণ, উহাতে বর্ণভেদ নাই ও প্রাণিহিংসা নাই। কিন্তু তাঁহারা এটুকু বিবেচনা করেন না যে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্ম্মেই লালিত, পালিত ও শিক্ষিত এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত ও হিন্দুধর্ম্মেরই কিয়দংশ। সুতরাং বুদ্ধধর্ম্মের যাহা উৎকৃষ্টভাগ, তাহা হিন্দুধর্ম্ম হইতেই গৃহীত। বেদের মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি বা সর্ব্বভূত হিংসানিষেধ, মায়াবাদ, কর্ম্মঘটিত জন্মান্তরবাদ, যোগশাস্ত্রসম্মত মৈত্রী-করুণাদি চিত্তপ্রসাধন ও নির্ব্বাণোক্তি সকলই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অবিচারিতভাবে ঐ সকল গ্রহণ করাতে সর্ব্বসামঞ্জস্য হয় নাই। এজন্য তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম তদ্ধর্ম্মীদিগের মধ্যেও সফল হয় নাই। তন্নিমিত্ত নব্যদিগকেই দুঃখ করিতে হয় যে “নেপালের বৌদ্ধগণ অতি নৃশংস উপায়ে সর্ব্বদা জীবহিংসা করিয়া থাকে।” “এই ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুগণ বিহারবাসী হইয়াও ভোগাসক্ত গৃহী” ইত্যাদি। অথচ হিন্দুধর্ম্মে অধিকারভেদে শাস্ত্রবিধির সুমীমাংসা থাকায় পাত্রভেদে মাংসাহার ও মাংসাহার-নিবৃত্তি, সম্ভোগ ও সন্ন্যাস, জাতি-বর্ণাদি বন্ধন ও জাতিবর্ণাদি বন্ধনমুক্তি সকলেরই সুব্যবস্থা আছে।

পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন, নিতান্ত মনঃক্ষোভবশে প্রসঙ্গের এরূপ অতিবিস্তার করিতে হইল।

যে শৈলশিখরে পশুপতিনাথের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, সেই গিরিদেশও পশুপতিনাথ নামে খ্যাত। পশুপতিনাথের পার্ব্বত্যক্ষেত্র বনরাজি-বিরাজিত এবং হিন্দু ও বৌদ্ধের বহু মন্দির-মঠ-বিহারাদিতে সুশোভিত।

পাটন নেপালের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। ইহা কাঠমণ্ডপের ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বাগ্‌মতী নদীর দক্ষিণতীরের কিয়দ্দূরে উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা এখনও ষাট হাজারের কম নয়। সম্রাট্ অশোক সপরিবারে এখানে আসিয়া এই স্থানেই ললিতপাটন নামক নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বহু বৌদ্ধ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও অনেকদিন এখানে বাস করেন। তাঁহার কন্যা চারুমতির সহিত তৎকালীন নেপালরাজ দেবপালের বিবাহ হয়। চারুমতি অবশেষে ভিক্ষুকী হইয়া যাবজ্জীবন মঠে কালাতিপাত করেন। রমণী-জীবনের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি স্বনামে ও স্বীয় ব্যয়ে চারুবিহার নামে একটী বিহার স্থাপনা করেন।

কাঠমাণ্ডু হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ৪ ক্রোশ দূরে এবং মহাদেব-পোখরা শিখর হইতে ১৷৷০ ক্রোশ দূরে হনুমান্‌মতী নদীর বামতীরে ভাতগাঁও নগর অবস্থিত। ইহা গুরু-দত্তাত্রেয়ের পীঠ।

কাঠমাণ্ডু হইতে ১ মাইল পশ্চিমে একটী পর্ব্বতের উপরে স্বয়ম্ভুনাথ নামে প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধ-মন্দির আছে। তাহার নিকটে মঞ্জুশ্রীর একটী মন্দির আছে।

উক্ত রাজধানীর ৩ মাইল দূরে বোধনাথ নামে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধস্তূপ আছে। এবং পাটনে মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-মন্দির আছে।

এতদ্ভিন্ন কত স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত মন্দির আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

কৃষি।

এখানে পর্ব্বতের ক্রম-নিম্ন প্রদেশ ও উপত্যকা প্রদেশ অত্যন্ত উর্ব্বর। স্থানে স্থানে পিচ্, আখরোট্, তুতফল, গৌরীফল, খুবানী, পিয়ারা চা প্রভৃতির গাছ জন্মে। একটু গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে আনারস, ইক্ষু এবং অপর অপর স্থানে যব, গম, কাঙ্নি প্রভৃতির বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। শীতকালে কমলালেবু প্রচুর হয়। অনেক স্থানে বৎসরে তিনবার চাষ হয়। শীতকালে যে জমিতে যব, গম, সরিষা ও ফুলান প্রভৃতির চাষ হয়, বসন্তে সেই সকল ভূমি পুনর্ব্বার কর্ষিত হইলে তাহাতে মূলা, রশুন, আলু প্রভৃতি রোপিত হয়। আবার বর্ষায় ঐ সকল ক্ষেত্রে ধান, মক্কা বা মরিচ বপন করা হয়। পর্ব্বতের ঢালুগাত্র সিঁড়ির আকারে অনেক দূর কাটিয়া যে সকল সমতলভূমি পাওয়া যায়, তথায় মটর, কলাই, ছোলা, গম, যবাদি উৎপন্ন করা হয়। এখানে সরিষা, মঞ্জিষ্ঠা ইক্ষু ও এলাচী প্রচুর জন্মে। চাউল এ দেশের প্রধান খাদ্য বলিয়া এখানকার সকল স্থানেই এক এক রকম ধান্তের চাষ হয়।

তরাই প্রদেশে চাউল, অহিফেন, শ্বেত সরিষা, তিসি, তামাক প্রচুর জন্মে। তরাইএর বনবিভাগে শাল, শ্বেতশাল, পিয়াশাল, খদির, শিশু, কৃষ্ণকাষ্ঠ, কালিকশেট, মুলতা, গুনীবট, ভঞ্জ, তুলা, ডুমুর ও গঁদ-উৎপাদক বৃক্ষ সর্ব্বত্র দেখা যায়। পর্ব্বতের উপরিস্থ বনে সুন্দরী, তিলপত্র, মন্দার, পাহাড়ী কাঁঠাল, কঞ্চক, তালীশপত্র, মণ্ডল, পাণিফল, আখরোট, চম্পক, শিরীষ, দেবদারু, ঝাউ, বেত, বাঁশ ও নানাজাতীয় সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষ ও বিবিধ রং উৎপাদক বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। জিয়া নামক গাঁজাগাছের পাতার রসে চরস উৎপন্ন হয়।

নেপালীয়া চাউল ও অন্যান্য শস্ত হইতে সুরাসার এবং গম, মহুয়াফুল ও চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। এই মদ্যের নাম

রুক্‌সী। ইহা সুমিষ্ট, অন্যান্য মদ্যের ন্যায় ইহার তীব্র মাদকতা নাই। লোকে স্বগৃহে প্রস্তুত করিয়া যে মদ্য পান করে, তাহার জন্য রাজাকে মাশুল দিতে হয় না, বাজারে বিক্রয় করিতে হইলেই মাশুল দিতে হয়।

ভূগর্ভে অল্প নিম্নেই তাম্র-লৌহাদির খনি দেখা যায়। গন্ধক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এতদ্‌ভিন্ন এখানকার মার্ব্বেল, শ্লেট্, চুণাপাথর এবং লাল ও পীতবর্ণের প্রস্তর উল্লেখযোগ্য।

গোর্খা প্রদেশের নিকটে এক প্রকার স্বচ্ছ স্ফটিক প্রস্তর পাওয়া যায়, উহা উত্তমরূপে কাটাইলে হীরকের মত উজ্জ্বল হয়। এখানকার মাটী এত উৎকৃষ্ট যে কিছুকাল পরে তাহা প্রায় সিমেণ্টের মত দৃঢ় হইয়া যায়।

—o—

বাণিজ্য।

নেপাল হইতে যে সকল দ্রব্য ভারতে রপ্তানি হয় এবং ভারত হইতে যাহা নেপালে আমদানি হয়, উভয়বিধ দ্রব্যের উপরই রাজকর ধার্য্য আছে। দেশবাসীর সৌখীনতা ও বিলাসিতার জন্য যাহা নেপালে আমদানি করা হয়, তাহার উপর রাজাজ্ঞায় অধিক শুল্ক ধার্য্য করা হয় এবং দেশের প্রয়োজনানুরোধে যাহা আমদানি করা হয়, তাহার উপর রাজা অল্পপরিমাণে কর লইয়া থাকেন। তিব্বতীয়েরা গিরিপথে অশ্ব, কুকুর, মেষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তু ও কম্বল, চামর, মৃগনাভি, লবণ, স্বর্ণ, রৌপ্যাদি নানা দ্রব্য নেপালে আমদানি করে।

—o—

শিল্প।
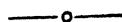
নেওয়ারি স্ত্রীলোকগণ ও পার্ব্বত্য মগরজাতীয় পুরুষেরা নিজেদের পরিধেয় মোটা বস্ত্র নিজেরাই বোনে এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানির জন্য তাহারা আর এক রকম বস্ত্র প্রস্তুত করে। সাধারণের ব্যবহার্য্য একরূপ

পশমী কম্বল ভুটিয়াগণ বুনিয়া থাকে। রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পোষাক চীন ও ইয়ুরোপ হইতে আনীত হয়।

নেওয়ারি পুরুষেরা লৌহ, তাম্র, পিত্তল ও কাংস্য হইতে নানাবিধ তৈজস নির্ম্মাণ করে। হস্তিদন্তেরও সামান্য সামান্য কাজ হইয়া থাকে। একরূপ চারা গাছের ছাল হইতে মোটা ও সুদৃঢ় কাগজ প্রস্তুত হয়।

মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য কাঠমাণ্ডু নগরে টাঁকশাল আছে। টাকার এক পৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও ত্রিশূল এবং অপর দিকে গোরক্ষনাথ, মধ্যে শ্রীভবানী ও ত্রিপত্র অঙ্কিত আছে।

——o——

জাতিতত্ত্ব।

এই পর্ব্বতময় দেশে নানা উপত্যকাভূমিতে যে সকল পার্ব্বতীয় জাতি বাস করে, তাহারা এখানকার আদিম অধিবাসী বলিয়া গণ্য। (১) মগর জাতি—নেপালের পশ্চিমাংশে পর্ব্বতময় প্রদেশে ইহাদিগের বাস। (২) গুরঙ্গ জাতি—মগরজাতির বাসস্থান হইতে হিমালয়ের তুষারাবৃত স্থান পর্য্যন্ত ইহাদিগের বাসভূমি। উভয়ই হিন্দু। ইহারা অত্যন্ত সাহসী, বলিষ্ঠ ও সৈনিকবৃত্তিজীবী। (৩) লিম্বু জাতি, (৪) কিরাতী। ইহারাও ঐরূপ গুণান্বিত, নেপালের পূর্ব্বভাগে বাস করে। (৫) লেপ্‌চা—ইহারাও পূর্ব্বপ্রান্তবাসী। এতদ্‌ভিন্ন ভুটিয়া প্রভৃতি ৮।১০ রকম পার্ব্বত্য জাতি এখানে আছে।

নেওয়ার। ইহাদিগের কতক হিন্দু ও কতক বৌদ্ধ আছে। হিন্দুগণ শিবমার্গী ও বৌদ্ধগণ বুদ্ধমার্গী বলিয়া খ্যাত। এই বুদ্ধমার্গী নেওয়ার-দিগের মধ্যেও হিন্দুজাতির ন্যায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ আছে। সুতরাং মূলে সমগ্র নেওয়ার জাতি হিন্দু ছিল বলিয়াই বোধ হয়। এখানে এই নেওয়ার জাতি সংখ্যায় যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সকল কার্য্যেও ইহারা তেমনি নিপুণ। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও লিখন-পঠনাদি সকল কার্য্যেই

ইহারা সুদক্ষ। গুর্খা জাতির পূর্ব্বে নেয়ার জাতির যতদিন এখানে রাজত্ব ছিল, তন্মধ্যে হিন্দু নেওয়ারগণই রাজা ছিলেন। নেওয়ার জাতির পূর্ব্বে এখানকার রাজত্বের যতদূর ইতিহাস পাওয়া যায়, সে সকল রাজাও হিন্দু ছিলেন। সুতরাং হিন্দুরাজত্ব এখানে অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে।

গোর্খা। এই জাতি উদয়পুরের ক্ষত্রিয়, রাজপুত। মুসলমানদিগের অত্যাচারে ইহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া নেপালের দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। উহাদিগের প্রথম আশ্রিত প্রদেশের নাম গোরখালি, উহা বর্ত্তমান রাজধানী কাঠমাণ্ডু হইতে খুব অধিক দূর নহে। উক্ত গোরখালি প্রদেশের নামানুসারে উহাদিগের নাম গোর্খা হইয়াছে। উক্ত বীরজাতি কালক্রমে সমস্ত নেপাল আয়ত্ত করিয়া নেপালের সমস্ত জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। বর্ত্তমান রাজবংশ, রাজ-পরিবার ও দেশের সমস্ত প্রধান ব্যক্তি এবং উচ্চপদস্থ সমস্ত সৈন্য উক্ত জাতিসম্ভূত। ইহাদের ভাষা সংস্কৃতমূলক, অক্ষর দেবনাগর। অধিকাংশ গোর্খা দেখিতে বেশ সুশ্রী।

নেপালে অসংখ্য দেবমন্দির থাকায় ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের সংখ্যাও এখানে অনেক। প্রত্যেক গৃহস্থেরই একজন করিয়া স্বতন্ত্র পুরোহিত আছে। এই সকল পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক ও গুরু আপন আপন শিষ্য-যজমানের প্রদত্ত দক্ষিণা, ক্রিয়ালব্ধ দ্রব্যাদি ও ব্রহ্মোত্তর জমি হইতেই ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে রাজ-গুরুই সর্ব্বা-পেক্ষা অধিক মাননীয়।

অনেক দৈবজ্ঞ এখানে আছেন। পৌরোহিত্য করিলেও দৈবজ্ঞবৃত্তিই অনেকের জাতীয় ব্যবসায়। ঔষধসেবন হইতে যুদ্ধযাত্রা পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যে দৈবজ্ঞেরা শুভক্ষণ নির্ণয় করিয়া না দিলে ইহারা কোন কার্য্যে অগ্রসর হয় না।

বৈদ্যজাতি—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রালোচনাই ইহাদের ব্যবসায়। যেরূপ অবস্থাপন্ন হউক না কেন, এখানে প্রত্যেক পরিবারই এক একজন বৈদ্য নিযুক্ত করিয়া থাকে।

—o—

আচার-ব্যবহার।

নেপালীগণ গুরু ও ব্রাহ্মণে বিশেষ ভক্তিমান্। শাস্ত্রে পাদগ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদনের যেরূপ বিধি আছে, ইহারা গুরু, পুরোহিত ও পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজন সম্বন্ধে সেইরূপই করিয়া থাকে। উচ্চ পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষগণের নিত্যপূজাহ্নিকে ও ধর্ম্মাচরণে দিবসের অনেক সময় যাপন করা রীতি আছে। পশুপতিনাথের প্রতি সকলেরই অচলা ভক্তি। মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলকেই পশুপতিনাথে লইয়া যাওয়া হয়। বিধবারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন। তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ ইচ্ছানুসারে উভয়েরই বিধান আছে। পুত্রবতী ও অনিচ্ছুর পক্ষে সহমরণের বিধান নাই। সধবারা স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। গোহত্যা, নরহত্যা ও রাজদ্রোহে শিরশ্ছেদ দণ্ড। ব্রাহ্মণ ও স্ত্রীজাতির শিরশ্ছেদ দণ্ড নাই, ঐরূপ স্থলে তাহাদের কঠিন পরিশ্রম সহ চির-নির্ব্বাসন দণ্ড হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের খাদ্যাখাদ্য বিচার বিলক্ষণ আছে। কিন্তু রাজ্যের অধিকাংশ ব্যক্তিই অত্যন্ত মাংসাশী, ধনবান্ মাত্রেই শিকারে অভিজ্ঞ। অধিকন্তু নেওয়ার ও নিম্নজাতীয়েরা অত্যন্ত মদিরাপ্রিয়। চা-পান সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত।

—o—
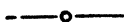
অধিবাসীর অবস্থা।

নেপালের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। সকলেরই জমি-জমা ও গো-মহিষাদি আছে। সকলেরই আপন আপন জমিতে শস্য, তরকারি

প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। সুতরাং অর্থে দরিদ্র হইলেও ইহারা কেহ নিরন্ন ও কঙ্কালসার নহে। রাজধানী ভিন্ন অন্যত্র বিলাসিতাও প্রবেশ করে নাই। এজন্য সাধারণতঃ সকলেই সুস্থ ও সবল শরীরে, সন্তুষ্টচিত্তে অসংখ্য পর্ব্ব উৎসবাদি রক্ষা করিয়া জীবনযাপন করে। বৎসরের প্রতিদিনই এক আধটী পর্ব্ব ও উৎসব আছে। ভারতের সমতলক্ষেত্রের ন্যায় রাখীপূর্ণিমায় রাখীবন্ধন, জন্মাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, বিজয়া-দশমীতে বলি-উৎসব ও অস্ত্রাদিযাত্রা, দীপান্বিতায় দীপমালা দান, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ায় ভাইফোঁটা এবং শ্রীপঞ্চমী, হোলি প্রভৃতি কিছুরই ক্রটি নাই।

———o———

দাসত্বপ্রথা।

এখানে দাস-দাসী বিক্রয়ের প্রথা আছে, আপন আপন গৃহকার্য্যের সুবিধার জন্য অনেকে দাস-দাসী ক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আফ্রিকার ক্রীতদাসের মত প্রভুকর্ত্তৃক তাহাদের নিগ্রহ-নির্যাতন নাই। তাহারা ভারতবাসীর গৃহে রক্ষিত দাস-দাসীর মত প্রভুর গৃহকর্ম্ম করে, একরূপ স্বাধীনভাবেই থাকে ও গৃহের সন্তানাদির ন্যায় প্রতিপালিত হয়।

———o———
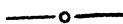
বিলাসাদি।

সৌখীনতাপ্রিয় নেপালীদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। গুর্খা ও নেওয়ার জাতির স্ত্রীলোকদিগের*বেশভূষা সুদৃশ্য ও সম্যক্ উপযুক্ত। ইহারা মেমেদের মত বিধবার বেশও ধারণ করে না, বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী রমণীর মত অলঙ্কারের গাছও সাজে না। মাথায় সোণার ফুল, গলায় সোণার বা প্রবালের মালা, কাণে কর্ণফুল ও দুল অথবা কাণবালা এবং হাতে অঙ্গুরীয় ও বালা পরে। সকলেই সুগন্ধি পুষ্পের বিশেষ অনুরাগী। সর্ব্বদাই মস্তকে ফুল গুঁজিয়া রাখে, পর্ব্বাদিতে কেশও কবরী বিবিধ ফুলসাজে সজ্জিত করে। বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ বেশ আচ্ছাদিত

থাকে, তদুপরি গায়ে ওড়না ব্যবহার করে। মস্তকের বিশেষ আচ্ছাদন নাই। নেওয়ার-রমণীরা কেশগুচ্ছ মাথার মধ্যভাগে চূড়ার আকারে বাঁধিয়া রাখে। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বেণী বিনাইয়া সম্মুখে লম্বমান করিয়া দেয় ও বেণীর এক প্রান্তে লাল রেশমী সুতার ঝুঁটি বাঁধে। বিধবারা লাল সুতা বাঁধে না।

উচ্চজাতীয় রমণীমণ্ডলী পরমা সুন্দরী। যাহাকে প্রকৃত পক্ষে পরমা সুন্দরী বলা উচিত, ঠিক সেইরূপই। সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীগণ নিরক্ষর নহেন, কেহ কেহ সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পুরুষেরা ইচ্ছা করিয়া কেহ কিছু ইংরেজি শিখেন। রাজপুরুষেরা মস্তকে মণিমুক্তাখচিত মহামূল্য তাজ, অঙ্গে রেশমি জামা, পায়ে পা-জামা ও জুতা ব্যবহার করেন। সকলেরই হস্তে রুমাল ও তরবারি থাকে। সাধারণ লোকের কোমরবন্ধে "কুকড়ী" নামক সে দেশের একরূপ বক্র ছোরা সংলগ্ন থাকে।

---o---
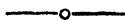
রাজধানী।

নেপাল-উপত্যকায় চারিটী প্রসিদ্ধ নগরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রাজাদিগের রাজধানী ছিল। তন্মধ্যে বর্ত্তমান রাজধানী কাঠমাণ্ডু, প্রাচীন রাজধানী কীর্ত্তিপুর, পাটন ও ভাতগাঁও। চারিটী নগরই বিষ্ণুমতীর তীরে অবস্থিত। চারিটী নগরই প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল, সেগুলি ভাঙ্গিয়া এখন অদৃশ্যপ্রায়। প্রত্যেক নগরেই রাজপ্রাসাদ বা দরবার আছে, উহা নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রত্যেক নগরে প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত কতকটা খোলা মাঠ, তাহার উপর দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিতে হয়। ঐ মাঠের চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ দেবমন্দির। নগরগুলির মধ্যে আরও স্থানে স্থানে ঐরূপ খোলা মাঠ দেখা যায়। কাঠমাণ্ডু-নগরে ঐরূপ মাঠের সংখ্যা ৩২টী। বিচারালয় প্রভৃতি সাধারণ কর্ম্মস্থানাদি ঐরূপ এক একটী মাঠের ধারে অবস্থিত।

বর্ত্তমান রাজধানী কাঠমাণ্ডু নগরীর প্রাচীন নাম ছিল মঞ্জুপত্তন। দেশীয় লোকের বিশ্বাস, পুরাকালে মঞ্জুশ্রীনামক এক ব্যক্তি এই নগর স্থাপন করেন। প্রকৃত পক্ষে এই নগর প্রায় ৭২৩ খৃঃ অব্দে ঠাকুরী-বংশীয় রাজা গুণকামদেবকর্ত্তৃক কান্তিপুর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৯৬ খৃঃ অব্দে রাজা লক্ষ্মণসিংহ মল্ল নগরমধ্যে সন্ন্যাসীদিগের নিমিত্ত একটী কাষ্ঠময় বৃহৎ মণ্ডপ বা বাটী নির্ম্মাণ করান। এই বাটী এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া ঐ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহা হইতেই এই নগরের নাম বর্ত্তমান কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাঠমাণ্ডু নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নগরের পূর্ব্ব প্রাচীরবেষ্টন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, প্রাচীর-গাত্রে যে সকল সুদৃশ্য তোরণ ছিল, তাহার ৩২টী এখনও কোনরূপে বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বকালে যুদ্ধাদি ভিন্ন অন্য কোন সময়ে ঐ সকল তোরণদ্বার রুদ্ধ হইত না।

নগরটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩২টী টোলা বা পল্লীতে বিভক্ত। নগরের মধ্যস্থলে অতি বৃহৎ দরবার বা রাজবাটী অবস্থিত। খাস দরবারগৃহে ও সহরের আধুনিক ধনীদিগের গৃহে সাসির জানালা দরজা আছে। রাজবাটীর আকার কতকটা চতুরস্র, উত্তরদিকে নগরমুখে উন্মুক্ত। এইদিকে "তলিজু" নামক অত্যুচ্চ মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণদিকে শেষভাগে "বসন্তপুর" নামক মন্ত্রণাগৃহের অট্টালিকা ও নূতন দীর্ঘ দরবার বা সভাগৃহ। পূর্ব্বে উদ্যান ও অশ্বশালা। পশ্চিমে প্রধান তোরণদ্বার। পথিপার্শ্বে নেওয়ারদিগের নির্ম্মিত বিস্তর হিন্দু-মন্দির। সভাগৃহের উত্তর-পশ্চিমে কোট বা যুদ্ধবিগ্রহাদির মন্ত্রণাগার। পশ্চিমদিকে আইন-আদালত গৃহাদি। সম্মুখভাগেও অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির। অনেক মন্দিরই অতি উচ্চ ও বহুতলবিশিষ্ট। এই সকল মন্দিরের উৎকীর্ণ কারু, চিত্র ও স্বর্ণাদিবর্ণের গিল্টির কার্য্য অতি সুন্দর। অনেকগুলি মন্দিরের সমস্ত ছাদই পিত্তলের বা তাম্রের গিল্‌টি করা। মন্দিরগুলির কার্ণিসে অনেকগুলি করিয়া

পাতলা ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে, একটু জোরে বাতাস বহিলে ঐ সকল ঘণ্টা টুনটুন করিয়া বাজিয়া বড় মধুর শব্দ উৎপাদন করে। কতকগুলি মন্দিরের দ্বারে উভয়পার্শ্বে প্রস্তরগঠিত সিংহাদি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

পূর্ব্বে যে সর্ব্বোচ্চ "তলিজু" নামক মন্দিরের কথা বলিয়াছি, উহাতে কেবল রাজবংশীয়েরা পূজা করিয়া থাকেন। রাজবাটীর অদূরবর্ত্তী একটি মন্দিরে একটি বৃহৎ ঘণ্টা ও অপর দুইটি মন্দিরে দুইটি বৃহৎ দামামা আছে। মন্দিরগুলির অভ্যন্তরে হিন্দু দেব-দেবীমূর্ত্তি।

কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহা একখানিমাত্র প্রস্তরে নির্ম্মিত।

উত্তর-পূর্ব্বের সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলে দক্ষিণদিকে রাণী-পোখরি নামক বৃহৎ দীর্ঘিকা এবং তাহার পার্শ্বে দরবারস্কুল ও হাঁস-পাতাল। দীর্ঘিকার পূর্ব্বপারে লাইব্রেরী ও উন্নত ঘটিকাগৃহ। আরও একটু দক্ষিণ হইতে বুকায়ুনগাছের সারির মধ্য দিয়া একটী রাস্তা নগরের মধ্যে বৃহৎ কাওয়াজের মাঠে গিয়া মিশিয়াছে। এই মাঠ দেখিতে কলিকাতার গড়ের মাঠের ন্যায়। প্রতিদিন প্রত্যুষে এই স্থানে নেপালী সৈন্যের কুচ-কাওয়াজ হইয়া থাকে। এই ময়দানে সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী জঙ্গ্ বাহাদুর, প্রাচীন সেনাপতি ভীমসেন থাপা ও বীর-সামশের বাহাদুর এই তিন প্রধান পুরুষের তিনটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। ভীমসেন থাপার প্রস্তর-স্তম্ভটী ২৫০ ফুট উচ্চ, উহার গঠন প্রণালী অতি সুন্দর। ঐ সেনা-পতির অপর একটী মনুমেণ্টের ন্যায় বৃহদাকার স্তম্ভের অভ্যন্তর ১টী গোলাকার সিঁড়ী আছে, তদ্দ্বারা এই স্তম্ভোপরি উঠিয়া নগরের শোভা দেখিতে অতি সুন্দর বোধ হয়।

এই কাওয়াজের মাঠের চতুর্দ্দিকে সম্ভ্রান্ত রাণা-পরিবারবর্গের সুদৃশ্য প্রাসাদমালা নগরের শোভা বিশেষ বর্দ্ধিত করিয়াছে। মাঠের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে বর্ত্তমান প্রধান-রাজমন্ত্রীর সিংহদরবার নামক সুন্দর প্রাসাদশ্রেণী দিক্ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। হাঁসপাতাল, দরবারস্কুল, জলের কল ও

ছেন এ সকল ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী বীর-সামশের বাহাদুরের কীর্ত্তি। বর্ত্তমান মন্ত্রী মহারাজ চন্দ্র-সামশের বাহাদুর বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করিয়া নগরের আরও শোভাবৃদ্ধি করিয়াছেন।

সহরের রাস্তাগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত, কিন্তু তেমন প্রশস্ত নহে। বাড়ীগুলি অধিকাংশ দ্বিতল, প্রায়ই চতুরস্র, ভিতরে চক্‌মিলান এবং মধ্যে বিস্তৃত উঠান। ইন্দ্রচক নামক বাজারটী দেখিতে কলিকাতার বড়বাজারের ন্যায় সমৃদ্ধ। উহার ঘন-সন্নিবিষ্ট দোকানগুলি বিলাতী পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ।

—o—
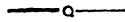
সেনাবিভাগ।

এখানকার সৈন্যেরা অধিকাংশ বিষয়ে ইংরেজীপ্রণালীতে শিক্ষিত এই শিক্ষাদানে ও বারুদ, গোলা, গুলি, কামানাদি নির্ম্মাণে নেপাল-রাজের বহু অর্থব্যয় হইয়া থাকে। ঐ সকল নির্ম্মাণের কারখানা নেপালের নানাস্থানে আছে। একজন বাঙ্গালী বহুকালাবধি নেপাল-রাজ-সরকারে কামান, বন্দুক প্রভৃতি নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত আছে।

রাজ-বেতনভোগী প্রায় ১৬ হাজার সৈন্য আছে। তদ্‌ভিন্ন রাজকীয় নিয়মে কতক লোক সৈনিক-বিভাগে নির্দ্দিষ্টকাল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া অবসর লয়। উহারা সংসারে লিপ্ত থাকিলেও প্রয়োজনমত সৈন্যদলভুক্ত হইতে পারে। এই গতিকে ইচ্ছা করিলে নেপালরাজ একদিনেই ৭০ হাজার শিক্ষিত সৈন্যের সমাবেশ করিতে পারেন। নিজ কাঠমাণ্ডুতে বার হাজার পদাতি সৈন্য আছে।

—o—
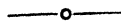
ইতিহাস।

অতি প্রাচীনকালে নী-মুনি নামক কোন মহাত্মা এখানে তপস্যা করেন, তাঁহার নামানুসারে রাজ্যের নাম নেপাল হইয়াছে। তিনি গোপবংশীয়

কোন ব্যক্তিকে এখানকার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহু শতাব্দী পরে আহীরবংশ উক্ত গোপ-রাজবংশকে তাড়িত করে। আহীরবংশের পর কিরাতীবংশের এখানে রাজত্ব হয়। এই বংশের চতুর্দ্দশনৃপতির রাজত্বকালে সম্রাট্ অশোক এখানে আগমন করেন। উক্ত কিরাতীবংশ ৮০০ বৎসর রাজত্ব করার পর সোমবংশ ও তৎপরে সূর্য্যবংশের এখানে রাজত্ব হয়। তৎপরে ক্রমে ক্রমে ঠাকুরীবংশ, রাজপুতবংশ, কর্ণাটকীবংশ ও মল্লরাজবংশ এখানে আধিপত্য করেন।

উদয়পুরের রাজপুতবংশীয় কতকগুলি ক্ষত্রিয় মুসলমানের উপদ্রবে স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অত্রত্য গোরখালি নামক দুর্গম পার্ব্বত্যদেশে আগমন ও তাহা অধিকারপূর্ব্বক বহুকালাবধি তথায় বাস করিতে থাকেন। সপ্তদশশতাব্দীর শেষভাগে উক্তবংশীয় রাজা পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল আক্রমণ করেন। তৎকালে নেপালে মল্লবংশের রাজত্ব ছিল। পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল অধিকারপূর্ব্বক উক্ত রাজ্যের সহিত নিজের গুর্খারাজ্য সম্মিলিত করিয়া সমগ্র রাজ্য নেপাল নামে অভিহিত করেন। তদবধি এখানে উক্ত বংশেরই রাজত্ব চলিতেছে। ঐ রাজবংশের তালিকা এইরূপ ;—

১। পৃথ্বীনারায়ণ।
২। সিংহপ্রকাশ।
৩। রণ-বাহাদুর শাহ।
৪। গীর্ব্বাণ যুদ্ধবিক্রম।
৫। রাজেন্দ্রবিক্রম শাহ।
৬। সুরেন্দ্রবিক্রম শাহ।
৭। পৃথ্বীবীরবিক্রম শাহ।
৮। ত্রিভুবনবিক্রম শাহ।
(ইনি বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ)

এখানে ইহাদিগের প্রথম আধিপত্য বিস্তার সময়ে ইহাদের কতিপয় ধর্ম্মযাজক প্রথমে রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা সুবিধা বোধ না করিয়া প্রধান মন্ত্রীদিগের হস্তেই সমস্ত শাসনভার অর্পণ করেন। তদবধি উক্ত রীতিই চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃত অধীশ্বর—যিনি মহারাজাধিরাজ নামে কথিত, তিনি রাজকার্য্যে নির্লিপ্ত, প্রজার

ক্ষে তিনি দেবতার ন্যায়। পক্ষান্তরে মন্ত্রীই সমস্ত রাজকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত, নামেও মন্ত্রিগণ মহারাজ বলিয়া খ্যাত। সুতরাং উক্ত মন্ত্রীর পদলাভ এখানকার অতি দুরূহব্যাপার। বহু বিপক্ষনাশ ও বহু বীরত্বপ্রকাশ ভিন্ন কেহ এখানে উক্ত পদ লাভ করিতে পারেন নাই। গুর্খা অধিকারে ঐরূপ রাজমন্ত্রিবর্গের তালিকা এইরূপ ;—

১। বাহাদুর শাহ।
২। দামোদর পাঁড়ে।
৩। ভীম শাহ।
৪। ভীমসেন থাপা।
৫। রণজঙ্গ পাঁড়ে।
৬। রঘুনাথ পণ্ডিত।
৭। ফতেজঙ্গ চৌতুরিয়া।
৮। মাতব্বর থাপা।
৯। গগন সিংহ।
১০। জঙ্গবাহাদুর।
১১। রণদীপ সিংহ।
১২। বীর-সামশের।
১৩। দেব-সামশের।
১৪। চন্দ্র-সামশের।

নেপালের এই মন্ত্রি-মহারাজদিগের মধ্যে মৃত জঙ্গবাহাদুরই বিশেষ বিখ্যাত। তাঁহার ন্যায় দুঃসাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উত্থানশীল অসাধারণ পুরুষ সর্ব্বত্রই সুদুর্লভ। নরশোণিতলোলুপ ভীষণ ব্যাঘ্র ও দুর্দান্ত বন্য হস্তী প্রভৃতি ইঁহার ক্রীড়ার সামগ্রী ছিল। তাঁহার আজ্ঞা-ভঙ্গে কেহ কখনও সাহস করে নাই। বহু বিপ্লবকারীকে নিহত করিয়া ইনি আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভয়ঙ্কর সিপাহীবিদ্রোহে ইনি ইংরেজপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ৪ হাজার মাত্র সৈন্য লইয়া স্বয়ং অযোধ্যার বিদ্রোহ দমন করেন। সে সময়ে তিনি ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা কখনও ভুলেন নাই। ইনি প্রয়োজনবোধে স্বধর্ম্মাচার রক্ষা করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া শাসন-সংস্কারাদির নানারূপ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক রাজ্যের অশেষ উন্নতি-বিধান করেন। ১৮৭৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ৩ জন পত্নীও সহমৃতা হইয়াছিলেন।

জঙ্গবাহাদুরের পর তাঁহার ভ্রাতা রণদীপ সিংহ প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিরূঢ় হন। তাঁহার বিরুদ্ধে যে ৪০ জন ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারা ধরা পড়ায় উক্ত ৪০ জনকেই কাটিয়া ফেলা হয়। ইহার পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বীর-সামশের জঙ্গ ষড়যন্ত্র করিয়া সহসা তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করেন, রণদীপ সিংহ নিহত হন। বীর-সামশের মন্ত্রিপদে অধিরোহণপূর্ব্বক তাঁহার মন্ত্রিত্বের ছয় বৎসর কালের মধ্যে স্কুল, লাইব্রেরী, হাঁসপাতাল, জলের কল প্রভৃতি অনেক কীর্ত্তিস্থাপন করেন। ইঁহার পরবর্ত্তীমন্ত্রী দেব-সামশের জঙ্গ। অল্পকাল মধ্যেই একদল বিদ্রোহী উত্থান করিয়া ইঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করে, ইনি প্রাসাদ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। ইনি এখনও জীবিত আছেন, মস্থরি-শৈলে সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতেছেন। ইঁহারই ভ্রাতা মহারাজ চন্দ্র-সামশের এখন প্রধানমন্ত্রী। ১৯০৪ অব্দে তিব্বত-যুদ্ধে ইনি ইংরেজপক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করিয়াছেন।

গত ডিসেম্বরে যখন আমাদিগের সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ বাহাদুর মহিষীর সহিত ভারতে শুভাগমন করেন, তৎকালীন নেপালাধীশ্বর পৃথ্বীবীরবিক্রম শাহ বাহাদুর সেই সময়ে পরলোক প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে তাঁহার সপ্তম-বর্ষীয় পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ ত্রিভুবন-বিক্রমশাহ বাহাদুর নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিতেছেন।